# নীল দুঃখের ছবি

চিরঞ্জীব সেন

সাহিত্যে সংস্থা
১৪/এ টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪/এ টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী, ১৯৬১

মুদ্রাকর
শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ
নিউ জয়গুরু প্রিণ্টার্স
৩৩/ডি মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

# নীল দুঃখের ছবি

## ।। এক ।।

এক পাল শুয়োর, দুটো লেজ কাটা কুকুর আর বাঁকে ঝোলান হাঁড়িকুড়ি কাঁথাকানি নিয়ে মাঠ পুকুরের পাড়ে উঠে এল কাকমারাদের দলটা। জায়গাটা দূর থেকে দেখেই মনে ধরেছে ভিক্ষাম্বরের। কাছে এসে কপালের ঘাম চেঁচে সে বলল, হ্ ব্যাটা, ই জায়গাটা মনের মতুন লাগচে। ইখানে ড্যাঁড়া বান্‌ধলে মন্দ হয় না।

দিগম্বরের যুবক চোখ ছায়া খুঁজছিল রোদ বাঁচাবার জন্য, বুড়া বাপের দিকে তাকিয়ে সে বলল, হ্ বাপ, জায়গাটা মন্দ লয়। ছায়া আছে, জলও অঢেল পুকুরটায়।ক'দিন ইখানটায় থেকে গেলে মন্দ হয় না। জানোয়ার গুলান বড্ড হেঁপসে উঠেচে। উহাদের টুকে আরাম দরকার।

মাঠ পুকুরের নীল জলে জড়াজড়ি করে বেড়ে উঠেছে শ্যাওলা-দাম, ভর দুপুরে পুকুরের চার ধারে জলকলমীর ঝিমান গতর। বুড়া ভিক্ষাম্বরের কণ্ঠা শুকায় তেষ্টায়, জল দেখে সেই তেষ্টা আরও বাড়ে, আটহাতি ধুতি দাপনার উপর তুলে সে এগিয়ে যায় জলের কাছাকাছি। হাঁটু জলে নেমে মাজা ধাপিয়ে জল খায় পেট ভরে। তার দেখাদেখি দিগম্বরও পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে আঁজলা ভরে জল খায়। পরিপূর্ণ তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলে, জান জুড়ায় গেল বাপ! কী ঠাণ্ডা জল! পুকুরটায় একফোঁটা পাঁক নাই, মনে হতিচে বালির পুকুর।

—হ্ ব্যাটা, তুর কাথাই ঠিক। ডানে-বাঁয়ে ঘাড় নাড়ে ভিক্ষাম্বর, গামছা ভিজিয়ে মাথার তালুতে জল ছোঁয়ায়, ইখানটায় মন ধরলে মাসভর থিকে যাবো। আঃ কী হাওয়া আসছে দেখ! জান জুড়ায়।

সেই কোন সকালে তাজপুরের বস্তি ছেড়ে পথে নেমেছে ওরা, টানা পথ, হাঁটাব বুঝি বিরাম নেই। বাস রাস্তার পাশ দিয়ে শুয়োরগুলো ঘোঁত ঘোঁত করে দৌড়ায়, চেনা গলায় ডাকলেও কথা শোনে না। গু-গোবর যা পায় তাই ওদের খাদ্য। কচু-ঘেঁচু পেলে তো আর কথা নেই। পশুগুলোর সাথে পশু না হলে পারা যায় না।বুড়া ভিক্ষাম্বর হাঁপিয়ে উঠেছিল কিছু দূর এসে। দিগম্বর তার হাত থেকে পাঁচনবাড়িটা কেড়ে নিয়ে বলল, তুর বয়স হিচে। তুর দ্বারা আর শুয়োর খেদান হবেনি। মিথ্যে বলেনি দিগম্বর। ভিক্ষাম্ববরের চুলে এখন কাশফুলের পাপড়ি ছড়ান। কুঁচকে গেছে গালের চামড়া। দাঁত ফাঁকা হয়ে বেরিয়ে গেছে লাল মাড়ি। চামড়ায় আর আগের সেই টান নেই। কালিজাটাও কমজোর। দু-কদম হাঁটলেই হাঁপু ধরে বুকে। হাড় জাগান বুকের পাঁজরা চিল দেখা মুরগীর কণ্ঠনালীর মতো কাঁপে।

বস্তি ছেড়ে আসতে মন চায় না তবু আসতে হয়। না এলে পেট হা-হা। গলা শুকায়। জানোয়ারগুলো জ্বালিয়ে মারে। কঞ্চির বেড়ায় ঘেরা খোঁয়াড়ে চেল্লায় দমতক। ওরা ঘুরতে-

চরতে ভালবাসে। বাঁধা জলের জীবনে ওদের ঘোরতর আপত্তি। তাই মাঝে মাঝেই বেরিয়ে পড়তে হয় পেটের টানে।

এবারের দলটা অন্যবারের তুলনায় বহুৎ ছোট। যমুনাবতী ছেলে দুটোকে নিয়ে বস্তিতে থাকল। ওর শরীর ভাল নেই। বদনে রোদ লেগেছে। কিছু খেলে উল্টি হয়। গা পাক দেয়, পেট গুলায়। ভিক্ষাম্বরই বলল, বোহু থাকুক। ওর গিয়ে কাজ নাই। ছানা দুটারে লিয়ে ও ঘর পাহারা দিবেক।

বাপের মুখের উপর এখনও কথা বলার হিম্মোৎ রাখে না দিগম্বর। নিমরাজি হয়ে বলেছিল, তুর কাথাই মেনে নিলাম। তবে বোহু না গেলে রান্‌ধা-বাড়ার কাম কাজ কে করবে? বিটা ছেলে তো হাঁড়ি ঠেলতে পারবেকনি।

—হ্ তাও ঠিক বটেক। ভিক্ষাম্বর কপালে ভাঁজ ফেলে বেলছিল, বিন্দু বিটিয়া তো ঘরে বসে আছেক। ও যাবেক।

সব মিলিয়ে দশ জন।

মুলি বাঁশের বাঁক নামাল পীতাম্বর। সে সম্পর্কে ভিক্ষাম্বরের ভাই হয় তবে তার চেহারায় এখন ভাঙনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েনি। তার চেহারা বেশ শক্তপোক্ত। টানা ছ-ক্রোশ পথ বাঁক বয়ে এক ফোঁটা ক্লান্তি নেই চোখে-মুখে। বাঁক নামিয়ে পীতাম্বর গা ছাড়া দিয়ে দাঁড়াল। মাজার হাড় ফুটিয়ে বলল, রাম সিংয়ের দয়ায় ইখানটায় ভাল যাবেক মনে হচ্চে। মনে হচ্চে ইখানটায় ঝুট-ঝামেলা কম হবে।

তার কথা শুনে ভিক্ষাম্বর খসখসে ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে হাসল, কুয়ামারাদের আবার ভাল-মন্দ। আমি ভাই ওসব নিয়ে ভাবি না। যা হবে, দিখা যাবেক।

ভূত-প্রেত-ডাকিনী-যোগিনীর ভয় নেই ওদের। ওদের যত ভয় মানুষকে। বিন্দিয়ার কাঁচাবয়স, শরীরের গড়নও ভাল। নোনা খালের মাটির মতো গায়ের রঙ। হাসলে ফুল যেন পাপড়ি মেলে। মেয়েটাকে সাবধানে রাখতে হবে। গাঁয়ের মানুষকে বিশ্বাস নেই। ওরা ছায়া মাড়ায় না অথচ শরীর চাটতে ভালোবাসে।

বিন্দিয়া ঘুরে ঘুরে প্রথম থেকেই সতর্ক। পীতাম্বরকে বাঁক নামাতে দেখে মুখে হাসি ছড়িয়ে বলল, কাকা, তিনটা বড় বড় ঢেলা এনে দাও মাঠ থিকে। আমি যাই জল নিয়ে আসি। বেলা তো আকাশপানে চড়েছে! চটজলদি খানা না বানালে তুমরা খাবে কী?

পীতাম্বর ঘামে পেছল কাঁধ রগড়ে আয়েশী চোখে তাকাল, তুর কুনো চিন্তা নেই রে বিটিয়া। পহলা দিন খেতে টুকে দেরী হলে কুনো চিন্তা নাই। এই আমি যাচ্ছি ঢেলা কুড়াতে।

বটগাছের ছায়া কুয়োর জলের চেয়েও শীতল। মাঠপুকুরের বটগাছটা বয়সে নবীন হবে তবে ঝুরি নামান চেহারা দেখে তার যে সঠিক বয়স কত অনুমান করা যায় না। বটগাছের চারধারে আগাছার ভিড়। ঠাস বুনোট জংগল। কত যে লতাপাতা আছে সেখানে। বিন্দিয়া হা-করে দেখছিল সব। দিগম্বর তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধোল, এ বুন, হা করে কী দেখছিস রে?

'তড়াক' ভেঙে ফড়ফড়ে ফড়িংয়ের চোখে তাকাল বিন্দিয়া, কী আর দেখব বল, ইখানে দেখার আর কী আছে?

—মোর ভুখ লাগে। খানা বানাবি না?

—হ্। সে তো বানাবো। তু দু'হাণ্ডি জল এনে দে।

বটের নুয়ে পড়া ডালের ফাঁস দড়িতে হাঁড়িকুড়ি কাঁথাকানি ঝুলিয়ে দিয়ে গিয়েছে পীতাম্বর। হওয়ায় ঠোকাঠুকির শব্দ তুলে দুলছে কালি পড়া হাঁড়িগুলো। বিন্দিয়া চোখ ফিরিয়ে নিল সেদিক থেকে, হাই তুলে বলল, যাই জ্বালানীর কাঠ টুঁড়ে আসি।

দিগম্বর বলল, তার কুনো দরকার নাই। বটের পাতাগুলান ঝাঁটাই লে। বট পাতায় তেল আছে। আগি লাগলে পড়পড় করে জ্বলবেক।

সাথে যারা ছিল তারা সব জড়ো হয়েছে ছায়ায়। নুন ঘাম ফোঁটা চেহারা। তিনটে ঢেলায় দিব্যি চুলা বানাল বিন্দিয়া। পাতা ঝেঁটিয়ে জড়ো করল এক জায়গায়। দেশলাই ঠুকে আগুন ধরাল আরামে। পোড়া হাঁড়িতে মাপ মত ভাতের জল চড়িয়ে গোল আলু ধুয়ে ফেলে দিল সেই জলে। ভাত ফুটতেই শুঁটকিমাছ পোড়াল সে। কুঁচুটে গন্ধে ভরে গেল চারপাশ।

ভিক্ষাম্বরের নাকে গন্ধটা গিয়ে টোকা মারে, সে শুয়োর গুলোর গা ধোয়াতে নিয়ে গিয়েছিল পুকুরে। বেয়াড়া জানোয়ারের দল জল দাবিয়ে চলে গিয়েছে বহু দূর। শাপলা ফুল খেতে পেলে তাদের লেগে যায় মহোৎসব। হাল ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষাম্বর জিভে জল নিয়ে উঠে এল। ধুতি নিংড়ে গামছা পরল সে। ভেজা গায়ে বিন্দিয়ার কাছে গিয়ে বলল, আজ মনে হচ্চে মহাভোজ হবে। রাইতটা টুকে মন দিয়ে বানা। ভুখে আমার পেট জ্বলচে।

বিন্দিয়ার ঠোঁটে সেই-চেনা হাসির ঢেউ। ওর মুখ দেখে কেউ বুঝবে না ওর দুঃখের কুয়োখানা কত গভীরে নেমে গেছে। মেয়েটার মুখের দিকে তাকালে বুক ভেঙে যায় ভিক্ষাম্বরের। সোয়ামী খেদান মেয়ের কোনো সমাজেই কোনো কদর নেই। সবাই তাকে গিলতে আসে। ভিক্ষাম্বর কত দিন আর ঠেকিয়ে রাখবে ওদের?

বটের ছায়ায় ঝিমান ঘাসের সংসার। ওর উপর পাত পেড়ে বসেছে ভিক্ষাম্বরের পরিবার। পীতাম্বর ঝাল খেয়ে 'আ; উঃ' শব্দ করে চোখের জল মুছে নিল। দিগম্বর শুঁটকি মাছের চাখনায় তর্জনী ছুঁইয়ে খুশিতে মুখ ভরিয়ে বলল, শুঁকাপুড়ার রাইতাটা যা হিচে না—কী বলব! বুনের আমার হাতেব গুণই আলাদা। যা রেন্‌ধে দেয় তাতেই কৌয়া-চিলের বাসনা ভাসে।

কলাই করা থালায় উপচে পড়ে ভাতের বাহার। লাল চালের ভাত থরেথরে সাজান। হাতের কব্জি ডুবিয়ে খেতে থাকে ভিক্ষাম্বর। একসময় খাওয়া থামিয়ে বলে, টুকে আলুমলা থাকলে দে। খেসারির ডালি থাকলে ভাল হোত। শুকা ভাত কণ্ঠা দিয়ে নামতে চায় না।

লেজকাটা কুকুর দুটোর তাগড়াই গতর। এই খরার মরশুমে ওদের গা বেয়ে তেল গড়ায়। খাওয়ার জন্য ওদের চোখ অস্থির। লোভ ধাদসে কাটা লেজের গোড়া নড়ছে, লাল জিভের ডগায় এসে ঝুলে আছে তাতা জল।

খাওয়া শেষ হলে যে যার থালা নিয়ে পুকুরের দিকে চলে যায়। খিদে লাগলেও বিন্দিয়া কখনও এদের সঙ্গে খায় না। রোজ খেতে বসলে তার ঘরের মানুষটার কথা মনে পড়ে। কী দুঃখে তাকে ঘর থেকে ভাগিয়ে দিল বৃন্দাবন তা সে নিজেও জানে না। মনের ভেতর সদা-সর্বদা বুঁজকুঁড়ি কাটে দুঃখ। শোলবুড়ির মতো তার এখন শুধু স্থিতু হয়ে বসতে মন করে। এ সমাজে স্থিতু হবার জো নেই। ওরা বলে, রুখলে তো মরলে! কদমে কদম মিলিয়ে চলার নাম জীবন।

খেতে বসে আজও বৃন্দাবনের মুখটা মনের কোণে ঘাই দেয় বিন্দিয়ার। কোন ফাঁকে

চোখ দুটো গড়িয়ে দেয় দু-ফোঁটা জল। হাতের চেটোতে মুছে নিয়ে বিন্দিয়া দেখে তাকে কেউ দেখল কিনা। আশেপাশে কেউ ছিল না, তাকে কেউ দেখেও নি।

কুকুর দুটোকে খেতে দিয়ে এসে পাত গোছাল বিন্দিয়া। পুরুষগুলো এখন একটু গড়িয়ে নিচ্ছে গাছের ছায়ায়। শরীরের আলিস্যি ঝেড়ে ওরা আবার যে যার ধান্দায় বেরিয়ে যাবে। কাজের তো শেষ নেই। জ্বাল দেবার কাঠ ভাঙতে যাবে পীতাম্বর। ভিক্ষাম্বর যাবে গাঁয়ের ভেতর। দিগম্বর কুকুর নিয়ে বেরুবে শিকারে।

রোদ পড়ে এলে শুয়োরের দল বেশি দূর যাবে না। ওদের যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও যেতে দেওয়া হবে না। অচেনা-অজানা জায়গায় বেশি সাহস না দেখানোই ভাল। মাল হারিয়ে গেলে মুশকিল হবে তখন। দলের লোকজনদের বকাঝকা করবে ভিক্ষাম্বর। এ দলে তার কথা ফেলার কারোর সাহস নেই।

বেলা গড়তেই দিগম্বর মালাকোঁচা দিয়ে গামছাটা পরে নিল। তার চওড়া পেশীবহুল চোহারা অনেকটা হিংস্র বাঘের মতো; গলার স্বর গম্ভীর, মনে হয় পাথর চাট্টানে কেউ বুঝি হাতুড়ি ঠুকছে গুস্সা ভরে। সে এসে বিন্দিয়াকে বলল, আমি যাচ্চি খালের ধারে আশপাশ আগে ভাগে না দেখ এলে কাল সকালে ধান্দা জমবেক না।

—রেত করিব নে। বিন্দিয়া সতর্ক করল।

মাঠপুকুরের পাড় পেরিয়ে এবড়ো-খেবড়ো আলপথে উঠে এল দিগম্বর। ফাঁকা মাঠে থৈ-থৈ করে নাচছে হাওয়া। গুমোটভাব কেটে গেছে হাওয়ার তোড়ে। মাঠের পরে মাঠ জুড়ে ধানের নাড়া। কুকুর দুটো মাঠ শুঁকে-শুঁকে ছুটছে। ওদেরই বা আনন্দ দেখে কে দিগম্বরের জোড়া ঠোঁটে বুনো শিস। তবু চোখ আছে মাটির দিকে। একটু বেখেয়াল হলে ভাঙা শামুকে দু-ফাঁক হবে পা। ধান্দার তখন দফারফা। যমুনাবতীর পেটের ছানাদুটো বড় দুরন্ত! ওরা বস্তিতে আছে, এখন কী করছে কে জানে। যমুনাবতীর শরীরটা বিগড়ে যায় প্রায়ই। বুড়া ভিক্ষাম্বব জুড়িবুঁটি দেয় তাকে। ঝাড়ফুঁক করায়। তবু অসুখ ভাল হয় না ভিক্ষাম্বর হাঁপিয়ে উঠে বলে, বোহুটার গতর দেখচি দিনকে দিন শুকায় যাচ্চে। কে যে ওরে তুকতাক করেছে কে জানে। তবে রাম-সীতার দয়ায় ওর শরীল যদি না সারে তাহলে কাঁথি নিয়ে গিয়ে 'ইংরেজ দাবাই' করাতে হবে।

বাপের কথা মনে পড়তেই হোঁচট খায় দিগম্বর। বউটার আগেব শরীব-স্বাস্থ্য এখন যেন ভাটার টানে ভেসে যাওয়া জলশোলা। ফুলকো ফুল! ঠেলা মারলে উল্টে পড়ে পুকুর থেকে এক হাঁড়ি জল আনতেই দম ফুরিয়ে যায় তার।

দিগম্বরের মনটা খারাপ হয়ে গেল খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে। আগে কচি নধর ডাবের মতো গতব ছিল বউটার, চিকনাই ছিল নতুন গজানো বটপাতার। ওই অল্প বয়সে সে যে কী ভাবে নেসকে গেল বুঝে পায় না দিগম্বর। তার মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে আকাশের নীলকে মনে হয় কালো হাঁড়ি। শুদ্ধ বাতাসে ভার হয়ে আসে বুক।

কুকুর দুটো হুড়মুড়িয়ে খালপাড়ে উঠে আসতেই দিগম্বরও মাটি ঠেলে উঠে আসল ফুঁস করে শ্বাস ছেড়ে পিছন ফিরে তাকাল। অত দূর থেকে তাদের অস্থায়ী ঝুপড়িগুলো দেখা যায় না, শুধু যুবক বটগাছটা দেখা যায়। এ বটগাছটার মতোই বুঝি তার জীবন সংসারের ডালপালা ছড়িয়ে ঝুরি নেমেছে।

কাঠপোল ছাড়িয়ে দিগম্বর চলে যায় চালা দোকানটার কাছে। দেশলাই কেনে। বিড়ি

ধরায়। খালপাড়ের ছেলে মেয়েগুলো তাকে হা-করে দেখছে। ওদের চোখে বিস্ময় মাখানো ভয়ের হুড়োহুড়ি। খড়ের চালার নীচে বসে আছে ভুঁড়িওলা দোকানী। ধুতিতে শুধু লজ্জাস্থান ঢাকা। বাদবাকি সব উদোম। সে যে এর আগে কাকমারা দেখেনি তা নয় তবু তার চোখে চ্যাটচেটে কাদা মাখানো বিস্ময়। দিগম্বরকে শুধোল, ঘর কুন্‌ঠি?

হাসল দিগম্বর, কাকমারাদের আবার কবে কুনদিন ঘর ছিল? মোর মেনে ঘুরি-ফিরি খাই। বগল বাজাই।

খুশি হল না দোকানী, সন্দেহের চোখে তাকাল। কাকমারার দল গাঁয়ে ঢুকলে তাদের সতর্কতা বাড়ে। ওরা নাকি চোরের চোর—মহাচোর। হাঁস মুরগি যা পাবে নিয়ে পালাবে। থালা-ঘটি-বাসন পুকুরপাড়ে রাখা যাবে না। বেড়ায় আর কাপড় শুকোতে দেওয়া যাবে না।

দোকানীর ভুঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে নামছিল ঘামের ধারা, গামছায় সরসরানো ঘাম মুছে বিরক্তি সহকারে বলল, যা ভাগ। এখানে কি ঠাকুর উঠেছে?

দিগম্বরের ভেতরে লুকিয়ে থাকা দুঃখটা গাছ হয়ে গেল তখন। সুতোর কাছাকাছি আগুন এসে যাওয়া বিড়িটা খালের জলে ফেলে দিয়ে সে হাঁটতে লাগল আপন খেয়ালে।

জোয়ারের সময় এখন, নোনা জল ঢুকছে সরসরিয়ে। জল নয় যেন বিশাল চওড়া এক ফণাধারী সাপ তাড়া খেয়ে ছুটছে বালিঘাইয়ের দিকে। কী মনে করে দিগম্বর খাল পাড় থেকে নেমে এল জলের কাছে। উৎসাহ ভরে নোনাজল জিভে ছোঁয়াল।

কুকুর দুটো ছুটতে ছুটতে চলে গিয়েছে বাবলাগাছের গোড়া পর্যন্ত। ওরা গলা ফাড়িয়ে ডাকছে। ডাকছে না তো যেন কাছে আসতে বলছে। পোষা কুকুরের তাৎপর্যপূর্ণ ডাক চেনে দিগম্বর। জোয়ারের বিপরীতে ছুটতে লাগল সে।

বাবলাগাছের গোড়ায় শ্মশানভূমি। একটা পোড়াকাঠ ভেসে যাচ্ছিল নোনা জলের টানে। দুটো কুকুর আটকে দিয়েছে কাঠের গতি। দিগম্বর লম্বা লম্বা পা ফেলে স্রোতের মুখে জড়িয়ে ধরল কাঠটা। বহু কসরৎ করে ঠেলে তুলল ডাঙায়। চিতা নিভিয়ে চলে গিয়েছে শোককাতর মানুষ। ফেলে গিয়েছে হাঁড়িকুড়ি কাঁথাকানি। দিগম্বর পোড়াকাঠ আর অশৌচ হাঁড়িকুড়ি নিয়ে ফেরার পথ ধরল। বিন্দিয়া এসব জিনিস দেখে দারুণ খুশি হবে। শ্মশানের পোড়া কাঠে চুলা ধরাবে সে। ভাত ফুটবে অশৌচ হাঁড়িতে টগবগিয়ে।

## ।। দুই।।

চারদিন হয়ে গেল তবু ধান্দা জমল না এখানে।

সন্ধেবেলায় পচা ভাতের মণ্ড খেতে বসে ভিক্ষাম্বর দুঃখ করে বলল, ইখানকার মানুষগুলান হাড়-কেপন। ওদের হাত দিয়ে পাউশও গলে না। তার কথা শুনে দিগম্বর রাঁ-করা চোখে তাকাল।

মাঠ ভর্তি চাঁদের আলোয় কালপেঁচা উড়ে এসে বসেছে বটের ডালে। বিন্দিয়ার নজর

চলে গেল সেইদিকে। অন্যসময় হলে সে নিজেই উসকে দিত দিগম্বরকে, আর তার কথা শুনে সূচীমুখী লোহার ফলা নিয়ে উতলা হয়ে ছুটে যেতে দিগম্বর। বেতলাঠি পরপর সাজিয়ে ঘনপাতার আড়ালে বসে থাকা পেঁচার বুক এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিত। আজ বিন্দিয়ারও কথা বলার ইচ্ছা নেই। এক বাটি হাঁড়িয়া সে ঢুকিয়ে নিয়েছে খালি পেটে। আর এক বাটি সামনে ধরে বসে আছে ঠায়। ছলছলানো চোখ।

বুড়া ভিক্ষাম্বরের গলা ভেঙে এল, আর মনে হয় ইখানে দিন চলবেনি। এদ্‌গুলান মানুষ কদদিন আর আধ পেটা খেয়ে থাকবে! বুড়াথুড়ার কথা বাদ দিলাম কিন্তু ছুঁয়া গুলার কী হবে?

বিন্দিয়া বাটিতে ঠোঁট ছুঁইয়ে জ্ঞান দেওয়ার স্বরে বলল, সীতা-রামের দয়ায় দিন ঠিক চলে যাবেক। দিন কি এটকে থাকে বাপ? কথা শেষ করে বিন্দিয়া ঘোলাটে চোখে তাকাল।

দিগম্বর বোনকে সতর্ক করে বলল, তুই চুপ যা। লেশায় তুর মাথাটা ঘুইরে গেছে।

রোদের ঝাঁঝে কালচে ধরা মুখ, কদিন হল আয়নার সামনে দাঁড়ায়নি বিন্দিয়া। এখন চাঁদের আলোয় ঘামে চ্যাটচেটিয়ে উঠেছে মুখমণ্ডল, অনেকটা তেলঘাম প্রতিমার মতো সেই মুখের চেহারা। ক'দিন থেকে ধান্দায় বেরচ্ছে বিন্দিয়া। সে যায় উদকাটি আর নজরকাঠি নিয়ে বেচতে। এগুলো সব তার নিজের হাতে বানানো। আড়াআড়ি শুয়োরের হাড় দুটোকে টিনের পাতের উপর চেপে বসিয়ে দিলেই হল, তাবিজের আকার পায় উদকাঠি। কালো কারে ঝুলানো থাকে সেই তাবিজ। বিন্দিয়া ঘোরে পাড়ায় পাড়ায়, উদকাঠি লেবা গো-ও-ও-ও, উদকাঠি-ই-ই-ই। কেউ শোনে, কেউ আবার মুখ ঘুবিয়ে নেয়। ঠাট্টা টিটকিরির ধুমধাড়াক্কা ছোটে। তার কাঁচা বয়সটার দিকে সবার নজর। একে তো গায়ে জামা নেই, পরনের শাড়িও যেমন তেমন। ধর্ম বাঁচে কিন্তু যৌবন আটকায় না।

ভিক্ষাম্বর তার হত দরিদ্র চেহারা দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, কাল থিকে তু আর গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুবিবি নে। মানুষের লজব খারাপ। উদকাঠি গলায় ঝুলিয়েও তুরে আমি বাঁচাতে পারবনি।

বুড়া বাপের কথা শুনে বিন্দিয়া খিল খিল করে হাসে। শাক লতাপাতা খাওয়া দাঁতে ঝিলিক ওঠে বাহারী পাথরের। এই শরীরটা নিয়ে তার গর্বও তো কম নেই। বৃন্দাবন তো এই শরীর দেখেই মজে ছিল, চিটে গুড়ের পিঁপড়ের মতন তার তখন অবস্থা। শেষে পাঁচ কুড়ি টাকা পণ দিয়ে হাতজোড় করে নিয়ে গেল। সেদিন বড় মুখ করে বলেছিল, সুখে রাখবে, খেতে পরতে দেবে।

ডাহা মিছে কথা! বিন্দিয়ার চোখ ভরে জল এল। দলে ঘুরে রাঁধাবাড়ার কাজ করে তার আর কত দিন চলবে? শরীরের তাপ জুড়োনোব কেউ নেই। বৃন্দাবন তো ভোঁ-কাটা, অন্য মেয়েমানুষের আঁচল ধরে ঘুরছে। খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর মাটিব হাঁড়িখানা জলভরা ধুমসা আষাঢ়ী মেঘের মতো, তারদিকে হা-পিত্যেশ চোখে তাকিয়ে থাকল দিগম্বর। বুড়া ভিক্ষাম্বর বলল, ব্যাটা, আর খাসনে। এ ক্ষেপের মালটা বড্ড কড়া হয়েছে, বেশি খেলে পেট ফাঁপবে।

আজ আর চুলা ধরায়নি ঝুমরি। শুয়োরের পাল নিয়ে দিনভর সে গিয়েছিল নামলা ভুঁইয়ে। জানোয়ারগুলো পেট ভরিয়ে ফিরেছে কিন্তু তার নিজের পেটটা ফাঁকা। ছ'মাসেব ছেলেটাকে মাই ধরিযে দিয়ে চাঁদের আলোয় সে একটু ঘুরে বসল। পেটে কিছু না থাকলে

দুধ হবে না তাই হাঁড়িয়া বাটিতে চুমুক দিয়ে সে একবার চাঁদের দিকে তাকাল, একবার তার কোলের ছেলের দিকে। বৈশাখ মাসের কড়া রোদ ছেলেটার চামড়া পুড়িয়ে কালচে করে ছেড়েছে। তার গায়ে হাঁড়িয়া ভেজা হাতটা বুলিয়ে দিয়ে ঝুমরি কেমন উদাস হয়ে গেল। নেশার ঘোরে বুনো সুর তুলে নিল গলায়, ভারী সন্ধ্যায় সেই সুর এক মাঠ পেরিয়ে ছড়িয়ে গেল আরেক মাঠে।

পাতের গোড়ায় থুতু ফেলে চিল্লিয়ে উঠল বিন্দিয়া, চোপ কাকি। কাকের মত চেল্লাস নে।

ছেলের মুখ থেকে দুধ ছাড়িয়ে দিয়ে ফুঁসে উঠল ঝুমরি, চোপ করব কেনে, তোর ভয়ে?

—কে মোকে ভয় করতে বলেচে? বিন্দিয়ার ঠোঁট উল্টে গেল অভিমানে। শান্ত হল না ঝুমরি, গলা চড়িয়ে বলল, ভাতার খেদান মেয়েমানুষের কথার ছিরি দেখ! আমি হলে এ মুখ আর বাপের দোরে দেখাতাম না, গলায় কলসি বেঁধে ডুবে মরতাম না হলে ফাঁস লিতাম।

আজ নয়, এই নিয়ে হাজারবার খাওয়ার খোটা দিল ঝুমরি। রাগে গা চিড়বিড়িয়ে ওঠে বিন্দিয়ার, চোখ লাল করে সে বলল, আমি কারোর বাপের কামাই খাই না। গতর খাটাই, পেট ভরাই। এতে কার বাপের কি এসে যায়?

—আমার বাপ তুললি, তুর সাহস তো কম লয়! ঝুমরি কোলের ছা-টাকে চাটাইয়ে শুইয়ে দিয়ে চোখের নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিন্দিয়ার উপর। টেনে হিঁচড়ে খামচা দিয়ে ছিঁড়ে নিল গোছাখানিক চুল। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল বিন্দিয়া, ছাড় মাগী, ছাড়।

ঝুমরি তবু থামে না।

নিরুপায় বিন্দিয়ার ধারাল নখ চিরে দিল ঝুমরির মুখের চামড়া। রক্তের ধারা কিলবিলান কেঁচোর মতো নেমে এল গাল বেয়ে। কেঁদে গড়াগড়ি খেল সে। পীতাম্বর আগুন উগলানো চোখে বিন্দিয়ার দিকে এক ঝলক তাকাল। কিন্তু বিন্দিয়াকে মুখ ফুটিয়ে সে কিছু বলল না। তার রাগ গিয়ে পড়ল ঝুমরির উপর। চুলের মুঠি ধরে চাটাই থেকে টেনে তুলল তাকে, উঠ শালী। তু যিখানে গেচিস, সিখানেই ধান্দা চোপাট হয়েছে। কাল আলা ফুটার আগে ভাগে তু ইখান থিকে ভাগবি। না হলে তুর শরীল থিকে ধড় ছিঁড়ে আমি আলাদা করে দিব। মাথাটা উপর নীচে বারকয়েক ঝাঁকিয়ে আচমকা ছুঁড়ে দিল পীতাম্বর। ঝুমরি গড়িয়ে গেল গোড়া কাটা, ডগা ছাঁটা খেজুরগাছের মতো। হোঁক সামলে উঠে দাঁড়াল কিছু পরে। তারপর পীতাম্বরের দিকে জল ভরা চোখে তাকিয়ে বাতাস ফাড়িয়ে কাঁদল, ই আমার কী কপাল গো-ও-ও! রামসীতা সব উপরে থেকে দেখচে। তাঁর বেচারে তুমি ছাড় পাবেনি। সে তুমারে ঠুসে ঠুসে মারবে।

সন্ধ্যার ভারী ওড়না সরে গিয়েছে চরাচর থেকে। সে চাঁদটা আকাশে কিশোরী চপলতায় খেলা করছিল তার এখন যৌবন। ফকফক করছে ফিটকিরি রঙা জ্যোৎস্না। ঝুট ঝামেলায় নেশা ছুটে গেছে ভিক্ষাম্বরের। তার মন বেজায় খারাপ। মেয়েছেলের ঝগড়া-কাজিয়ায় পীতাম্বরের আগ বাড়িয়ে জড়িয়ে পড়া উচিত হয়নি। ঝুমরি নাকের সঁকড়ি টেনে কাঁদছিল। বটতলা থেকে গোঁসা করে সে চলে গিয়েছে খেজুরগাছের গোড়ায়। সারারাত সে ওখানে দাঁড়িয়ে কাঁদবে। পীতাম্বর গিয়ে হাত ধরে না টানলে সে ছাউনিতে আসবে না। ছাউনিতে

এলেই পাল্টে যাবে পীতাম্বর। ঝুমরিকে ওদলা করে চটকাবে। তীব্র সহবাসে স্থিতু হবে দু'জনের মন। এ ভিন্ন আর কোনো ওদের পথ নেই। কিন্তু কী হবে বিন্দিয়ার? মা মরা ভাতার খেদানো মেয়েটার মাথায় হাত বোলানোর কেউ নেই। ভিক্ষাম্বরের বুকের ভেতরটা থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে মেয়ের চিন্তায়। সে বেঁচে থাকতেই এত কিছু,মরে গেলে কে দেখবে তার মেয়েকে? দিগম্বর তাল জ্ঞানহীন, হুশকানা। তার ভরসায় বিন্দিয়াকে ফেলে সে স্বর্গে যাবে কোন সুখে? বোহু যমুনাবতীর হালও সেই একইরকম। ঘাড়ের উপর ননদ শ্বাস ছাড়লে তারই বা সুখের ঘুম আসবে কী ভাবে?

ফাঁকা মাঠ পেরিয়ে বিন্দিয়া রাতে রাতেই চলে গিয়েছে অনেক দূরে। তার সবুজ শাড়ি জ্যোৎস্না-আলোয় ফুল বোঝাই ঝোপের মতো দেখায়। খালের দিকে হা-করে চেয়ে আছে বিন্দিয়া। তাহলেকী তাকে জোয়ারের জল টানছে? এর আগেও মেয়েটা গলায় ফাঁস লাগাতে গিয়েছে। সেবার ঝামেলা যমুনাবতীর সঙ্গে। দু-খাবলা বাসি ভাত বেশি খাওয়ার অজুহাতে 'বোহু' তাকে চুলের মুঠি ধরে মারল। মেয়েটার নাক ছেঁচে গিয়েছিল তালগাছের খসখসে গোড়ায়। সে দিনও যমুনাবতী নির্দয় স্বরে বলেছিল, মর, রাঢ় মাগী তু মর। কেনে জ্বালাতে এয়েচিস মোর ঘরে? তুর কি আর কুথাও মাটি জুটল না।

ঢ্যাঙ্গা আলে উঠে এসে বুড়া ভিক্ষাম্বর কাঁপা কাঁপা গলায় ডাকল, এ বিটিয়া, বিটিয়া রে-এ-এ।

বুড়ার কণ্ঠস্বর কানে যেতেই হাওয়া লাগা বেবুরগাছের কচি ডালের মতো নড়ে উঠল বিন্দিয়ার গা-গতর। সে শুধু একবার পিছন ফিরে তাকাল। স্নেহের ফাঁসজালে সে আর ধরা দিতে চায় না। সে তো বোকা হওড়া—কৌয়া নয়। সে রক্ত মাংসের নারী। এ বন্ধন ছিঁড়ে সে পালাবে। যতদূর চোখ যায় সে পালাবে। আর কারোর ফাঁদে ধরা দেবে না।

ফাঁকা মাঠে বিন্দিয়া ছুটছে, তার আঁচল উড়ছে, পতপতিয়ে। বুড়া ভিক্ষাম্বর পিছু নিয়েছে মেয়ের। গলায় তার একটাই শব্দ ঃ এ বিন্দিয়া, ঘুরোন আয় বিটিয়া। গুঁসা করিস নে। এ বুড়া হালিয়া তো বেঁচে আচে। এ বিন্দিয়া, তু কেনে মরবি। এ বিটিয়া আ-আ-আ।

বুড়া গতর, জোয়ানী বিন্দিয়ার সঙ্গে পারবে কেন? মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে খালপাড়ে পৌছে গেল বিন্দিয়া। ভিক্ষাম্বর এল তার অনেক পরে। তার আগে পৌছে গেছে লেজ কাটা শিকারী কুকুর দুটো। ওরাই পথ আটকে দিল বিন্দিয়ার। পালাতে গেলেই কুকুর দুটো বাধা হয়ে দাঁড়ায়, আঁচল চেপে ধরে দাঁত দিয়ে। শ্লথ হয় গতি। ঠিক কাঠপোলাটার কাছে ভিক্ষাম্বর ছুটে এসে আবেগ ভেজা হাতে চেপে ধরে বিন্দিয়ার হাত, এ বিটিয়া, তু কুথায় যাবিক? হামার সাথ চল।

—না বাপ। হাত ছাড়ি দে। মুই আর যাবানি। দাঁতে দাঁত টিপে দাঁড়ায় বিন্দিয়া, কেউ মোর ভালা চায়নি। মুই কেনে যাবা?

—মুই তো তোর ভালা চাই, বিটি। ভিক্ষাম্বরের চোখ থেকে অপত্য স্নেহের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তুয়ার মা'টা চলি গেলা। তারে মুই বাঁচাতে পারলিনি। কত মানত করলি, পূজাপাঠ দিলি, মুরগা বলি চড়ালি তবু সে চলি গেলা।

—তার সময় হয়েছিল, সে চলি গেলা। মোরও সময় হিচে, মুইও যাবা।

—তোর দুটা গোড়তল ধরি। এ বিটিয়া, তুই ঘুরোন চল। ভিক্ষাম্বর উবু হয়ে বসে পড়ে মেয়ের পায়ের গোড়ায়, হাতজোড় করে বিড়বিড়িয়ে ওঠে, মুই বাঁচি থাকতে কেউ

তুর গায়ে হাত দিবেনি—কথা দিলাম।

—বুড়া হালিয়ার কথার কী দাম?

—দাম আচে রে বিটিয়া, দাম আচে! এরপর থিকে মিলায় নিস। ভিক্ষাম্বর জলভরা চোখে তাকাল। নোনাজল চেটে খায় জ্যোৎস্নার গতর। প্রহর ঘোষণা করে ডেকে ওঠে শেয়াল তারস্বরে। শ্মশানের ওদিক থেকে অদ্ভুত ভৌতিক শব্দ ভেসে আসে।গা হিম হয়ে আসে বিন্দিয়ার। বাপের গা ঘেঁষে সে দাঁড়ায়। বিড়বিড়িয়ে বলে, মোর জন্যি তু কেনে মরবি, বাপ। শুধু তুর জন্যি আমি মরতে পারিনে। কেনে তু অ'মারে বাঁধিস?

—কাঁচা চুলে এ দুখ বুঝবি নে, বিটি। তুর চুল পাকুক তখন বুঝবি। ভিক্ষাম্বরের হাড় জাগান বুকের উপর জোয়ারের জলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল বিন্দিয়া। চোখের জলে ভিজে গেল বুড়োটার লোল চামড়া। মেয়ের গায়ে পিঠে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে সে বললো, চল্ বিটিয়া। রাত ঢের হয়েছে। মাঠপুকুরের বটগাছের ঘন পাতার ফাঁকে টিপির জোনাক জ্বলে। আগে বিন্দিয়া, পেছনে হাঁটে ভিক্ষাম্বর বুড়া। শিকারী কুকুর দুটোর মনে স্ফূর্তি রে না। যে দুটো দানা দেয় তাব মূল্য কি চুকানো যায়? ছাউনীর কাছে এসে ছেঁড়া আঁচলে মুখ ঢেকে বিন্দিয়া অঝোর ধারায় কেঁদে ওঠে।

## ।। তিন ।।

কাক উড়ে গেল পচা জাল ছিঁড়ে। সারা মেহনতটা মাটি হয়ে গেল ভিক্ষাম্বরের। কপাল পড়ে আফসোস করে সে ইষ্টদেব রাম সিংয়ের নাম নিল।

তার কপাল চাপড়ান দেখে ঝোপের আড়াল থেকে ছুটে এল পীতাম্বর। হড়হড় করে লল, কৌয়ার যদি দশ দিন হয় কুয়ামারাদের একদিন। সে দিনটা যে কবে আসবেক ড়দা—মুই বুঝি পারি নাই। আজ পুরা দিনটা মাটি হলো। চল ফাঁসজাল গুটিয়ে ছাউনিতে ই। সুতা পচে গেলে জালের এক ফুটাকড়ি ইজ্জোৎ নেই।

পীতাম্বরের কথাগুলো ফেলে দেবার মতো নয়। আফশোস থামিয়ে বিড়ি ডিবা থেকে টো বিড়ি বের করল ভিক্ষাম্বর। এতক্ষণ নেশা করেনি যদি ম্যাচিস জ্বালাবার শব্দে চতুর াক উড়ে পালায়। এখন আর নেশা করতে বাধা নেই।

কাকের মাংস খাবে বলে ছাউনির অনেকেই বায়না ধরেছিল ক'দিন থেকে। কানের ছে ঘ্যানর-ঘ্যানর করত বিন্দিয়া। সেদিন দিগম্বর একটা দ্যাঁড়াশ সাপ মেরে আনল মাঠ কে। সাপটা হাত দুয়েক লম্বা তো হবেই। খড়খড়ে ধানমাঠে তার গতি উড়োজাহাজ। ড়িয়ে সাপটাকে কাবু করে দিল দিগম্বর। বাকি কাজটুকু কুকুর দুটো করে দিল। দৌড়ে সে ওঠা দ্যাঁড়াশ সাপটাকে পাকা বাঁশের লাঠিতে সে মাটির সাথে মিশিয়ে দিল। তারপর ই লাঠির ডগায় সগর্বে সাপ ঝুলিয়ে ফিরে এল ছাউনিতে। বিন্দিয়া তখন ডান হাতের ক্ষতে মিঠা তেল ঘষছে। অতবড় সাপ দেখে খুশিতে তার হাতের চুড়ি নড়ে উঠল। র্মার ছেলে পিঠে বেঁধে দৌড়ে এল। সেদিন ছাউনিতে দিগম্বরের জয়জয়কার। বুড়া

ভিক্ষাম্বর পুত্র গর্বে গলা চড়িয়ে বললো, আমি চোখ বুঁজলে এ ছুঁয়া দল টানবে।

পুকুরয়াড়িতে কাদামাছের ছাল ছাড়ানোর মতো দ্যাঁড়শ সাপের ছাল ছাড়াল দিগম্বর এত সহজে ছাল ছাড়ানো যায় যা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি বিন্দিয়া। টাঙ্গির কোপে দ্যাঁড়াশ সাপের মাথা কেটে বাদ দিয়েছিল। প্রায়ই বিঘোৎ খানিক মাথা বাদ দিয়ে ছাল ছাড়িয়ে দিল দিগম্বর। পা দিয়ে চেপে ধরে বলপ্রয়োগ করেই চামড়া আর রক্ত টুপা মাংসদড়ি আলাদা হয়ে গেল। গোলমরিচ, হারামিরচা, তেজপাতা, পিঁয়াজ-রসুন আর গোলআলু সহযোগে জুঁত করে রাঁধলে ঝোল ঝাল স্বাদ। তবু মন ভরল না কারোর খেতে বসে বিন্দিয়াই বলল, দুধের সুয়াদ কি ঘোলে মেটে?

—কেনে, কেনে? ভিক্ষাম্বর শুধালো।

বিন্দিয়ার অকপট স্বীকারোক্তি, কৎ দিন কোউয়ার মান্‌সো খাইনি। কুয়ামারার ঘরে বিটি মুই। কোউয়ার মান্‌স না খেলে মন ভরেনি! তার কথায় সায় দিল ছাউনির আরও অনেকে। দশের যা মত বুড়ারও তাই মত। অগত্যা কাক ধরার ফাঁসজাল বেরল কাপড়ে পুঁটলি থেকে। ছোট ভাই পীতাম্বরকে খরাবেলায় কাছে ডেকে বুড়া ভিক্ষাম্বর বলল, দশে রায় ঘাড়ে পেতে লিতে হয়। ফাঁসজালটার আর দম নাই। উটাকে সারতে হবেক।

দুই ভাইয়ে মিলে হাতে হাত লাগিয়ে বসে গেল কাজে। পীতাম্বর অবশ্য বলেছিল বড়দা, ইটার আর জোর লাই। সুতায় পচন ধরচে। আর ধরবে নি কেনে? বাপের আমলে ফাঁসজাল কৎদিন আর চলবে?

সব কিছু জেনে-শুনেও সেদিন কোন জবাব দেয়নি ভিক্ষাম্বর। নতুন একটা জাল বুনতে মেলা টাকার ধাক্কা। অত টাকা একটা শুয়োর বেচলেও আসবে না। পুরনো ফাঁসজালটাকে গাবকষে চুবানোর ইচ্ছা ছিল তার। সময়ের অভাবে সেটাও হয়ে ওঠেনি। অগত্যা পা সুতোর জাল নিয়ে বাঁশঝাড়ের দিকে বেরিয়ে পড়েছিল ভিক্ষাম্বর। ভাল কাজে যাওয়া আগে শুধু রাম-সীতার স্মরণ নিতে হয়, ছাউনি জাগিয়ে যেতে নেই। পীতাম্বরের হাতে বাঁশডগাল, গুঁজি আর ভেজান চাল। এছাড়াও বাসি ভাত এক বাটি। ভোর হওয়ার আগে কাক জেগে ওঠে বাঁশঝাড়ে। বাঁশডগালে বসে ওরা একে অন্যকে জাগান দেয়। আলো ফুটলে যে যার উড়ে যায় খাদ্যের সন্ধানে। ফাঁসজাল বিছিয়ে দড়ি ধরে চুপচাপ বসেছিল ভিক্ষাম্বর। বাঁশবনের মশা তার মনোসংযোগ নষ্ট করতে পারেনি। জলো মশা ফুলিয়ে দিয়েছে গা-গতর তবু সে সয়ে গিয়েছে মুখ বুজে। গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছে কাঠ-পিঁপড়ে তবু সে নড়েনি, চড়েনি। পীতাম্বর ছিল খেজুরগাছটার আড়ালে। ধূর্ত কাক তার ছায়া দেখতে পায়নি। সব কিছু ঠিকঠাক ছিল। ভাত দেখে উড়ে এসেছিল কাক খেতে গিয়ে দড়ির টানে লটকে গিয়েছিল ফাঁসজালে। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না!

ভিক্ষাম্বর আফশোস করে গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, আচ মোদের কপালটাই খারাপ ভিখ মাঙ্গতে গিয়েও মনে হচ্চে সুবিধা হবেকনি। শিরা ছেঁড়া রক্তের মতো ছিটিয়ে পড়ে প্রভাতী আলো। ফাঁসজাল গুটিয়ে নিয়ে ভিক্ষাম্বর হাঁটছিল ঘাড় কুঁজিয়ে। পিছু পিছু হাঁটছি পীতাম্বর। খালি গায়ে জ্যালজেলে গামছা জড়ানো। মুখ ঝুঁকানো মাটির দিকে। ফাঁসজাল বিছিয়ে কাক পড়েনি এমন অঘটন কোনোদিন ঘটেনি। বিন্দিয়ার শ্বশুর হরিসাধন যে প্রথম এল সেদিন দশটা কাক একসাথে ধরা পড়ল। দিগম্বর পচা ডোবা থেকে হেঁ বর্শা ছুঁড়ে মেরে আনল ঢাউস একটা ভোঁদড়। তার দাঁতগুলো এত ধারাল দেখে ভয় পে

গিয়েছিল মেয়েরা। সবাই সেদিন এক বাক্যে বলল, ম্যায়াঝিটার বরাত ভালা। ভালা শ্বাশুঘর পেয়েচে। ওর মরদটাও গোরা বটে, কুয়ামারাদের মতুন কলিয়া নয়। ছাউনির এক টেঁরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিল বিন্দিয়া। মনের উঠোনে তখন ভ্রমরের গুঞ্জন। হাতে হলদি মাখার অপেক্ষা। হাতের লোহা-চুড়ির সাথে হলুদ মিশে গেলে তখন তো ইজ্জোত বাড়ে মেয়েছেলের। সেই দিনটাও একদিন এসে গেল। বস্তিতে শুয়োর মারল ভিক্ষাম্বর। দশ গাঁয়ের কাকমারাদের দল এল ছানাপোনা, বউ-ঝিওড়িদের সাথে নিয়ে। নাচা-গানা হল দিনভর, রাতভর। পচা ভাতে বাখরবড়ি গুলে সেদিন আচ্ছা সে হাঁড়িয়া বানিয়া ছিল বিন্দিয়ার মা ফুলঝুরি। হাসি তামাশায় নতুন বেয়াইয়ের মাথায় ঠেলে দিয়েছিল বাটি বাটি হাঁড়িয়া। সফেদ দাঁতে হাসির ফুলঝুরি ছুটিয়ে বলেছিল, মোর কলিজার টুকরো তুমার বেটা ছুঁয়াটার হাতে সঁপে দিলাম। বিটিয়া আমার কুনোদিন দুখ্ পায়নি। বাসি ভাত না খাইয়ে বিটিরে আমি ভুজা খাইয়েচি।

সেই আদুরে বিন্দিয়া গাঁয়ে 'উদকাঠি' নিয়ে ফেরি করতে যাবে বলে মনে-প্রাণে তৈরি। শাড়ি ছেড়ে পা-লুটান ঘাঘরা পরেছে সে। বেনুনী করা চুলের ডগায় কলকে ফুল দোলে। হাত ভর্তি কাচের চুড়ি দুনাকের লতিতে শোভা পাচ্ছে পেতলের নাকছাবি। গলায় সস্তা পুঁতির মালা ঘাড় বুক ছাপিয়ে নাভির কাছে ঠেকেছে। কাচের চুড়ির মাঝখানে রূপোর রু রুলি। ঝুমরি বলেছিল, ওগুলো খুলে ফেলে নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে। দেয়নি সে, াতে পারেনি। বৃন্দাবনের প্রেমকাতর মুখটা মনে পড়েছে। মনের মানুষটা কী ভাবে যেন ড়ে গেল। ফাটা মাটির মুখ করে তাকাত। কথা বলত না। হরসময় নেশার ঘোরে বুঁদ য়ে থাকত। বেচাল দেখলে হাতের সুখ মিটিয়ে পেটাত। তবু মাটি কামড়ে পড়েছিল বন্দিয়া। ভিটে ছাড়া হতে চায়নি সে। বুড়া বাপটার কাছে ফিরে গেলে সে জানত কদর াড়বে না। সোয়ামী খেদান মেয়েছেলের দান কাকের পালকের চেয়েও মূল্যহীন।

ছাউনির সামনে দড়াম করে ফাঁসজালটা ছুঁড়ে দিল ভিক্ষাম্বর।

সাদা কচার ডাল ভেঙে দাঁতন করল সে। বিন্দিয়া তার ভার মুখ দেখে কাছে এসে ধোল, এ বাপ, তুর আবার হলো কি?

ভিক্ষাম্বর চোখ রগড়ে তাকাল, বেজার মুখে বলল, মশাগুলান কেমড়ে খেয়ে নিল ন। কী করব বল? কোউয়ার দল ফাঁস ছিঁড়ি পালাল।

—হেতো বর্শা মারলনি কেনে?

—বুড়া হয়েচি, অখুন কি আর আগের সেই তাক্ আচে? দুঃখের মধ্যেও হাসল ক্ষাম্বর।

বিন্দিয়া ভিজে ভাতের সানকিটা এগিয়ে দিয়ে বলল, খপাখপ পাখাল ভাত খাই লাও। চড়চে। গাঁ ঘুরতে কখুন যাবা?

—যাবা রে বিটি যাবা। হাঁপ ছেড়ে ভিক্ষাম্বর মেয়ের মুখের দিকে তাকায়। এখনও গুন আছে বিন্দিয়ার গনগনে শরীরে। জলে ধোওয়া বাহারী কাচ বোতলের মতো পেছল ীর। টানা চোখ দুটো অবিকল ফুলঝুরির মতো। এই মেয়েকে, এই উসকানো আগুনকে কোথায় লুকাবে?

ভিজে ভাতে পেঁয়াজ চটকে ভিক্ষাম্বর শুধোল, বিটিয়ারে, কাঁচা মিরচা থাকলে গুটে ? ঝাল ঝাল না লাগলে কণ্ঠা দিয়ে ভাত নামে না।

এই খাওয়া, আবার খাবে সাঁঝবেলায়। ঢেলার ঝুঁটি বানানো চুলায় শুখা কাঠ ঠে
দিয়ে চুলাফুঁকায় ফুঁঃ দেবে বিন্দিয়া। আগুনের সাথে ধোঁয়া উঠবে ভক্‌ভকিয়ে। মাঠ পুকুরে
জলে ডুব দিয়ে আসবে ভিক্ষাম্বর। তারপর 'রাম-সীতার' নাম নিয়ে চাটাই পেতে বসবে
তাসপালি পেটাবে ছেলেছোকরারা। পীতাম্বর জানোয়ারগুলো গুণতে চলে যাবে। গো
ঠিকঠাক হলে বড়দার পাশে বসে বলবে, মাল ঠিক আছে। তবে জানোয়ারগুলানের পে
উঠেনি। কামধান্দায় ফাঁকি মারছে ব্যাটারা। এই ভাবে রাত কেটে ভোর হবে। এক ভো
থেকে লাফিয়ে চলে যাবে অন্য ভোরে। গড়িয়ে যাবে বয়স। কেলেঘাই নদীর জলও থে
থাকবে না। অবসাদ, হতাশা ঝেড়ে ফেলে ভিক্ষাম্বর তৈরি হয় ভিক্ষায় যাবার জন্য। ভিক্ষ
ছাড়া তাদের তো কোনো গতি নেই। সব দুয়ারে হাত পেতে দাঁড়ালেই যে ভিক্ষা পা
তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। ভিক্ষাম্বর লাল আলখাল্লাটা চাপিয়ে নেয় গায়ে, নিবি
চোখে তাকিয়ে থাকে সে। ডানহাতে লোহার বালা, সেই সঙ্গে গলায় পরে নেয় রং
বেরঙের পুঁতির মালা। শুধু পুঁতি নয়, হাড়ের মালাও শোভা পায় গলায়। কাঁধে ঝুলি
নেয় কাঁথাকানি দিয়ে বানানো ভিক্ষার ঝুলি। গলায় ঝুলতে থাকে শুয়োর দাঁতের আড়াআ
দৃশ্যমান তাবিজ। সিঁদুর ভিক্ষাম্বরের প্রিয় প্রসাধন। বুড়ো আঙ্গুলে সিঁদুর চুবিয়ে তিল
আঁকে সে। তিলক আঁকা শেষ হলে লাল কাপড়ের পাগড়ি বাঁধে। তালিতাপ্পি মা
আলখাল্লায় তাকে যেন আর চেনাই যায় না।

পীতাম্বর গাঁয়ে যাবে ভিখ মাঙ্গতে। ভিক্ষাম্বর যদি পুব দিকে যায় তাহলে সে যা
পশ্চিমে। হাতের লোহার বালায় বাঁটহীন চাকুর ঠোকাঠুকি লাগিয়ে শব্দ তুলবে। ভা
গলায় দেহাতী সুরে গেয়ে উঠবে ভিক্ষার গান ঃ হারে-হারে-হারে, ব্রাহ্মা.....। শিবদু
ব্রহ্মা মহেশ্বর সবারই উপাসক তারা। ভিক্ষার সময় রাম-সীতার বন্দনা সবার উর্দ্ধে। রা
সীতা ছাড়া তাদের দৈনন্দিন জীবনবন্দনার সমাপ্তি হয় না।

মাঠপুকুরের পাড়ে উঠে ভিক্ষাম্বর বলে, মুই যাচ্ছি পুব দিকের গাঁ-খানায়। তুরা
খালধারে। বেলা পড়লে তুয়ার সাথে বেবুরগাছতলায় দিখা হবে।

অনুগত ঘাড় নাড়ে পীতাম্বর, 'জয় রাম সীতার জয়' বলে সে হনহনিয়ে হেঁটে য
মেঠো পথে। আজ অনেক দেরি হয়ে গেল। দিগম্বর তানুভাত খেয়ে চলে গিয়েছে অ
আগে। ছোকরাটার মনে অনেক দুঃখ। ওর বউ যমুনাবতী রোগে ভোগে সদা সর্বদা। জটেশ
আর মহেশ্বর তার দুই ছেলে। ছেলে দুটোরও গুণের শেষ নেই। এই বার-তের বছর বয়
তারা উদ্‌বিড়াল, কাঠবেড়ালী আর বেজী মেরে আনে বন থেকে।সাপের গর্তে মাটি খুঁ
ধরে আনে জাতসাপ। ধেড়ে ইঁদুর, মেঠো ইঁদুর তাদের ভয়ে জমির আল ছেড়ে পালিয়ে
এমন যার গুণধর ছেলে, তাদের নিয়েও সুখী নয় দিগম্বর। কী করে সুখী হবে সে য
ঘরে নিত্য কলহ। যমুনাবতী অসুখে ভুগে ভুগে যত না কাহিল তার চেয়ে বেশি কা
সন্দেহ রোগে। কাকমারা সমাজ কেন যে কোন সমাজেই সন্দেহ রোগটা একবার দে
দিলে উইপোকার মতো কুরে কুরে খায় সব কিছু। সন্দেহ রোগ শুধু মন খায় না, শর
খায়। পীতাম্বর দুঃখ প্রকাশ করে নিঃশ্বাস ছাড়ল। তার ভাইপোর কোন তুলনা নেই। ম
দুধ সফেদ।

ভিক্ষাম্বর বটতলা পেরিয়ে চলে গিয়েছে পূবের গাঁয়ে। বেশ জমাট বাঁধা ছায়া ঢা
গ্রাম। সম্পন্নতার চিহ্ন সবখানে। গাঁয়ে ঢোকার পথটায় এসে এক খাবলা ধুলো নি

কপাল ছুঁয়াল ভিক্ষাম্বর। তার বাপ-ঠাকুরদা নিত, সেও নেয়। এতে নাকি ফাঁড়া কেটে যায়, উপার্জন ভাল হয়। সরু পথ এঁকে বেঁকে সাপের মতো চলে গিয়েছে গ্রামের ভেতর। বুড়ো বটতলায় একটা চাপা কল। কলের দশ হাত তফাৎ-এ শাসমলদের বাঁশডোবা পুকুর। পুকরের জলমাপা খুঁটিবাঁশে মাছরাঙা বসে আছে পিঠে রোদ লাগিয়ে।

ভিক্ষাম্বর বটতলায় এসে ডানে-বাঁয়ে তাকাল। পাড়ার কুকুরগুলো তাকে লক্ষ্য করে ডাকছে। গাঁয়ে ভিখ্ মাঙ্গতে এসে সে এই কুকুরের ভয়ে লেজ কাটা কুকুর দুটোকে আনে না। তাহলে বিপদ চরমে উঠবে। চারপেয়ে জন্তুর লড়াই-কাজিয়ায় মুখর হবে বাতাস।

কুকুরগুলো পাড়া মাথায় তুলে ডাকছে। বটতলায় দাঁড়িয়ে থাকা গোরুগুলো চোখে-মুখে সন্দেহ। এমন আজব পোশাক, বিচিত্র পেশার মানুষ কদাচিৎ ওদের চোখে পড়ে। পিল পিল করে ছুটে আসছে গাঁয়ের আধা উদোম ছেলে-মেয়ের দল। বড়দেরও উৎসাহ কম নেই। দেখতে দেখতে ভিড় জমে যায় বটতলায়। কানাকানি কথা সন্দেহ ভাসে হাওয়ায়। কে যেন বলে, ইবার সাবধানে থাকতে হবে। গাঁয়ে এবার চুরি-চামারী বাড়বে। কাকমারার দল তাবু না গোটান পর্য্যন্ত আর শান্তিতে ঘুমানো যাবে না ঘরে।

কথাগুলো শুনে চিড়বিড় করে ভিক্ষাম্বরের গা-গতর। মনের ক্রোধকে থাবা মেরে থামিয়ে দেয় মনের ভেতর। ঠোঁটে ফুটে ওঠে পান্‌সে হাসি। লোহার বালায় ইস্পাতচাকুর আঘাত করে মনযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে। কখনও বা ঝুলি থেকে বের করে আনে পাতলা চিমটা। চাপ দিয়ে বাজনা বাজায়, ভাঙা ভাঙা স্বরে গান গায় অবোধ্য ভাষায়। মুখে থুতু উঠে আসে। ছেপ ফেলে ঘন ঘন। এটা ওদের মজ্জাগত অভ্যাস। দোক্তা গুণ্ডি দেওয়া পান চিবোয় ভিক্ষাম্বর। হা-করে দেখে, চিনতে চায় গ্রামখানা।

কুকুরের ডাক থেমেছে। ভিড় করা মানুষগুলোর উৎসাহে ভাটা পড়ছে ধীরে ধীরে। হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল বটতলার সাদা ধুলো। দাঁড়িয়ে থাকলে পেট ভরবে না কাকমারাদের, চলাই ওদের জীবন। ভয়ে ভয়ে গ্রামের ভেতরে প্রবেশ করে ভিক্ষাম্বর। শীতলাথানের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়ায়। হাত-পা টান টান করে ভক্তি ভরে সপাট হয়ে পড়ে ভিক্ষাম্বর। বিড়বিড়িয়ে ওঠে ঠোঁট, হেই মা শীতলাবুড়ি, আচ মান রেখো গো। কন দিন ধরে খালি ঝোলা নিয়ে ফিরচি। আজ যেন তা না হয় না শীতলাবুড়ি।

প্রার্থনা শেষ হলে গায়ের ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ায় ভিক্ষাম্বর, পাগলের মতো লোহার বালায় বাঁটহীন চাকুর শব্দ তুলে সুরে সুর মিলিয়ে ভিক্ষার গান গায় ঃ নারায়ণু দান্নাম/ স্তনাদি/নিবদান্নাম হরিবোল্ গোবিন্দনাম বলো/ রাম-সীতার জয় হোক। দ্বারে দ্বারে শূন্য হাতে ফেরে ভিক্ষাম্বর। বেলা চলে যায় টিকলিতে। কপালের ঘাম বুকের নদী বেয়ে নাভিকুণ্ডে ঠেকে। গলা শুকিয়ে বাগের প্রকাশ ঘটে চোখে। ঘন ঘন থুতু ফেলে শুকনো গলাটাকে রাখতে চায় সরস। আর পারে না তেষ্টায় বুক ফেটে যাবার উপক্রম হয় ভিক্ষাম্বরের। সামনের পুকুরঘাটে নেমে গিয়ে হদী সরিয়ে জলপান করে। তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসে গৃহস্বামী, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে বলে, দিলু তো আমার গাড়িয়ার জল দূষিত করে। শালা অচ্ছুৎ। ভিখমাঙ্গা। তোরা আর ঘর পেলি না ভিখ মাঙবার?

হাতজোড় করে দোষ স্বীকার করে নেয় ভিক্ষাম্বর। গলায় খনখনে কান্নার সুর। লোহার বালায় চাকুর ঘন ঘন আঘাত করে গান গায়, দয়া অথবা কৃপা আদায় করার চেষ্টা করে। তাকে দেখে নিমগাছের ডালে বসা কাকটা ভয়ে ডাকছে, কা-কা।

দুপুরের বাতাস বুঝি খুন হয়ে গেল সেই শব্দে। ভিক্ষাম্বরের আমোদ বাড়ে। গৃহস্বামীর মাটির দোতলা ঘর। উঠোনে পর্বতসমান খড়গাদা। কত বড় লম্বা গোয়ালঘর। তুলসীতলার মাটির হাঁড়ির ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে টুপটুপ করে ঝরে পড়ছে জলের ফোঁটা। এ দৃশ্য তো আখছার খরাণীকালে গাঁয়েঘরে দেখা যায়। জলের ফোঁটায় তাজা তুলসীগাছ। অথচ ভরপেট জল খেয়ে খরায় শুকিয়ে যেতে থাকে ভিক্ষাম্বর। গলা ছেড়ে ছেপ ফেলে কণ্ঠির বেড়ায়। শুকনো শ্লেষ্মা মাকড়জালির মতো ঝুলতে থাকে সেখানে। ভিক্ষাম্বর আগড় ধরে দাঁড়িয়েছে। এখানে তার প্রাপ্তিযোগ অবশ্যই লেখা আছে। মা শীতলাবুড়ির দয়ায় সে আজ খালি হাতে ফিরবে না। গলায় কাকুতি-মিনতি মিশিয়ে ভিক্ষাম্বর রাম-সীতার জয়গান গায়। লোহার বালার শব্দ তোলে ন্যাঙ্গা চাকুর, হেই বাবু, টুকে যেন দয়া হয়। মুই গরীব মানুষ। তুদের দয়ায় মোদের পেটের গাত ভরে।

বাবু নির্দয় চোখে তাকায়, যা ভাগ। ভাগ বলছি। নাহলে মারিকী তোর হাড়-পাঁজর গুঁড়া করি দিবা। শালা, তোদের চিনিনি আমি! তোরা দিনের বেলায় ভিখ্ মাঙ্গিস, রাতে কাটিস সিঁদ।

—মোরা চোর ডাকু নই বাবু। হেই বাবু, তোর গোড়তল ধরি, বিশ্বাস কর।

—এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললেও আমি তোদের বিশ্বাস করি না। বাবুর চো থেকে আগুন ঠিকরায়, পালা বলচি, পালা নাহলে কুকুর লেলিয়ে দেব।

কথায় কাজ হবে না দেখে বুনো, আনপড় মানুষটার মুখ ফোটে, তাহিলে ভিখ্ দিবি তু? মোর রাম-সীতা উপাস দিবে।

—না, না। এক মুঠা চাল তোদের আমি দেব না। বাবু তড়পায়। ভিক্ষাম্বর আবা বলে একই কথা, তাহিলে ভিখ দিবুনি তু? তুর অতো আচে তবু তু রাম-সীতাকে গ মুঠা চাউল দিবুনি?

—বললাম তো দিব না। বাবু অনড়।

—তাহিলে এই নে মোর ভিখ্ তু। ভিক্ষাম্বরের চাওড়া হাতের পাঞ্জা জড়িবুঁটিতে ক মানা জাতসাপের ফনার চেয়েও জড়োসড়ো হয়ে আসে। আঙ্গুল সমেত হাতের কব্জি জো করে ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় নিজের মুখের ভেতর। 'ওয়াক ওয়াক' বমি ঠেলে আসে। হড়হড়ি বমি ঠেলে দেয় সে বাবুর নিকোন উঠোনে। চোখ ছিটকে বেরিয়ে আসে জল। অর্ ভাতের টুকরো গাড়িয়ে যায় উঠোনে। চোখ মোছে না, ভিক্ষাম্বর জল ভরা চোখে ফি আসে ধুলো পথে। পুরো মুখ তখন শুধু তেতো।

## ।। চার।।

অসময়ের ঝড়ে ছাউনি উড়ে পড়ল মাঠপুকুরের জলে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ভেঙে হাঁড়িকুঁড়ি। ভিজে গেল কাঁথাকানি। ছাউনি আটকাবার জন্য মন্থরা বুড়ি ছাড়া আর ছিল না। সে দু'হাতে যতটুকু পারল বাঁচাল, বাদবাকি সব লণ্ডভণ্ড হল অসময়ের ঝড়জ

এসময়ে ঝড় হবারই কথা। ক'দিন থেকে যা গরম পড়েছে তাতে মাথা বাঁচান দা

ভিক্ষাম্বর তাতা মাটির ফাটা মুখ দেখে বিনা দ্বিধায় বলেছিল, মাটির হালচাল ভালো বুঝিনে। মাটি তাতলে আসমান তাতে। আসমান তাতলে মেঘ হয় ম্যায়াঝি। আর মেঘ ম্যায়াঝি গাভীন হলে ছানাপোনার জনম দিবে। আসমানের ভার মুখ মোর কলিজার ধড়কন বাড়ায়।

বুড়া মানুষটার কথা সেদিন ছাউনির কেউ গা করল না। শুধু মন্থরাবুড়ি ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, কী যে হিবে কে জানে। সবই রাম-সীতার লীলাখেলা।

দেখতে দেখতে ক'টা দিন চলে গেল দিব্যি। সেদিন মাঠপুকুরের নীল জল দাবিয়ে জাল ফেলে একটা পাকা রুইমাছ ধরল পীতাম্বর। মাছটার কানকোয় হাত ঢুকিয়ে সে ঝুমরির দিকে ছুঁড়ে দিল। দেখেশুনে চোখ ছানাবড়া ঝুমরির। শুধু আহ্লাদ-আবেগে ঠোঁট কাঁপছিল তার।

সাহাড়দা হাটে উদকাঠি আর নজরকাঠি বেচতে গিয়েছিল সে আর বিন্দিয়া। তার পিঠের উপর ছ'মাসের খোকা কাপড়ে বাঁধা। বিন্দিয়া বলেছিল, কাকি, তুমার সুখ দেখে মোর চোখ টাটায়। শীতলাবুড়ির দয়ায় তুমার কুনো কিছুর অভাব লাই।

বিন্দিয়ার মুখ-চোখ দেখে তাব দুঃখের গভীরতা অনুমান করতে পারেনি ঝুমরি। ছাউনিতে মেয়েটা একা। কেউ তাকে সাঙা করতে চায় না। বাড়কল্যাণপুরের বউ মরা গঙ্গারাম বিন্দিয়ার কথা লোকমুখে শুনে এসেছিল খোঁজখবর নিতে। গঙ্গারামের হাবভাব চালচলন দেখে মনে ধরেনি বিন্দিয়ার। চেহারা দেখে মনে হয় লোকটা যেন কাশরুগী। যতক্ষণ থাকল ভরপেট হাঁড়িয়া খেল গাছের ছায়ায়। দিগম্বর তাকে সাথ দিল। ভেবেছিল বোনটার বুঝি এবার একটা গতি হবে। গতি হওয়া তো দূরের কথা বিন্দিয়া ঐ কাক তাড়ুয়ারে মানুষটার কাছে ঘেঁষল না। সরবত দেওয়া দূরে থাক সে মুখ ফুটিয়ে একটা কথাও বলল না। একরাত থেকে গঙ্গারাম ভোরের দিকে চলে গেল। চারপাই গাছতলা থেকে তুলে এনে বোনকে ধমকাল দিগম্বর; তুর কি মাথায় টুকে মগজ-ঘিলু থাকতি লাই। মানুষটা অতটা পথ ঠেঙ্গিয়ে এলো, আর তু তার কাচে ঘেঁষলিনে। যাচা অন্ন ছাড়ি দিলু? ছ্যাঃ!

ঝড় চলে গেছে, মন্থরাবুড়ি একা একা জাবর কাটছে ঝড়ের। তার প্যাংলা গতরটা উড়ে যেত হাওয়ার তোড়ে, ভাগ্যিস সে একটা বটের ঝুরি ধরে দোল খেল। হাওয়ায় মেঘ উড়ল যত্রতত্র। কালো ধুমসা মেঘ পেটের জল হড়হড়িয়ে খালাস করে দিল। মেঘ ডাকল হাজার ঢাকের শব্দ তুলে। বজ্রবিদ্যুৎ শ্বেতক্ষরিসের ফণা বাগিয়ে বিষ ঢাললো মেঘের বুকে। বিষে নীল হলো নীলাকাশ। তখন তার গোঁসায় ভরা মুখ দেখে কে বলবে একটু আগে ফুটফুটে আদুরে রোদ ছিল।

মন্থরাবুড়ির চুল পাকেনি রসে, চুল পেকেছে বয়সে। বয়স কালে সে ছিল দলের লক্ষিরাণী। তাবড় তাবড় মরদগুলো তার কথায় উঠত বসত। একটু সঙ্গ পাবার জন্য হা-পিত্যেশ করত। যে দিন চলে যায়, সেদিন তো আর ঘুরে আসে না। পাকা চুল কোনদিন তো কালো হয় না। খালের পেটের মতো মানুষের পেট ভরা থাকে না সবসময়। পেট চায় মুখ তা দিতে পারে কই? হাতের শক্তি আর কতটুকু?

ঝড় থামতেই সবার আগে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল দিগম্বর। জলে ভিজে চুপচুপে তার গতর। ছাউনির চিহ্ন খুঁজে না পেয়ে কঁকিয়ে ওঠে সে, এ মওসী, এ কী হিলা রে? আঁধি-তুফান সব ভাসায় দিল। অখন কী হবেক।

মন্থরাবুড়ির ঘনচুলে উঠে আসে নোলাঝোলা হাত, না ঘাবড়ে বলে, ব্যাটা, ঝড়-জল আঁধি তুফান লিয়েই তো মোদের জেবন। গড়া যত কঠিন, ভান্‌গা তত সহজ। তা বলে কি মানুষ পাথর-চাট্টানে মাথা ঠুকে মরবেক? খাড়া হয়ে দাঁড়াবার চিন্তা কর ব্যাটা। কুয়ামারাদের কাছে এ ঝড়-জল কিচু লয়।

মন্থরাবুড়ি এখন আর গাঁ ঘুরতে যায় না, বয়সকালে সে শুধু উদকাঠি-নজরকাঠি বেচত। ঝড়ফুঁক করত দায়ে অদায়ে। পেট ধসানোর জড়িবুঁটি তার মোক্ষম। ছানাপোনা বিছানা ভেজালে, তরাসে চমকে উঠলে সে জলপোড়া দেয় ফুঃ দিয়ে। হাড়ির ঝি চণ্ডীর কিরা কাটে বারবার। ফুঃয়ের জোরে পেতলের ঘটির জল নড়ে থরথর।

দিগম্বর কপাল চাপড়ান থামিয়ে জলে নেমে টেনে তোলে কাপড় চোপড়। তাল-খেজুরের ছাউনিটা জলে ভিজে চুপচুপে। সে যখন জল থেকে উঠল তখন শুয়োরের পাল খেদিয়ে মাঠপুকুরের ভেজা ডাঙায় এসে হাজির হল পীতাম্বর। গায়ের কাপড় বৃষ্টিতে ভিজে জড়িয়ে গেছে গাছের ছালের মতো। ভেজা পুঁতির মালা থেকে জল চুয়াচ্ছে। ঝড়ের সময় শুয়োরগুলো তাকে বেগ কম দেয়নি। ভয়ে মাদীটা পালিয়ে গেল কচুবনে। হাঁটু ডোবা কাদায় বিশাল পেট ডুবিয়ে মাদীটা ঝড় সামলাল, ছ'মাসের ছানাগুলোর দুর্দশা চোখে দেখা যায় না। ছুটতে গেলেই উল্টে পড়ে হাওয়ার তোড়ে। এসময় মাল হারিয়ে যাবার ভয়। একবার হারিয়ে গেলে রাতভর খুঁজলেও হদিস মিলবে না। ডেঁড়ায় ফিরে তখন আবার ঝড়। প্রকৃতির ঝড় সামলান গেলেও মানুষের তৈরী ঝড় সামলাতে গেলে বুকের ভেতর হাওয়া থাকা দরকার। নাহলে জীবন বৃথা। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে থুঁতনিতে লাঠি ঠেকিয়ে সে অকোটি, রেণ্ডু মুরু করে গুণছিল শুয়োরগুলো। যতবার গোণে ততবারই কম পড়ে যায় একটা। পালের গোদা খিচড়া শুয়োরটা ভেগেছে। ওটারে পোষ মানানো দায়। দলে থাকলে তার মেজাজ ডাকাত সর্দারের মতো। শুধু অকারণে ফোঁসফোঁসানী, ঘোঁতঘাত লড়াই-ঝগড়া কাজিয়া। তার ভয়ে মাদীগুলোর জান তটস্থ। পীতাম্বর আবার গোণে, অকোটি রেণ্ডু, মরু......। এক-দুই-তিন. .. ....। হিসাব কিছুতেই মেলে না, ফাঁক থেকে যায় একটা কপালে দুঃশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে পীতাম্বরের, ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামতে শুরু করে সে। তার বিপদ বুঝে এগিয়ে গেল দিগম্বর, শুকনো পাতা মুখ দেখে শুধোল, তুর আবার হলোটা কী?

মাল মিলচে না।

কুনটা?

হারামীর খিঁচড়া শুয়ারটা কুন্‌ঠি গেলা বল তো?

কুন্‌ঠি আর যাবেক, ঘাপটি মেরে পড়ে আছে ঝোড়ে জংগলে। বাপ মোরে আস্ত রাখবে নি রে। কী হবে বলতো?

তু মউসীর কাচে থাক। মুই যাচ্চি। পীতাম্বরের কাছ থেকে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে দ্রুত গতিতে চলে গেল দিগম্বর।

ভিক্ষাম্বর ফিরল সাঁঝবেলায়। ঘুট্‌ঘুটিয়া আঁধারে ফুটকি ফুটকি তারা ভেসেছে জোনাকপোকার পিছু দপদপানী থামে না। হাড়মটমটী ঝোপের ভেতর কানামাছি খেলে বেড়ায় পেছন আলো করা পোকাগুলো। ঝরা পাতা আর ভেজা ঘাস মাড়িয়ে ভিক্ষাম্বর দাঁড়াল মন্থরাবুড়ির মুখোমুখি। শোক-তাপ সামলে ওঠা চোখ মুখ মন্থরাবুড়ির। ভিক্ষাম্বরের

সাহস দিয়ে বলে, ডরলে কাম চলবেক নি। যে ডরে, সে মরে। ঘা-দর্দ যা ছিল সব শুকিই গেচে। এখন আবার ভান্‌গা সনসার জোড়া লাগবেক।

পীতাম্বর পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। মাথা চুলকে বলল, পুকাড়ে কপাল। আচ যে কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম !

কথাটা মন্থরাবুড়িকে উদ্দেশ্য করে বলা। দলের সবাই বুড়িটাকে বলে, অপয়া। একথা জানে বুড়ি নিজেও। এই সংকোচ তাকে খুঁবলে খায় একান্তে। মানুষের মুখ দেখে গেলে হওয়া কাজ কেন হবে না? দুর্গা মাঈজীর একী বিচার? তার দেওয়া শরীরের কি কোনো দাম নেই?

পীতাম্বরকে থামিয়ে দিল ভিক্ষাম্বর, তারপর মন্থরাবুড়িকে বলল, দিদি গো, তু ছিলি, বলি সব বাঁচলা! যা হাওয়া বইলা, মুই ভাবলি যা সব গেলা।

পীতাম্বরের সাথে তার দেখা হয়েছিল বাবলাতলায়। মুখ ঝুঁকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল পীতাম্বর, হয়তো ভিক্ষাম্বরের অপেক্ষায়। রোজই তো এখানে দেখা হবার কথা।

ভিক্ষাম্বর বলেছিল, ঘুরে ঘুরে গোড়তল বিদনা হলো।

—ঝুলিতে দুটা চাউলদানা পড়েনি। কী করবা ভাই। এইঠি আর মন ধরচেনি।

পীতাম্বর কম কথার মানুষ। বয়স তাকে সৌজন্যতা শিখিয়েছে। তার ক্ষত-বিক্ষত নাঙ্গা বদন দেখিয়ে বলল, পুরা আকাল পড়িচে। লোকের হাত দিয়া পাউশ গলেনি। মুই আর কত ঘুরবো? হা দেখ মোর গোড়ফাটি খুন ঝরে।

নাঙ্গা পায়ের গোড়া ফাটা। চামড়ার হা মুখ বড় কদর্য। সেখান থেকে চুঁইয়ে নামছে রক্তের ধারা। নোনা ধুলোয় মিশে গিয়েছে নুনঘাম। রক্তে জেবড়ে গেছে পথের ধুলো। একটু হাঁটা চলা করলেই গোড়ালি টনটনায়। গ্যাংটা পাথরে খোঁচা লাগলে জীবন বেরিয়ে যাবাব উপক্রম। তবু জীবনের জন্য পথ চলতে হয়, পেটের জন্য লোহার চিমটা বাজিয়ে ভিক্ষার সুর ভাসাতে হয়। জ্ঞানপড়ার পর থেকেই তো এসব দেখছে। আগে বাপের হাত ধরে ঘুরত দোরে দোরে, এখন ঘোরে একা একা। লোহার বালায় ইস্পাতের চাকুর শব্দ হয় মৃদু মৃদু। এই শব্দ বুঝি কলিজার ধড়কন। তবু কাম কাজে মন নেই, কর্মভীরু ওরা।

শুধু কর্মভীরু নয়, ধর্মভীরুও বটে।

গৃহস্থের ঘরে পীতাম্বরের জন্য কিছু দয়া অবশিষ্ট ছিল না। চেঁচিয়ে, গান গেয়ে অঙ্গ-ভঙ্গি করে কোন ফায়দা হল না। দুপুরের নিষ্ঠুর রোদ বিষ ঢেলে দিল ব্রহ্মতালুতে। রাগের তুফান উঠল চড়বড়িয়ে। হাতের চাকু দিয়ে নিজের শরীরের ত্বক চিরে ফালাফালা করেছে মুঠা কয়েক চালের জন্য। তবু গৃহস্থের মন ভেজেনি। দয়া বা সহানুভূতির বদলে ঠেলে উঠেছে ঘৃণা। দূর দূর করে খেদিয়ে দিয়েছে। লেলিয়ে দিয়েছে বাঘগতর কুত্তা। তবু খুন ঝরা থামেনি পীতাম্বরের। কাটা চামড়া ফুল ফুটিয়েছে নোনা রক্তের। রক্তের গন্ধে উড়ে এসেছে ডাঁশমাছি।

ভিক্ষাম্বর ভাইয়েয় শোচনীয় অবস্থা দেখে শুধাল, তুর ঝুলিও ফাঁকা পড়ে আচে?

হ। ফাঁকা থাকবেনি তো কি ভরা থাকবে? পীতাম্বর মনের দুঃখে নিজের ছেঁড়াখুড়া গতরটা দেখাল। মালাইচাকি উদোম পেছনের ফুঁসকুড়ি চুলকে বলল, ইভাবে আর জবনটাকে ধরে রাখা যাবেক নি। চল বড়দা, ইবার ইখান থেকে পেলিয়ে যাই।

—যিখানে যাবি সিখানে সেই একই নাকে কান্‌দা।

জানোয়ার গুলানের পেঠ ভরছে না। কচু ঘেঁচু গু-গোবর সব খতম। দুনিয়াটা ছোট হয়ে আসচে। ভিক্ষাম্বরের কপালে ভাঁজ পড়ল, মুখের কাটাকুটি ভরা রেখাগুলো নড়ে উঠল জলকেঁচোর মতো। অনেকদিন পরে পীতাম্বরের গায়ে স্নেহের হাত রাখল সে, ভাইরে, গুটে কথা বলি, মন লাগিই কী শুন্। রাম-সীতার দয়ায় জীব দিচেন যে, পেট ভরাবে সে। মরা পেটের লাগি শরীলের খুন বইয়ে কুনো ফায়দা নাই। এতে শুধু খুন শুকায় না, সাথে সাথে মনও শুকায়। তবু মন মানে না ভাই। আলা ফুটলে গোড়তল নাচি ওঠে।

পীতাম্বর সব মন দিয়ে শোনে। চেরা চামড়ার রক্ত শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে ঝরে পড়ছে, ভিক্ষাম্বর তবু ভাইয়ের গা থেকে হাত তোলে না, আপন মনে বিড়বিড়ায়, শরীলের খুন আর ঝরাবু না রে ভাই মোর। খুন দেখলি পরে মোর মাথামুণ্ডু ঘুরপাক দেয়। তু'র ঝুলিও তো ফাঁকা।

হ। ঝুলি ফাঁকা মানচি কিন্তুক মন মোর ভরাট। চ ভাই, ঘরকে যাই।

ঘরে ফেরার সময় শুরু হলো ঝড়ের তাণ্ডব। ধুলো বালি আর শুকনো পাতায় ঢেকে গেল পুরো আকাশ। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে মেখে ওরা বয়স্ত দুই মানুষ শিশুবেলার মতো দৌড়াল।

বিন্দিয়া ফিরে এল সবার শেষে, সঙ্গে ঝুমরি আর তার কোলের ছেলে। ছেলেটার মাথা-পিঠ বাঁচিয়েছে ঝুমরি। সাহাডদা হাটে আজ তাদের কামাই খারাপ হয়নি। ছেঁড়া গামছায় নজরকাঠি বিছিয়ে চেঁচিয়ে হাঁকডাক ছেড়েছে ঝুমরি। লোক জড়ো হয়েছে তাদের দেখে। নজরকাঠি কেনার জন্য নয় তারা চোরা চোখে দেখছিল বিন্দিয়ার মাজা গায়ের রঙ, যা সচরাচর নজরে খুব কম পড়ে। পিঠছাপান ঢল নামা ঘন চুল হাওয়ায় ওড়ে চোখে নেশা ধরিয়ে। যাদের চোখে রঙ ছিল, সে রঙ আরও গাঢ় হয়। বিন্দিয়ার চোখের তারায় যাদুটোনা মেশান। নগ্ন মসৃণ বাহুযুগল কলার বেগোর চেয়েও মসৃণ। সবুজ শাড়ি তার শরীর ঢেকেছে। খোলা মুখের লাবণ্যভরা চাহনি রোদ ঢলে পড়া চকমকিয়া পাথর যেন। ঐ মুখের দিকে ক্ষণিক তাকিয়ে দৃশ্যসুখের আনন্দ মেলে না। তবু উপচে পড়ে দোহাতি ভিড়। নজরকাঠি, উদকাঠি কিনে নিয়ে যায় অনেকে। অতি উৎসাহী মুখ বলে, তোদের ড্যাড়া কুথায়? বিন্দিয়ার ঠোঁটে হাসি চলকে ওঠে মাঠপুকুরের পাড়ে।

মুই যদি যাই ভাত পচান খাওয়াবি?

তুর জাত যাবেক। আবার হাসে বিন্দিয়া।

জাতফাত মুই মানি নে।

বিন্দিয়ার চোখে বিস্ময়রেণু। বুকের ভেতরটা কাঁপছে। কোথা থেকে একটা হাওয়ার ঢেউ এল। পিঠের চুল আছাড় খেল। রেশম ঘন চুল দুলে উঠল, ফুলে উঠল। নরম হয়ে এল জোড়া চোখ। ঠোঁট ভিজে গেল হাসির অনুভূতিতে। যুবকটা ম্যাচিস জ্বেলে বিড়ি ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে মন কেমন করা চোখে তাকাল। গ্রামের হাট চেহারা বদলায় ভিড় বাড়লে। অত মানুষের ভিড়ে মানুষটাকে আলাদা বলে মনে হল বিন্দিয়ার। তার চেহারা পোশাক পরিচ্ছদ হাবভাব চোখমুখ চালচলন সবার চাইতে আলাদা। তেলেজলে যেমন মিশ খায় না এ যেন অনেকটা তেমন। হাটঘুরে ভিখ মাঙে বিন্দিয়া। যে যা দেয় ঢুকিয়ে নেয় ঝুলিতে। আলু বেগুন ঢ্যাড়শ ছাঁচিপেঁয়াজ বিচিকলা উচ্ছে কোন কিছুই বাদ থাকে না। উদকাঠি বেচার পয়সায় শুকনো মাছ কেনে সে। দলের সবাই শুকনো মাছ খেতে

পছন্দ করে। আঁশ জল না পেলে ওদের ভাত রোচে না। বুড়া বাপটার জন্য বিন্দিয়ার সব সময় চিন্তা হয়। সে দিন ভিখ মাঙতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। মুখের দুপাশে জমে গিয়েছিল গাঁজলা। খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিল বিন্দিয়া। চোখে-মুখে জল দিতেই জ্ঞান ফিরেছিল বুড়োটার। ভাত পচান এক জামবাটি দিতেই চোঁ-চোঁ করে সাবাড় করে দিয়ে বুড়োটা খনখনে গলায় কাঁদল, বিটিয়া আমার সময় হয়ে এসেচে। আমি তো ক'দিনের মেহমান। যাওয়ার জন্য কুনো দুখ নাই মনে। তবে বিটিয়া তুর লাগি বড্ড পরান কাঁদে। আমার চোখ বুজলে কে তুরে দিখবে। বাড়কল্যাপুরের গঙ্গারামকে তু সাঙ্গা করে লে। সে তুর দেখভাল করবে।

সে দিনও কোন কথা বলতে পারেনি বিন্দিয়া, শুধু চোখ ভরে জল এসেছে। নিজেকে নিয়ে সে এখন আর তেমনভাবে ভাবে না। ঠেলা দেওয়া জীবনটাকে নিয়ে তার আর কোনো গর্ব নেই। দলের সঙ্গে ঘুরবে ফিরবে খাবে। হাসি কান্নায় জড়িয়ে নেবে দেহমন।

ঝড় তার চুল ওড়ালেও বিপদ তার গায়ে জলের আলপনা এঁকেছে। ছেলেটাকে বর্ষার হাত থেকে বাঁচাবারা জন্য কম চেষ্টা করেনি ঝুমরি। পাকুড়গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সে। পিঠে বাঁধা ছেলেটাকে বুকের ওম দিয়ে বলল, বেটা, ডরবি নে। এ ঝড় জল থেমে যাবেক।

ঝড়জল থেমেছে। এখন ধবধবিয়া আকাশ। ফুটকি তারায় ভরে আছে আকাশের নীল শরীর, ভিক্ষাম্বর গালে হাত দিয়ে বসেছিল পুকুরয়াড়িতে। পীতাম্বর গলার জোরে ধমকাচ্ছিল হরিহরণকে। মুখ নীচু করে হরিহরণ হজম করছিল বাপের গালিগালাজ। অত বড় ছেলে তবু সে কোনোদিনও বাপের মুখের উপর কথা বলতে শিখল না। তার ম্যাদামারা দশা দেখে ভিক্ষাম্বর উঠে গেল, ইবার চুপ কর। গালি বকলে কি জানোয়ার ঘুরান আসবেক? দিগম্বর তো গিয়েচে জানোয়ারটারে ঢুঁড়তে। সে যখুন গিয়েছে তখুন খালি হাতে ফিরবেনি। তার চক্ষুদুটো আন্ধারেও জ্বলে।

পুকুরয়াড়িতে গোল হয়ে বসল সবাই। কারোর মুখে হাসি নেই। অসময়ের ঝড় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে তাদের মুখের হাসি। মন্থরাবুড়ি বলল, যা রে বোহু, ইবার চুলা ধরা।

ঝুমরি নড়ে চড়ে উঠল। ছেলেটার দুধ ছাড়িয়ে সে উঠে গেল উল্টে পড়ে থাকা হাঁড়িকুঁড়িগুলোর দিকে। চাটাই ভিজে গিয়েছে বৃষ্টির জলে। শিকারশা সব ভেজা। শুকনো পাতা রস টেনেছে। ধরতে চায় না কিছুতে। মন্থরাবুড়ি দেখেশুনে বলল, টুকেখানি কেরচিন ঢেলে দে। গিলা পাত্তির রস না মরলে ধরবেনি।

ভিক্ষাম্বর চুট্টা ধরায় দেশলাই জ্বেলে, কুঁচুটে ধোঁয়া ছেড়ে বলে, আচ মোদের দুখের দিন গো। তু'রা সকলে মন দিয়ে শুন্। কমলপুরের রঘুনাথের সাথে মোর দিখা হয়েছিল। তার শরীলের দিকে চক্ষু মেলে তাকান্ যায় না। গাঁবাসীরা তাকে টকাধরা ভেবে বেধড়ক মারিচে। গা-গতর তার ভেষণ ফুলা। হাঁটতি চলতি পারেনি। তারে দিখে মনটা মোর দুখে ভরে গেল। ছ্যাঃ, একি জেবন রাম-সীতা মোদের দেলো গো! ঘেন্না ধরি গেলা এই জেবনের ওপর।

বিন্দিয়ার মুখে কোনো কথা নেই। ভয়ে তার গা-হাত-পা থরথরিয়ে উঠল। চোখে জল চলে এল আবার। টকাধরা বা ছেলেধরার বদনাম তাদের আজন্ম। এই অপবাদ নিয়েই

বুঝি তাদের জন্ম হয়েছে ধরায়। এর থেকে কবে যে মুক্তি ঘটবে কে জানে।

বুড়া ভিক্ষাম্বর চুট্টায় দীর্ঘ টান দিয়ে ভার গলায় বলল, এখন টুকে সাবধানে চলা-ফেরা করা উচিত হবেক। কার মনে কী আছে বলা যায় না।

পীতাম্বর বসে বসে ঝিমচ্ছিল। তার তামাটে চামড়ায় ভিখমাঙার চিহ্ন। শরীরের রক্ত সে গেরস্থের দেওয়ালে লেপে চলে এসেছে। কাঁথ দেওয়ালে তার রক্তদাগ কোনো দিনও মেলাবে না।

## ।। পাঁচ ।।

পেটের দায় মহাদায়।

ভিখ মেঙে আর দিন চলে না ভিক্ষাম্বরের। দিগম্বর ঝড়ের পরে সেই যে গেল তার আর কোনো ফিরে আসার লক্ষণ নেই। বিন্দিয়া অনেকক্ষণ জেগেছিল ভাত নিয়ে। ঢুলুণী আসতেই ভিক্ষাম্বর তাকে বলল, শুয়ে পড় বিটিয়া। সে ব্যাটার যখুন হুঁশ লাই, তার লাগি তু আর কতো রেত জাগবি। এমনিতে ঘুরে ঘুরে তোর চোখের কোনটা দেবে গিয়েছে।

ক'দিন হল ছোট আয়নায় মুখ দেখেনি বিন্দিয়া। তাদের সবার এখন মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল দশা। মন্থরাবুড়ি বাইরে বেরলে তাকে সাবধান করে। তারও তো এই সময়টা গিয়েছে বহু দুঃখ কষ্টে। সে সব দিনগুলোর কথা মনে পড়লে আঁতকে ওঠে সে নিজেও। হিম হয়ে যায় শরীর। খসখসে জিহ্বা দিয়ে কোনো বিষধর সাপ যেন চেটে দেয় সর্বাঙ্গ। এমন হিমভয় জীবনের উপর তার এখন ঘেন্না চরম। প্রায়দিন সে সাবধান করে বলে, রূপ চেপে চুপে রাখা শিখ্ বিটিয়া। রূপ হলে গিয়ে চুলার আগুন। মহাকাল, সর্বনাশা। রূপ ফোটালে ম্যায়াঝিগুলোর মরণের শেষ লাই।

চোখের কোল বসে গেলেও সেই কোলবসা চোখের দিকে কেন জুলুজুলু চোখে তাকায় গাঁয়ের লোকজন। ওরা কাকমারাদের ঘৃণা করে কিন্তু বিন্দিয়াকে দেখলে নরম হয়ে যায় তাল শাঁসের মতন। এ কেমন একচক্ষু বিচার? এর আসল কারণ বিন্দিয়ার অজানা নয়। মাঝে মাঝে তার মন করে শাঁখা লোহা খুলে ফেলতে। সিঁদুরের টিপ উঠিয়ে ফেলতে। এগুলো থাকলে তার শরীরটা অনেক ভার দেখায়। চোখের দৃষ্টিও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

সাহাড়দা হাটের সেই বাবরিচুলওলা ছোকরাটাকে সে কী ভুলতে পেরেছে এখনও। এমন পাগলপারা চোখের দিকে তাকালে পৃথিবীর সব কিছু ওলোট-পালোট হয়ে যায়। তার কোনো দোষ নেই এতে। চোখেরও কোনো দোষ নেই এতে! যত দোষ বয়সের, যৌবনের। যৌবন একরোখা। শাসমল পুকুরের ছুটে বেড়ান উড়ুস মাছের মতো। তাকে কি ভাবে বাগে আনবে সে। স্বাভাবিক জীবনকে রুখে দিলে জীবনের আর কী দাম আছে।

রাত গাঢ় হয়, তারা খসে পড়ে আকাশে। ফাঁকা মাঠের মাঝখানে গায়ে কাঁথাকালিন জড়িয়ে কুকুরকুণ্ডলী হয়ে শুয়ে আছে ঝুমরি। ওর কালো পেটটা দেখা যায়। এত বয়সেও

ঝুমরির চেহারাটা টানটান। সম্পর্কে কাকিমা হলেও ঝুমরি বিন্দিয়ার কাছে অনেক কথাই বলে যা তার বলা উচিত নয়। সব শোনে বিন্দিয়া, গরম হয়ে ওঠে তার মন। নাভির কাছে সিবসিরানী শুরু  হয়। ঘামতে ঘামতে পেছল হয় দেহ।

ঘুম তাড়াতে বিন্দিয়া চুট্টা খোঁজে। না পেয়ে গুণ্ডি দোক্তা ঠুসে দেয় মুখের ভেতর। জবজবিয়ে ওঠে ছেপ মুখের ভেতর। থু করে পিক ফেলে দেয় ঘাসে। মাথাটা ঝিমঝিমিয়ে ওঠে। কোনো কিছু ভাল লাগে না, শুধু ঘুম ছুটে গিয়ে ঘোলাটে হয়ে আসে চোখের তারা।

ভিক্ষাম্বর চুট্টা নিভিয়ে মাজাটা টানটান করে দেয় ঘাসের বিছানায়, শুয়ে শুয়ে বলে, ব্যাটাটা এখনও ফিরল না। কুথায় যে যায় কে জানে। বিদেশ বিভুঁইয়ে রেত বেরেতে ঘুরাফিরা ঠিক লয়। বুকে লুম্বা গুজালে ছেলেছোকরাদের মন বুঝা মহাদায়।

বিন্দিয়া কোনো উত্তর করে না, শুধু অলস হাই তোলে। দিগম্বর না ফেরা পর্যন্ত কী তার চোখে ঘুম আসবে? ঘুম অত সস্তায় পাওয়া যায় না। হাঁড়িকুঁড়ি গুছিয়ে সে চলে যায় শোবার জন্য। চিৎ হয়ে শুলে খোলা আকাশ তার বুকের উপর চেপে বসে। তারা-নক্ষত্র সুড়সুড়ি দেয় গোপন অঙ্গে। আবার মনে ভাসে সেই বাবরি চুল ছোকরার কথা। এখানে বিশ দিনের উপর হতে চলল তাদের। এবার হয়ত ছাউনি গোটাবার কথা বলবে ভিক্ষাম্বর। তখন কী হবে তার? কাক-কোকিলের সম্পর্ক কোনোদিন সুখের হয় না। তার বাপ বলে, কাক হয়ে কোকিলের মতো ডাকতে করে আশা/বামন হয়ে চান্দায় হাত, দেখ কপালের দশা। কথাটা যে মিথ্যে নয়, এটাও জানে বিন্দিয়া। কাকের কাছে যদি কোকিল উড়ে আসে তাহলে কি কাক খেদিয়ে দেবে তাকে? দুজনেরই গায়ের বর্ণ কালো, রক্তের রঙ লাল। শুধু স্বর আলাদা। বিন্দিয়ার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে ভয়ে।

বাবরি চুল ছোকরাটা সমুদ্র কাছিমের মাংস কিনে নিয়ে চলে গেল। ঠোঁট চুবান হাসি। চোখের তারায় কাকপক্ষী ধরার যাদুটোনা। ছোকরাটি কি গুণবিদ্যা জানে? এত রাত হল তবু কেন ভুলতে পাবছে না বিন্দিয়া। তাহলে কি মনে মনে সেও দুর্বল নোনামাটি? ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ ভাঙছে নিঃশ্বাস । একটু ঘুম দাও জয়-সীতারাম।

বিন্দিয়া ভাবছে। ভাবতে ভাবতে রাত গড়ায়। চোখের পাতায় ঘুম লেপে যায়। শেষ হয় প্রহর। দূর মাঠে আলো-ছায়ায় ডেকে ওঠে শেয়াল। ছাউনির বাইরে কুকুরগুলো ভুক্‌ভুকিয়ে ওঠে। তেড়ে যায় শব্দকে উদ্দেশ্য করে। শব্দকে ধরা যায় না, ফিরে আসে ওরা। হাঁপায়।

রাত বাড়ে। বাটের পাতায় মরা জ্যোৎস্না চুমা দেয়। মলিন চাঁদ ধানমাঠের আগোল-দার। মাঠপুকুরে জলে ঘাই দেয় বড় মাছ। জল ছুঁয়ে উঠে আসে ঠাণ্ডা আমেজ। শীত শীত লাগে বিন্দিয়ার। চোখ রগড়ে নিয়ে পরনের কাপড়টা চাপা দিতে চায় বুকে।বুক ঢাকে কিন্তু উদোম হয় থাই। শীতল হাওয়া চেটে দেয় শরীর। আবার ঘুম পালায় ঘুমের দেশে। ভেসে আসে কার মিঠে গলা হাওয়ায়? এত রাতে কোন পাগলে গান গায়? তার কি ঘর-দুয়ার, বউছেলে নেই? বিন্দিয়া কান খাড়া করে শোনে সেই গান। তার খুব আশ্চর্য লাগে কুকুরগুলো ডাকছে না দেখে। বিন্দিয়ার দেহমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। এমন বেআক্কেলে মানুষকে কিছু বলার দরকার। এই প্রথম কারোর গান শুনে বিন্দিয়ার রাগ হয়। মাটিতে হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। নিশ্চুপ পায়ে এগিয়ে যায় মাঠপুকুরের পাড় ধরে। হাওয়ায় তার কাপড় ওড়ে ফরফরিয়ে, খোলাচুল পাখনা মেলা ময়ূরের মতো নেচে ওঠে।

নেশায় পাওয়া মানুষের মতো বিন্দিয়া হাঁটছে দ্রুত পায়ে। একসময় তার মনে হয় ওটা গান না নিশির ডাক। নিশিডাকের বহু রোমাঞ্চকর গল্পকথা সে শুনেছে। গায়ে চিমটি কেটে বিন্দিয়া পরখ করে তার হুঁশ আছে পুরমাত্রায়। সে জেনে-শুনে হাঁটছে।

চারটা মাঠ পেরলেই সে দেখতে পায় খেজুরগাছের মাথায় ঝিকমিক জোনাকীপোকা আত্মহত্যার জন্য কাঁটার সংসারে জড়িয়ে গেছে। খেজুরগাছে ঠেস দিয়ে কে বসে আছে ওখানে? সুর ভাসছে বাতাসে। রাতের হাওয়ায় শুধু তার চুল নয়, পুরো শরীর নড়ে। ঠোঁটে নড়ে গানের ধ্বনি মাধুর্যের ভারে, ললিতেরে, তুর লাগি ঘরে মন বসে না। তুর সাথে মোর হয় না দেখাশুনা। ললিতেরে এ-এ-এ।

বিন্দিয়া দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে দেখল সেই বাবরি চুলওলা, ডাগর ভাসা চোখের মালিক সেই ছোকরাকে। বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল হঠাৎ। ঠোঁটের উপর জড়িয়ে গেল থরথর আবেগ। এত রাতে কী করছে ছোকরা। কেন চেয়ে আছে ছাউনির দিকে অমন ভাবে? ওর কিসের অসুখ? তাহলে কি প্রেমরোগে ধরেছে তাকে। বিন্দিয়া কিছু বুঝে উঠতে পারে না। ছুটে পালিয়ে যেতে চাইলেই বাবরি চুল ছোকরাটা উঠে দাঁড়ায়। ছুটে যায় বিন্দিয়ার কাছে। কাতর হয়ে বলে, যেও নি গো, আমি তুমার লাগি ছুটে এসেচি ঘর থিকে। শুধু তুমার লাগি।

নিঃশ্বাসে ধাক্কা লাগে আরেক নিঃশ্বাস। বিন্দিয়ার চোখের তারার কাঁপুনি আর মেলায় না। বুকে হাত চেপে সে বুঝি হয়ে যায় ফুলের গাছ। মুখ থেকে কথা বেরয় না, শুধু ঠোঁট দুটো কাঁপে। পায়ের উপর পা চেপে বিন্দিয়া উদাস হয়ে যায় কিছু সময় তারপর পিছন ফিরে ছাউনির দিকে তাকায়। বাবরি চুলওলা ছোকরাটার নাম জটায়ু, কেমন জড়োসড়ো চোখে তাকায়, প্রার্থনার গলায় বলে, তুমাকে হাটে দেখার পর থিকে বুকের ভেতরে আমার হাট বসেছে প্রেমের। আমাক ফিরিয়ে দিও না। একবার চোখের দেখা দেখে আমি চলে যাব।

এবার কথা বলতে বাধ্য হয় বিন্দিয়া, এ তুর লিশার কথা বাবু। লিশা ছুটে গেলে কেউ তো কাউকে চেনে না। মোরা হলাম গিয়ে পথে ঘাটের মানুষ। মোদের না আচে ঘর না আছে ঠিকানা। গাছের খসে পড়া পাতাগুলোর যা দাম, সেই সামান্য দাম তো মোদের লাই।

যে কামিনী-কাঞ্চন চেনে না তার কাছে তো সবই কাচ। আমার কাছে তুমি কাচ নও গো হীরা। তুমারে দেখার পর থেকে ঘর আমার পর হলো। এখন সত্য শুধু তুমি। তুমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। জটায়ুর আবেগভরা কণ্ঠস্বর, তুমাকে চোখ ভরে দেখে নিয়েচি, ইবার তুমি যাও। যদি না দেখা হোত তাহলে আমি সারারাত মাঠে ঘুরে ঘুরে তোমার গান গাইতাম। আমি পাগল হয়ে যেতাম।

কোনো উত্তর না দিয়ে বিন্দিয়া নত মুখে ফিরে যায়, তার ছাড়াচুল পিঠের উপর লাফায়। উদাস ভরা চোখে তাকিয়ে থাকে জটায়ু! হালকা হয় বুকের ভার। এ রাতটার

কথা তার মনে থাকবে, ঘরে ফিরে কাঁথ দেওয়ালে দাগ দিয়ে রাখবে প্রথম পরিচয়ের দিনটা।

বিন্দিয়া পুকুরয়াড়িতে উঠে এসে দেখল দিগম্বর ফিরে এসেছে খিঁচড়া শুয়োরটাকে সাথে নিয়ে। দরদরিয়ে ঘামে সে। শুয়োরটা খুঁটায় বেঁধে দিগম্বর বিন্দিয়ার দিকে তাকাল। অবাক হয়ে শুধোল, এত রেতে কুথায় গেছিলিস বুন? তুর কি ভয়-ডর নাই?

বিন্দিয়া বুঝে পেল না কী জবাব দেবে! প্রেমে পড়লে মানুষের ভয় উবে যায়। বিন্দিয়ার চোখ থেকে মুছে গেছে ভয়। সে এখন ফুরফুরে প্রজাপতি।

## ।। ছয় ।।

খটখটে আকাশে জলের কোনো চিহ্ন নেই, শরীর গরম হওয়ায় বিছানা নিয়েছে ঝুমরি। সব থেকে অসুবিধা হয়েছে ওর কোলের ছেলেটাকে নিয়ে। জ্বর ছাড়ছিল না বলে মন্থরাবুড়ি ভিক্ষাম্বর কে বলল, বোহুটার দাবাই-এলাজ করাতি হবেক। ওর পেট গরম হয়েচে। পেট ঠাণ্ডা- না করালে ওর শরীরে ঠাণ্ডা হবেক না।

পেট ঠাণ্ডা করার জন্য ডাব-লেবু সরবতের দরকার। এসব যদি না হয় 'পালো' হলে কাজ চলে যাবে। পালো ভিজিয়ে খাওয়ালে শীতল হবে শরীর। শরীর শীতল হলে দেহমন সুস্থ হবে।

পীতাম্বর বউয়ের কথা ততো বেশি ভাবে না। সে বউ ন্যাওটা নয়। তবে ঝুমরির অসুখ হয়েছে বলে তার যে মনে স্ফূর্তি আছে এমন নয়। ছোট ছেলেটাকে নিয়ে শশব্যস্ত সবসময়। দলের একটা মানুষ বসে গেলে ছক বাঁধা কাজের অনেক অসুবিধা। কে যাবে গাঁয়ের ভেতর জড়িবুঁটি আর উদকাঠি নিয়ে। মরদগুলোর চেয়ে মেয়েরা বেশি কামায়। মেয়েদের জয় সর্বত্র।

কামাই কমে যাওয়ায় পীতাম্বরের মাথা খারাপ। অনেক ভেবে সে বলল, বড়দা, আচ বোহু ছাউনিতে থাকবেক। মোউসী আর বিন্দিয়া যাবেক গাঁ ঘুরতে।

—বুড়িটারে আর খাটিয়ে কী লাভ? ভিক্ষাম্বরের কথার উপর কথা বলল পীতাম্বর, বিন্দিয়ারে একা ছাড়া উচিত লয়। মোউসী যদি সাথে যায় তাহলি পরে মেয়েটার সাহস বাড়বেক। গাঁয়ের মানুষ সবাই সমান নয়। মেয়ে দেখলে অনেকের লজর থিকে বিষ ঝরে পড়ে।

—তা যা বলেচিস ভাই। লাখ কথার এক কথা। ভিক্ষাম্বর সম্মতি দিল বুড়ির যাওয়ার। বিন্দিয়া রায় শুনে খুশি। হাত নেড়ে বলল, মোউসী সাথে গেলে মোর আর কুনো ডর লাগবেক নি। মৌউসীকে হাত ধরে মুই লিয়ে যাবো।

ঝলমলে আলোয় যে যার মতো চলে গিয়েছে ধান্দায়।

দিগম্বর কাক ধরার ফাঁসজাল নিয়ে চলে গেল শাসমল বুড়াদের বটতলায়। ওখানে দাঁড়কাকের ঝাঁক আসে। দু তিনটে দাঁড়কাক ধরতে পারলে সেদিনকার মতো কেল্লাফতে।

দাঁড়কাকের মাংস সুয়াদ ভরা, ওজনে পাতিকাকের চেয়ে অনেক বেশি। সে জন্য রাতভর সে একটা দাঁড়কাক বানিয়েছে পালক সাজিয়ে। বাবলাগাছের আঠা দিয়ে খুব যত্ন নিয়ে সেঁটেছে পালকগুলো। দূর থেকে নয়, কাছ থেকে দেখেও বোঝা যাবে না ওটা আসল কাক কিনা! বিন্দিয়া দাদার হাতের কাজ দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেছে, আসল-নকল বুঝা দায়। এটার শুধু জানই নেই, এছাড়া কে বলবেক এটা কাক নয়!

খুশি হয়েছিল দিগম্বর। সে চলে যাওয়ার পরে মন্থরাবুড়ি খনখনে সুরে বলল, রোদের ঝাঁঝ দেকেচিস বিটি। মাথার তাত লাগচে বড্ড। যেতে হলি ঝটপট চ। তুর মাথার মতুন আমার মাথায় তো অখুন চুল লাই।

কথা শুনে হাসল বিন্দিয়া। ওর হাসি দেখে বোঝা দায় যে ওর ভেতরে একটা দুঃখের খনি লুকানো আছে। যাদের ঠোঁটে হাসি লেগে থাকে সর্বদা তাদের বুঝি কপালে দুঃখের দাগ মেলায় না।

ক'দিন থেকে বিন্দিয়ার যে কী হয়েছে তা সে নিজেও জানে না। একটু আনমনা হলে সেই বাবরি চুল ভাসা চোখের মালিক জটায়ুর কথা মনে পড়ে। তখন নিজেকে তার বড় হীন মনে হয়। বুড়া ভিক্ষাম্বর প্রায়ই একটা কথা বলে, ওজন বুঝে ভজন করা ভালো নাহলে পেট ফাটবেক। সাতবার চান করেও কাক কুনোদিন বকের মতন সাদা ধবধবিয়া হতে পারবে না। রাম-সীতার যা বেচার তার হেরফের হবার জো নাই।

ভিক্ষাম্বরের কথাগুলো বিন্দিয়ার মনের ভেতর দাগ কেটে বসে আছে। কার সাধ্যি যে তাকে ঘষে ঘষে তোলো। যে স্বপ্ন তার মনের ভেতর বেলুন ফোলায় বাস্তবে তার কতটুকু দাম সেকথা বিন্দিয়া ছাড়া আর কেউ ভালভাবে জানে না। নিজের ওজন যে জানে না তার মতো মূর্খ আর কে আছে। জটায়ুর কথা মনের ভেতর ঘাই দিলে বিন্দিয়া নিজেকে ভীতু খরগোসের চেয়েও অসহায়বোধ করে। তেলে জলে মিশ খায় না। যা হবার নয় তা কোনদিন হবেও না।

ফাঁকা মাঠের ভেতর দিয়ে গ্রামে ঢোকার পথ। আকাশ ছাড়া এখানে বিন্দিয়ার আর কিছুই চেনা নয়। ক'দিনের ঘোরা ফেরায় গাছপালার সঙ্গে খাতির জমেছে চোখের। পায়ের চড়া পথ মৃত সাপের পেটের মতো নিথর নিস্পন্দ। মন্থরাবুড়ি শামুকচালে হাঁটে। হোঁচট খায় ঘাসের ঝুঁটিতে পা বেঁধে। তখন চোখে মুখে তার ফুটে ওঠে কষ্টজনিত বিরক্তি অথচ একদা এক সময়ে সে ছিল তড়বড়ে উচিংড়ে। এখন জবরজট গাছের গুঁড়ি। চোখে ভাল দেখতে পায় না। ঘোলাটে চোখে আলো ঢুকে আরও ঘোলাটে হয়ে আসে তার চোখের দৃষ্টি। বেতের লাঠিটা তার ন্যুব্জ শরীরটাকে ধরে রাখে শক্তপোক্ত।

বিন্দিয়া এগিয়ে এসে ছিল ক'কদম। বুড়ি জড়ানো গলায় বলল, এ বিটিয়া, দাঁড়ায় যা। মোকে সাথ লিয়ে চল। মু বুড়া ম্যায়াঝি। তুর মতো কি বুক লাচিয়ে হাঁটতে পারি?

বিরক্ত বিন্দিয়া দাঁড়িয়ে পড়ল ফাঁকা মাঠে। এভাবে হাঁটলে আজ তার ধান্দার দফা রফা। তাছাড়া আর একটা ভয়ও বুকের ভেতর গুড়গুড় করে। পথে ঘাটে জটায়ুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আর রক্ষে নেই। তাকে দাঁড়াতে হবেই হবে। জোর করে কথা বলতে চায় মানুষটা। যখন কথা বলে তখন মুখে তার ফুলঝুরি ছোটে। তার তো লোকলজ্জার ভয় কম। পুরুষমানুষ দু-কান কাটা হলে বলেই কি মেয়েমানুষকে সেই পথ ধরে হাঁটতে হবে? বিন্দিয়া ঠোঁট কামড়ে ধরল নিজের অজান্তে, হাঁপাতে হাঁপাতে মন্থরাবুড়ি এল তার

সামনে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আচ মনে হতিচে তুই মোকে মারি ফেলবু, এট্টু ধীরে হাঁট বিটিয়া। গাঁয়ে তো তুর ভাতার লেই যে চটজলদি হাঁটবি?

কথা শুনে চমকে উঠল বিন্দিয়া, ধকধকিয়ে উঠল জোড়া চোখের চাহনি। বুড়ি কি তার মনের ভাষা বুঝতে পেরেছে? কী করে পারবে? সে তো অন্তর্যামী নয়। তবু মুখ ফসকে বেরিয়ে আসা কথাগুলো বিন্দিয়ার মস্তিষ্ক কোষে সুখের জাল বোনে। আবেশে বুজে আসে চোখ। চারদিক সুন্দর দেখে সে।

সাত-আটটা ঘর ঘুরে মনের মতো পরতা হয় না। গ্রামের সবার চোখে তাদের জন্য কৌতূহল। বিন্দিয়া চোখ ফিরিয়ে নেয়। বেড়ার ওপিঠে দাঁড়িয়ে কাদের ঘরের বউ বলে, হা-দেখে যাও গো, কত সোন্দর কাকমারাদের মায়াঝি!

লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নেয় বিন্দিয়া। গুঁড়ো সিঁদুর আরও রক্তাভ করে দেয় তার মুখমন্ডল। সত্যিই কি সে তাহলে চোখে দেখার মতো? তার রূপে তো গঙ্গারাম পাগল। নিজের দল ছেড়ে, কামধান্দা পরিত্যাগ করে সে এখন তার পেছন পেছন ঘুরছে। ভাদ্রমাসের কুকুরগুলোর মতো তার দশা। তার মুখ দেখলে ঘেন্নায় এতটুকু হয়ে যায় বিন্দিয়া। তখন মরে যেতে ইচ্ছে করে।

ছোটপুকুর আর খড়ের ঘরখানা কঞ্চির বেড়ায় ঘেরা। উঠোনোর একপাশে তুলসীমঞ্চ আর মনসাগাছ। বিচিকলার ঝাড়খানা পুকুরের জল খেয়ে বেশ সতেজ তরতাজা। ভিক্ষার আশায় আগড় সরিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ায় বিন্দিয়া, মন্থরাবুড়ি তার পেছনে।

বিন্দিয়াই ডাক পাড়ল কাতরগলায় ভিক্ষার আশায়। চড়চড়ে রোদে তার সুন্দর মুখ তামাটে দেখায়। গলগল করে ঘামতে থাকে সে। খড়ের ঘরের ছায়া থেকে বেরিয়ে অসে সাদা থানপরা মাঝ বয়েসী এক মহিলা। তার গোল মুখখানায় মা-মা ভাব। ঐ মুখ দেখে বিন্দিয়ার মনে হয় কত দিনের চেনা। এর আগে কি সে কোনোদিন দেখেছে মহিলাটিকে? মনে কবতে পারে না।

সব শুনে মন্থরাবুড়ি উসকো-খুসকো চুলে হাত বুলিয়ে বলে, তুর ব্যাটা কী কাম করে?

—সে যাত্রাদলে পাঠ করে। গান গায়।

—এ তো ভালা কথা। মন্থরাবুড়ির ঠোঁটে বিজ্ঞের হাসি ছলকায়, তুর ঘরটা বেঁনধে দিতে হবেক। তবে আচ সামানপত্র কিচু লাই। খালি হাতে তো এসব কড়ক কাম হয়নি বিটিয়া। তু বরং এট্টা লজরকাঠি কিনে লে।

—যাতে আমার ছেলের ভালো হয় তাই দাও।

বিন্দিয়া জানকীর হাতে ধরিয়ে দেয় নজরকাঠির কালো কার, গর্ব ভরে বলে, তুর ব্যাটার গায়ের রঙ কি সাদা ধবধবিয়া?

—না গো বিটি। সে শ্যামলা, তার মাথায় বাবরি চুল, চক্ষু দুটা টানটান। তুমি কি তারে কুনোদিন দেখেছো? জানকী উৎসাহ ভরে শুধায়।

বিন্দিয়া চিন্তার অতল খাদে তলিয়ে যায়। তার চোখ থেকে ঝরে পড়ে স্বপ্নরেণু, তুর ব্যাটাটা কি গান গায়? তার কণ্ঠা কি কোকিলপারা?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক ধরেছ! জানকী অবাক হয়। হা করে তাকায় সে বিন্দিয়ার মুখপানে।

—তুমি আমার ছেলেটাকে চেনো?

বিন্দিয়া চুপ করে থাকে, ঠোঁটের কোনে লুকানো হাসি।

জানকী তাকে পয়সা দিতে গেলে নেয় না, ডানে বাঁয়ে ঘাড় নাড়িয়ে বলে, তুর কাছ থিকে পয়সা লিবোক না মাঈজী। আমার গুনাহ হবেক।

জানকী তার কথার কোনো অর্থ বুঝতে পারে না। শুধু হা-করে তাকিয়ে থাকে বিন্দিয়ার ঘাম চকচকে মুখের দিকে। মন্থরাবুড়িরও চোখ-মুখ থ' মেরে গিয়েছে। বিন্দিয়া তার হাত ধরে টানল, চ মোউসী। ধূপ চড়চে। কতটা পথ মোদের যেতে হবেক।

ঘুর পথে নয়, সিধা পথে ফিরছিল ওরা। মন্থরাবুড়ি কিছুটা হেঁটে এসে থামল। বিন্দিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, এ বিটি, তুরে গটে কথা শুধাই। সেই থিকে মোর মনে খচ্খচ্ কাঁটা বিন্ধচে।

—কী কথা? কৌতূহলী হল বিন্দিয়া।

মন্থরাবুড়ি তার মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, লজরকাঠির দামটা নিলিনে কেনে?

কী ভেবে বিন্দিয়া বলে, মন হলো তাই নেলাম না!

—কথাটায় গড়বড় ঠেকচে। চালের ভেতর কাঁকর লাই তো?

—কাঁকর থাকলেও থাকতি পারে। বিন্দিয়া ফিক করে হাসল। মন্থরাবুড়ি বিরক্ত হয়ে বলল, তুর মতিগতি বুঝিনে। তবে গটে কথা শুনি রাখ। বামন হয়ে চান্দে হাত বাড়ানো মহাপাপ। মনে কুনো পাপ ঢুকলে ঝেড়ে ফেল। পথচরাদের মনে ভিতর কুনো পাপ পুষে রাখতি লাই।

পথ ছোট হয় বাঁধের গোড়ায় এসে। খরা এখানে মরা। ঠাণ্ডা ছোঁয়া সর্বত্র। মেছোচিল পাক দিয়ে ওড়ে মাঠের উপর। নোনাখাল তরতরিয়ে বয়। এখন ভরাখাল। থৈ-থৈ নাচে জল। বেবুরগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আঁচলে মুখ রগড়ে মুছে নেয় বিন্দিয়া। তেষ্টায় বুক শুকায়। ধারে কাছে কোথাও জল নেই। জলের খোঁজে চোখ মেলতেই সহসা সে দেখতে পায় গঙ্গারামকে। বুকের ভেতর চলকে ওঠে রক্ত। ভয়ের জোয়ার আসে। ঢেউ ভাঙার শব্দ হয়। ঐ লোকটাকে সে দেখতে চায় না তবু যে কেন দেখা হয়। মা শীতলাবুড়ি এ কী কঠিন ছলাকলা।

গঙ্গারাম দূর থেকে দেখে ঠোঁট ফাঁক করে হাসল। চতুর, ধূর্ত হাসি। ওই হাসির অর্থ বোঝে বিন্দিয়া। হাসির জবাব সে না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। গঙ্গারাম ছুটতে ছুটতে চলে আসে তার কাছে। ছায়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলে, তুর সাথে কৎ দিন দেখা হয় নাই। মন মানল না। ছুট্টে এলাম।

বিন্দিয়া ঠোঁট উল্টাল, এসেচো, ভালা করেচো। ইবার ঘর ঘুরোন চালি যাও। মোর সাথে তুর কুনো দরকার লাই।

—দরকার লাই? গঙ্গারামের মুখ শুকিয়ে গেল। শুকনো ঠোঁটে শিস ছুঁড়ে দিয়ে দূরে দাঁড়ান মতিলালকে ডাকল। মতিলাল তার বন্ধুমানুষ, সমবয়েসী। শিস শুনে সে হেঁটে এল ধুলো উড়িয়ে। এসেই হা-করে গিলতে থাকল বিন্দিয়াকে।

গঙ্গারাম আলাপ করিয়ে গিল, মোর বন্ধু বটে। বাড়কল্যাণপুরে ছাউনি আচে। ( মু থেকে তুর কথা শুনে মতি বলল যাবা। মুই তাকে নিয়ে আসলাম। কথা শেষ গঙ্গারাম হাসল, কী রে, বলছিলাম না এক্কেবারে খাসা মাল। কি মোর কথা বিশ্বাস তো?

মতিলালের চোখ ছানাবড়া, মুখে কথা নেই। তাকে ঠেলা মেরে গঙ্গারাম হাসল, যা ইবার বিন্দিরে ক। পুচ্ সে মোকে সাঙা হবেক কি না?

মন্থরাবুড়ির কানে যায় কথাগুলো, রাগে তার চিড়বিড় করে গা-গতর। অসহ্য লাগতেই ধায়, হা-রে বিটিয়া, এ ছুয়াটা কার ঘরের? তুরে সাঙ্গা করতি চায়, কোমরের জোর াচে তো?

গঙ্গারাম রাগে না, শুধু ঠাণ্ডা হাতটা ছুঁয়ে দেয় বুড়ির হাতে। তোয়াজ করে বলে, উসী গো, মুইও কাকমারাদের ছুঁয়া। মোর ছাউনি বাড়কল্যাণপুরে। তুর ভাইঝিটারে মুই াঙা হিবা। মোর বউ মরচে। মুই এখন দাগা দেওয়া ষাঁড় গো।

মুখ ফাঁক করে বাতাস বুকের খোদলে পুরো নেয় মন্থরাবুড়ি, তার গা চিড়বিড় করে ামে, সেই সঙ্গে জড়ো হয় রাগ, গলায় ফোঁসফোঁসানী তুলে শুধায়, মোর ভাইঝিকে সাঙা বু, তোর ট্যাঁকে কত টাকা আচে?

কুয়ামারার আবার টাকা! গঙ্গারাম গা ঝাড়া দিয়ে বলে, মোর যা আচে তাতে তুর াইঝির জীবনভর চালি যাবে। বিশটা শুয়োর মোর ঘরে। ছেলি আচে চারটা। গাই গোরু নটা। মোর মন চাইলে তুর ভাইঝির গা মুই রূপা দিয়ে ঢাকি দিবা।

—হ। ইসব কথার কথা। বুড়ি আরও উত্তেজিত হয়।

পোষ মানানো দায় দেখে দু'খিলি দোক্তা গুণ্ডি পান বুড়ির হাতে গুঁজে দেয় গঙ্গারাম। াবনা খাবনা করেও একটা পানের খিলি শালপাতার মোড়ক খুলে মুখের ভেতর চালান রে দেয় মন্থরাবুড়ি, আয়েসে চিবিয়ে পানের পিক ফেলে লাল মাড়ি দেখিয়ে হাসে, কী ইলু, তুর নামটা যেন কী আচে? ঘর কুথায়?

—বাড়কল্যাণপুরের গঙ্গারাম দাস গো।

—হা, হা। মোর ভাইঝিটারে সাঙা হবু ? ভালা কথা। আবার পানের পিক ফেলে ন্থরাবুড়ি বিন্দিয়ার ঘাম ঘষা মুখের দিকে তাকায়। বুমবুম করে মাথার ভেতর। ক্লান্তি বসাদ পা দুটোয় বেঁধে দেয় ভার পাথর। খালপাড়ের বেবুরছায়ায় দাঁড়িয়ে নির্জন মাঠের কে তাকিয়ে থাকে মন্থরাবুড়ি। হাওয়ার বংশ সব আজ ভিন পাড়ায় ঘুরতে গেছে। রদিকে গুমোট গরম। একটা মেছোচিল মাথার উপর চক্কর কেটে ওড়ে, আবার ঝাঁ- র নেমে আসে জলের কাছাকাছি, জলে ঠোঁট ভিজিয়ে দ্রুত গতিতে ডানা ঝাপটিয়ে গালের বাইরে চলে যায়। মন্থরাবুড়ির মজাসে পান চিবোন দেখে বুক শুকিয়ে গেল ন্দিয়ার, ঘন ঘন শ্বাস নিয়ে সে চোরা চোখে দেখল কালো কুচকুচিয়া তেলঘামে জড়াজড়ি জন ত্রিশোর্দ্ধ ছোকরাকে। বুক শুকিয়ে গেল তার। ঢোড়াসাপ দেখা মাদী কাকের মতো তঙ্কিত হল সে। ভিনদেশী মানুষ দুটোকে বিশ্বাস নেই। ওরা চাইলে অনেক কিছু অঘটন াতে পারে। ফাঁকা মাঠে জাত গেলে সে মুখ দেখাবে কী ভাবে।

রোদ সরে গিয়েছে মাথার উপর থেকে। অসময়ের মেঘ এসে জড়ো হয় চরাচর ড়ে। গঙ্গারামের বুকের পাটা আছে বলতে হবে। মতিলালের চোখের ঈশারায় সে দয়ার হাত ধরে খপ্ করে, নেশা করা চোখ দিয়ে গিলতে চায়, জড়ানো গলায় বলে, তুর ছাউনি ফিরে কাম নাই। তু মোর সাথে চ। মউসী সব বলে দিবেক।

—হাত ছাড়। ঝটকা দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চায় বিন্দিয়া কিন্তু পারে না। গলায় নত হয় অক্ষমতা। মাথায় হাত দিয়ে সে বসে পড়েছে খালপাড়ে। বিন্দিয়া আর্ত গলায়

চেঁচায়, ও মোউসী, মোউসী গো, মোকে বাঁচা। হা দেখ, ওলাউটা ডাকাকালুয়া আম হাত ধরেচে।

বুড়ি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। পানের ভেতর কিছু মেশানো ছিল। তার মাথা কা করে না। দু-চোখে আঁধার দেখে সে। একসময় মাথার ভারে ধুলোপথে টান টান হ শুয়ে পড়ে সে। ক্রমাগত গড়াগড়ি খায়। মুখের দু'পাশে উঠে আসে গ্যাঁজরা। বিন্দি কঁকিয়ে উঠল। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে ধরতে চাইল বুড়িটাকে। বুড়ি গড়াতে গড়া ধুলো মাখামাখি হয়ে বাঁধের একেবারে শেষ কিনারে গিয়ে ঠেকেছে। সময় নষ্ট করে গঙ্গারাম, বিন্দিয়াকে সাময়িক ছেড়ে দিলেও তার মনের ভেতর অসুর শক্তির বুজকুঁ কাটে। মতিলালকে পিছনে ফেলে হাওয়ার বেগে ছুটে যায় সে। পেছন থেকে সপাটে জড়ি ধরে বিন্দিয়াকে। ওর ঘেমো গালে জোর করে চুমা খেয়ে বলে, বল, সাঙা হবু কি বল? আজ মুই খালি হাতে ফিরবানি।

বিন্দিয়া শত চেষ্টা করেও সেই হাতের ফাঁস ছাড়াতে অক্ষম হয়। চোখ ভরে আসে। গা হাত পা কেঁপে ওঠে। গায়ের জোর খুঁজে পায় না। খুব হতাশ আর এলোমে লাগে নিজেকে। হাতের ফাঁসে জড়িয়ে যাবার আগে বিন্দিয়া জোর করে টেনে অ গঙ্গারামের সাপকালো হাত। গঙ্গারাম নেশার ঘোরে বলে, তুকে আচ ছাড়বনি। বল, মে সাঙা হবু কিনা বল?

বিন্দিয়ার চোখ বেয়ে গড়িয়ে নামে জলের ধারা। নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে ' ফেড়ে চেঁচায়, কে কুথায় আচো গো, মোকে বাঁচাও।

খালপাড় ধরে তার ডাক চলে যায় বহুদূর।

বালিঘাই বাজারে যাত্রা সেরে ঘর ফিরছিল জটায়ু। কাঁধের ঝোলায় জামা কা মার জন্য মোচড় মিঠাই। চেনা গলার সুর কানে যেতেই ছুটে এল সে বেবুরতলায়। থেকে দেখল মানুষ খেগো বাঘের দাপাদাপি। চেঁচিয়ে উঠল, ছাড়, ছেড়ে দে বলি

নেশাখোর মানুষটার কানে কোন কথা ঢোকে না। জটায়ু বেড়া থেকে হ্যাঁচকা ট তুলে নেয় খুঁটিবাঁশ। সপাটে কষিয়ে মারে গঙ্গারামের মাথায়। মতিলাল ঘাবড়ে গি সূচীমুখী বর্শা ছুঁড়ে মারে জটায়ুর দিকে। হাওয়ায় বেঁকে যায় তার গতিপথ। ব্যর্থ হ প্রাণের দায়ে সে খালপাড় ধরে দৌড়ায়। জটায়ুর চিৎকার শুনে ছুটে আসে লোক গঙ্গারামকে মাটি থেকে টেনে তুলেছে ক'জন। রক্ত মাখামাখি মুখ। চুল ভিজে জ আছে রক্তআঠায়। বিন্দিয়ার হাত ধরে স্থানুবৎ দাঁড়িয়েছিল জটায়ু। ভিড়ের মধ্যে একজন বৃদ্ধ বলে, হায় বাপ, এ কী কাজ করলু। কাকমারা ম্যায়াঝির হাত ধরলু, কি ভালা হিলা? যা-যা খালের জলে ডুব দিয়ে আয়। বিন্দিয়ার চোখ ফেড়ে জল অ জটায়ুর হাত ছেড়ে দিয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে দাঁড়ায়। সে পালিয়ে যেতে চায়। পারে না। পায়ে যেন পেরেক পোঁতা।

## ।। সাত ।।

দুরের গর্তে সাপের বসবাস।

বুড়া ভিক্ষাম্বর কপাল চাপড়ে বলল, ইঁদুর কি যে, সে গাতে থাকতি পারে? পারে যার দাঁত ভোঁতা হয় সে বেচারা সাপের ভয়ে ঘর ছাড়ি পালায়।

বুড়ার কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনছিল পীতাম্বর, দিগম্বর। বুড়া যখন বকতে শুরু র তখন তার বকবকানী থামে না। পালের একটা মাঝারি মাপের শুয়োর হারিয়ে গেছে দিন হল। শুধু বুড়া কেন ছেলে ছোকরারা সবার মন খারাপ. এত কষ্টের ধন জলে সে গেল। এই আক্ষেপ কোথায় লুকাবে বুড়া।

পীতাম্বর সমঝদার মানুষ। ঘাড় চুলকে ঘামাচি মেরে বলল, বড়দা, যদি কিছু মনে ই করো তাহলি পরে খিচড়া শুয়ারটাকে বেচি দাও। ওটা চক্ষে লাগার মতুন হয়েচে। কুনদিন ধরে লিয়ে পালাবে তার ঠিক লাই।

বুড়া ভিক্ষাম্বর ঘাড় নাড়ে, হ, হ। বেচে দিব। দিবই বেচে। অখন খবা মরশুম।শুয়ারের ম ভালা পাবা। তাছাড়া অভাব চলচে। অখন আর গাঁয়েঘরে ভিখ দেয় না কেউ।

সেইমত তিনজন সকাল থেকে বেরিয়েছে এগরামুখো। শুয়ারটার গলায় মোটা রশা ধা। দিগম্বর শুয়োরটাকে টানছে সামনের দিকে। জানোয়াটার যাওয়ার কোন মন নেই। । করে যেন বুঝে গিয়েছে বিপদের গন্ধ। মাঝে মাঝে হাঁক-ডাক ছাড়ছে বিশ্রী গলায়। দের বশে শুয়ে পড়ছে ধুলোয়। বেগতিক দেখে তাকে চওড়া কাঁধের উপর তুলে নিয়েছে গম্বব। হাঁটতে হাঁটতে ঘাম ফোটে, রি-রি জ্বলে। তবু সে ভ্রূক্ষেপহীন। এগরা অব্দি না ছানো পর্যন্ত বিশ্রাম নেই।

পীতাম্বর তার কষ্ট দেখে বলল, তু আর কত ভার বইবি বেটা। মোকে দে।

হায়-হায় করে ওঠে দিগম্বর. না গো কাকা. তা হয় না। মুই থাকতে তু বইবি ভার! ন মোর তাগদ কি জল হয়ে গেল?

এগরা পৌঁছাতেই রোদ কড়া হল। শুয়োরের মহাজন মাল দেখেশুনে দরদাম করল। । স্বভাব পিঁপড়ের পেছন টিপে খাওয়ার। বুড়া ভিক্ষাম্বর সব জানত। সমঝোতার গলায় বলল, তু কুছ ছাড় বাবু, মুই কুছ্ ছাড়ি। দু-জনায় দাঁতে দাঁত টিপি থাকলি খাওয়া নি। দু-জনের দাঁতে বিছনা হবেক। সেটা ভালা নয়।

দরদাম ঠিক হল একসময়। লাল আউস আর নুন কিনে ছাউনিতে ফিরে এল ওরা জনে। পীতাম্বরের ভোখ লেগেছিল। সে সংকোচ ঝেড়ে ফেলে বলল, দানাপানি পেটে ই পড়লি পরে অদটা পথ যাবো কী করে। তিন পালি ভুজা আর টুকে ভেলিগুড় হলে ন চাল যাবে। আগে পেট শান্তি তারপরে সব শান্তি।

তার কথা শুনে বুড়া ভিক্ষাম্বর অনেকক্ষণ ধরে হাসল। চালের বোরা নামিয়ে সে লের খোঁজে তাকাল। চেনা জায়গায় জল খুঁজে পেতে দেরী হয় না। ওরা একটা পুকুরের ড়ে গিয়ে বসল। দিগম্বর গেল টাকা আর গামছা নিয়ে মুড়ি কিনতে। সে যখন ফিরে তাকে দেখে আশ্বস্ত হল পীতাম্বর। এই এগরা বাজারে বিশ সাল আগে তাদের এক তিকে ছেলেধরা সন্দেহে পিটিয়ে মেরেছিল কিছু বদমানুষ। পীতাম্বর তখন সদ্য কিশোর।

গোবিন্দ বুড়ার রক্তাক্ত দেহখানার কথা সে এখনও ভোলেনি। রেল পুলিয়া হবে। পড়ছিল ইট, চুন, সুড়কি ও সিমেন্টের খাম্বা। ঠিকেদারকে স্বপ্ন দিল মা শীতলা। স্বপ্নে মা বলল তিনটে নরবলি চাই। নরবলি না দিলে রেল পুলিয়া উঠবেনি। সেই থেকে নাকি বেরিয়ে পড়েছে গাঁয়ে গঞ্জে ছেলেধরার দল, নরমুণ্ডুর মেলা দাম। ভুলিয়ে ভালিয়ে কাউকে বস্তায় পুরে চালান দিতে পারলেই হলো। তখন বছরের পর বছর ঠ্যাংয়ের উপর ঠ্যাং তুলে খাওয়া। জীবনে তখন শুধু আরাম আর আরাম। গোবিন্দ বুড়াকে কেউ যেন দেখে ফেলেছিল একটা লেংটো শিশুর সাথে কথা বলতে। এক কান থেকে আরেক কানে ছড়িয়ে পড়ল সেই সংবাদ। সেদিনও ছিল হাটবার। লাঠি সোটা নিয়ে ছুটে এল মানুষ দলে দলে। তারা বুড়া গোবিন্দকে ক্ষমা করল না, তার কোন কাকুতি মিনতি শুনলো না। লাঠির পর লাঠি পড়ল তার মাথার উপর। আঘাতে আঘাতে শেষ হয়ে গেল মানুষটা। তার শুধু একটাই দোষ, সে শিশুদের ভালবাসত। কাছে টেনে নিত স্নেহ-ভালোবাসায়। গোবিন্দবুড়ার মৃত্যু এখনও কি ভুলতে পেরেছে পীতাম্বর, নাকি সে কোনদিন তা ভুলে থাকতে পারবে?

মুড়ি খেতে খেতে দিগম্বরের উজ্জ্বল মুখখানার দিকে নিগূঢ় চোখে তাকাল পীতাম্বর। মুখ ফুটিয়ে সে কোন কথা বলল না। খাওয়া শেষ হলে ভরপেট জল খেয়ে এল পুকুর থেকে। আবার শুরু হল রোদ মাথায় টানা পথ চলা।

মাঠে মাঠে চলতে পারলে ছাউনি পৌঁছাতে বিকেল নামবে। ভিক্ষাম্বর আর পীতাম্বরের হাতে মোটা লোহার বালা। চাকু ঢুকিয়ে রেখেছে লম্বা ঝোলায়। দু-জনের হাতে দুটো পাকা বাঁশের লাঠি। দিগম্বরও লাঠি নিয়েছে জুতসই। বাইরে বেরলে লাঠি ছাড়া হলে চলে না। ভিন বস্তির কুকুরগুলো তাদের লাল পোশাক দেখে কামড়াতে আসে। তখন চাকু কিংবা চিমটায় কাজ চলে না। কুকুর ঠেকাতে লম্বা লাঠির দরকার।

দিগম্বরের মাথার উপর গামছার বিড়া। তার উপর চালের বোরা। এত হেঁটেও তার কোনো ক্লান্তিবোধ হয় না।

কথায় কথায় মাঝ মাঠে এসে যায় ওরা। মেদিনীপুরের মাঠগুলোয় টলটলে জলের পুকুর হল অলংকার। পথিকের কথা ভেবে কেউ না কেউ খনন করেছে এগুলো। এখন যাওয়া আসার পথে বিশেষত এই খরানী দিনে পুকুরগুলো কাজে লাগে পথিকের। বুড়া ভিক্ষাম্বর আর হাঁটতে পারছিল না, তার মাথা তেতে গরম কড়াই। দিগম্বরকে সে বলল, ই ব্যাটা, টুকে জিরিয়ে নে। ঘাড়টাকে টুকে আরাম দে। আরও ঢের পথ পড়ে আছে।

লাঠিতে ভর দিয়ে মাথা থেকে বোঝা নামাল দিগম্বর। গামছায় ঘাড় গর্দানের ঘাম মুছে সে চারা জামগাছের তলায় জিরিয়ে নিতে চাইল। ভিক্ষাম্বর আর পীতাম্বর গে[illegible] মাথা ভেজাতে পুকুরের জলে।

পুকুরপাড়ে নানা ধরনের গাছপালার সমাবেশ। ঝোপঝাড়ও কম নেই। বটগাছ আ[illegible] পুকুরের চারিদিকে। অত নির্জন বটতলায় এবড়ো খেবড়ো ত্বকের লাউ নামিয়ে রে[illegible] গিয়েছে গ্রামের মানুষ। ওসব লাউ মা শীতলা বুড়িকে উৎসর্গ করা। এসময় তেনার দ[illegible] হয়। ঘরে ঘরে হাম-বসন্তের ছড়াছড়ি। তাঁর কোপ থেকে বাদ যায় না গোরু ছাগল এম[illegible] কী গাছের লাউ। গৃহস্থ তাই মা শীতলার মন রাখতে লাউ পেড়ে এনে রেখে যায় বটতলায়।

পীতাম্বরের চোখ লাউ দেখে খুশিতে চিকচিকিয়ে উঠল। মা শীতলাবুড়ি সদাসর্বদা তাদের সাথে আছে। রাম-সীতার দয়ায় তাদের আর ভয় কী? গেরস্থের ফেলে দেওয়া

লাউ-কুমড়ো তারা ভক্তি ভরে নিয়ে যায় খাওয়ার জন্য। আগুন রোগজ্বালা সব পোড়ায়। আগুনের দয়ায় বসন্ত হওয়া লাউ খেলে তাদের কোন ক্ষতি হবে না।

মাথায় জল চাপড়ে ভিক্ষাম্বর পাড়ে উঠে এল আগে। তার দুপায়ে হদী আর কাদা জড়ানো। পীতাম্বর গামছা ভিজিয়ে জল দিল মাথায়। তারপর ভরপেট জল খেয়ে সে চলে গেল বটতলায় লাউ আনতে। উবু হয়ে একটা লাউ ধরতে যাবে তখনই ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলে গঙ্গারাম, তার হাতে দশাসই লাঠি। লাঠি মাথায় তুলে সে যখন সপাটে মারতে যাবে তখনই দূর থেকে এই ভযাবহ দৃশ্য দেখে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল ভিক্ষাম্বর, ভাইরে দুশমন!

পীতাম্বর লাউ ফেলে উঠে দাঁড়ানোর আগেই লাঠির বাড়ি খেয়ে ঘুরে গেল এক পাক। ঙ্গারাম তখন দ্বিতীয়বার আঘাত করার জন্য তৈরী হচ্ছে। কিন্তু সে সুযোগ তাকে আর ল না পীতাম্বর। সামনেই পড়েছিল মোক্ষম একটা পাথর। ওটা তুলে নিয়ে সে তাক রে মারতে চাইল গঙ্গারামের মাথায়। গঙ্গারাম চালাক কম নয়, ঘাড় নীচু করে শূন্যে াসিয়ে দিল পাথর। ততক্ষণে ঝোপঝাড় থেকে ক্রোধী চেহারা নিয়ে উঠে এল আরও ারজন। তাদের একজন পাকমোড়া দিয়ে ধরে রেখেছে ভিক্ষাম্বরকে। গালিগালাজ করে লছে, হারামীর ছা, শুয়োর বেচার টাকাটা মোদের হাতে তুলে দে সোজা হয়ে। নইলে ব বুকে বর্শা ভুখে দিব। তুর বিটিটার বড় দেমাক তাই না! আজ আর বাঁচন লাই দের। কেউ তুদের বাঁচাতে পারবেকনি আচ।

ভিক্ষাম্বর কঁকিয়ে চিৎকার করে ওঠার আগেই লাঠি বাগিয়ে বাঘের পেশী নিয়ে ছুটে ল দিগম্বর। তফাৎ-এ দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলল, বাপরে, ছেড়ে দে। নাহলি পরে তুর াথা আমি ফাটায় দিব।

—তবে রে শালা।

পুকুরপাড়ে খরাবেলায় জমে উঠল লড়াই। একা লাঠি হতে দিগম্বর রাগে গোঁসায় য়ে গেল দশজন। তার হাতের লাঠি বনবনিয়ে ঘুরল। বর্শা ছুঁড়ল গঙ্গারামের লোকজন। সই বর্শা হাতে করে ধরে নিল দিগম্বর। জান বাজি রেখে সে হুংকার ছাড়ল, মায়ের ধ খেয়ে থাকলে এগিয়ে আয়। পালাচ্চিস কুথায়, শুয়ারের ছা?

ফাঁকা মাঠ কাঁপিয়ে দুড়দাড় গতিতে পালিয়ে গেল ওরা। লাঠিটা পুকুরের জলে ধুয়ে ায়ে, চোখে মুখে জল দিয়ে আবার ডাঙায় উঠে এল দিগম্বর। বুড়া বাপের হাত ধরে লল, বাপ রে, তুর চোট লাগেনি তো? ভিক্ষাম্বর হা করে তাকাল সেই অসুর শক্তি দহের দিকে। গর্বে ফুলে গেল বুক। ছাউনিতে ফিরতেই সূর্য চলে গেল পশ্চিমে, সূর্যের রম চোখে এখন শাসন করার ইচ্ছে নেই। বুড়া ভিক্ষাম্বর বলল, আচকে যা ঘটল এরকম যন আর কুনোদিন না ঘটে। লড়াই কাজিয়ায় সমাজের ইজ্জোত বাড়ে না, মুখ দেবে ায ঘাসে।

বুড়াটার মনে সেই থেকে হা-হুতোশ। লড়াই ঝগড়া সে কোনদিনও চায় না। গঙ্গারামের লটা পায়ে পা দিয়ে কাজিয়া করে। এর আগেও বাঁধের ধারে তারা লড়াই-এ নেমেছিল। দিন শুয়োর চরানোর কচুবন নিয়ে লড়াই-ঝগড়ার সূত্রপাত। গঙ্গারাম বুকের সিনা লিয়ে বলেছিল, জোর যার মুলুক তার। লাঠি যার শুয়ার তার। সেদিনও লাঠির জবাব ঠি দিয়ে দিয়েছিল পীতাম্বর আর দিগম্বর। হরিহরণের মাথা ফেটেছিল মতিলালের লাঠির

আঘাতে। জলকচুর গাছগুলো অবজ্ঞা ভরে তুলে ছুঁড়ে পেলে দিচ্ছিল সে। গলার রস ফুলিয়ে বলেছিল মোদের শুয়ার যখন কচু বনে চরতে পারবেনি, তখন কচুবনও মুই রাখবানি। মুই সব ধ্বংস করে দিবা। দেখি মোকে কে ঠেকায়।

সেদিন ঘণ্টা দেড়েক ধরে চলল লাঠালাঠি। দলের মেয়েরাও সেদিন নিরপেক্ষ থাকল না। চুলোচুলি ধস্তাধ্বস্তিতে ওরাও কাহিল হল। শেষে সন্ধিবার্তা নিয়ে মুখোমুখি হল দুই বুড়ো। রামসিং সম্প্রদায়ের ভিক্ষাম্বর বলল, লোহায় লোহা কাটে কথা ঠিক, এতে কার কী ফায়দা হলো? উপরপানে ছেপ ফেললে নিজের মুয়ে পড়ে। সে ছেপ মুছাতে অন্যজাতের লোক আসবেনি। ওরা দূরে দাঁড়িয়ে নখ বাজাবে, মজা লুটবে। সেটা কি ভাল দেখায়?

ভীম সিং দলের সর্দার বলল, তাহলি কী করা ভালা হবেক? চ্যাংড়া ছোকরার বুড়াথুড়ার কতা শুনতি চায় না।

সবাই বললো চারণক্ষেত্র ভাগ হোক।

ভিক্ষাম্বর এক বাক্যে মেনে নিয়েছিল প্রস্তাব। যে যার এলাকায় ঘুরবে খেলবে শুয়োর চরাবে এতে আর না মানার কী আছে। দল নিয়ে সে জ্ঞানত অন্যের চারণক্ষেত্রে যায় না। গেলেও আগে ভাগে সমঝোতার কথা বলে নেয়। নাহলে কাকমারাদের বাৎসরিক বিচার সভায় কেস উঠবে। হাকিম জরিমানা করবে। সমাজের দশটা লোক দশ কথা বলবে সেটা ভাল দেখায় না। পীতাম্বরের চুলে পাক না ধরলেও ভিক্ষাম্বরের কথাকে সে অস্বীকার করতে পারে না। বড় ভাইকে দলের সর্দার জ্ঞানে মান্য করে সে। নিজের সততা সে শত অভাবেও বিসর্জন দেয়নি। কাকমারা সমাজের বদনাম হলো চুরিবিদ্যা। যে বদনামের কলঙ্ক দাগ তারা আজীবন বয়ে বেড়াচ্ছে তা ধুয়ে মুছে সাফ সুতরো করার জন্য সে বদ্ধপরিকর। ব্যবহারিক জীবনেও সে পিছিয়ে নেই এই আদর্শ থেকে। পরের জিনিস বলে সে কোনোদিন ছাউনিতে আনে না। তার বাপ বলত, এ গতর দিয়েচে ভগবান হাত কান চক্ষু ধর্ম সবই তাঁর দান। তাঁর দয়ায় জীবের কুনো ক্ষতি হবেক না কুনোদিন। যশ অপযশ সবই বিধির হাতের লাড্ডু। যে যত কুড়াতে পারে তার তত পরধন গচ্চা হয়।

বাপের কথাগুলো কঠিন, যুবক বয়সে না বুঝলেও এই মাঝবয়সে এসে সে ঠিক বুঝে গিয়েছে। অসুখ ভাল হয়ে যাওয়ার পরে ঝুমরি গিয়েছিল গা ঘুরতে। দশরথ মাইতির পেতলের জামবাটিটা সে পুকুরঘাট থেকে তুলে এনেছিল লুকিয়ে। প্রায় সের খানিক ওজন হবে। জামবাটিটা পীতাম্বরের হাতে ঝুমরি তুলে দিয়ে গর্বিত ঢঙে বলেছিল, ইটা মোর আচকের কামাই। ইটা বিচে তুই মোর লাগি এট্টা লুগা কিনে আনবু।

পীতাম্বরের মাথায় কাঁকড়া বিছে কামড়ে দিল, জামবাটিটা হাতে নিয়ে সপাটে ছুঁড়ে মেরেছিল ঝুমরির শরীরে। কোঁক করে আওয়াজ হলো, তারপরই ব্যথা যন্ত্রণা হজম না পেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ঝুমরি। পীতাম্বরের রাগ তখনও পড়েনি, শুকনো চ্যালাকাঠ দিয়ে সে ঝুমরিকে পেটাল মনের সুখে। মার খেয়ে মুর্চ্ছা গেল বউটা। রক্ত ঝরল, মুখে উঠে এল সফেদ ফেনা। বিপদ দেখে ছুটে এল বিন্দিয়া আর মন্থরাবুড়ি। সব শুনে বুড়ি বলল, বোহু'কে মারলে কাকমারাদের বদনাম কি মুচে যাবে ভাই? অভাবে বোহুটার স্বভাব লষ্টো হয়েচে। অসুকে ভুগে ভুগে ওর শরীলে আর কিচু লাই। বেশি মারলে ম্যায়াঝি

মরি যাবে।

কারোর কথা শোনার মত অবস্থায় ছিল না পীতাম্বর। রাগে সে ফুঁসছিল। ভিক্ষাম্বর তাকে বুঝিয়ে বলল, যার জিনিস তারে ঘুরোন দিয়ে আয়। বাবুর হাত-পা ধরি মাফি মাঙবি। কইবু, এ কাজ জীবনে আর কুনো দিন হবেকনি।

জামবাটি ফেরত দিতে গিয়ে দশরথ মাইতির হাতে বেধড়ক পিটুনী খেল পীতাম্বর। গাঁয়ের লোকে মেরে তার গা-হাত-পা ফাটিয়ে দিল। নীরবে, বিনা প্রতিবাদে মার খেয়ে ছাউনিতে ফিরে এল পীতাম্বর। শরীরের কষ্টটা তখন তার কাছে কোনো কষ্ট নয়। ঝুমরি যখন বলল, 'ফুলাগুলায় টুকে গরম কানি সেঁক দিয়ে দিই। তখনও সে গর্জন করে বলল, তুই মোকে ছুঁবুনি। তুর চক্ষু দুটায় পাপ আচে। তু লোভী। কচুবনের কিঁচড়। মোর সমুখ থিকে তফাৎ যা।

সে রাতটা ঘুমাতে পারল না ঝুমরি। অনুশোচনার আগুন তাকে পুড়িয়ে খাক করে দিল। সে রাতেই সে স্থির করল মরা পেটের জন্য সে আর চুরিচামারী করবে না। ওপরওলা জান দিয়েছে, ভুখে-দুখে সে জান নেয় নিক। তার ইচ্ছায় জগত-সংসার চলছে। শুধুমুধু অপবাদ কুড়িয়ে মুখে চুন-কালি লেপে কী লাভ? কালো চুলের সে যদি ভাল করতে না পারে তাহলে খারাপ করবে না কোনো দিনও।

সেদিন থেকে পুরোপুরি পাল্টে গেল ঝুমরি। তার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল প্রায়শ্চিত্ত করার বাসনা। তার মনোবাসনার কথা রাম-সীতা শুনল বুঝি মন দিয়ে। একদিন ভিক্ষায় বেরিয়ে সেই অপূর্ব সুযোগ সে পেয়ে গেল। দশরথ মাইতির পুকুরে পা হড়কে ডাঙা থেকে পড়ে গিয়েছে তার ছ'বছরের ছেলে শিবু। মাঝ পুকুরে হাবুডুবু খাচ্ছে ছেলেটা। তাকে বাঁচবার জন্য আশে পাশে আর কেউ নেই। ঝুমরি এক মুহূর্তের জন্য দেখল। মনের ভেতরটা তার আকুলিবিকুলি করে উঠল। নিজেব জান যায় যাক, ছেলেটাকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে। পেতলের জামবাটিতে দুধ মুড়ি খেত ছেলেটা। বাবুঘরের ছেলে অকালে কেন ঝরে যাবে? উতলা, উদ্‌ভ্রান্ত ঝুমরির খেয়াল নেই তার পিঠে কাপড় দিয়ে বাঁধা আছে তার নিজের ছেলে। অন্যের বিপদ দেখে সে বেবাক ভুলে গিয়েছে নিজের ছেলের কথা। আর দেরী করে না ঝুমরি। পুকুরপাড় থেকে রাম-সীতার নাম নিয়ে ঝাঁপ মারে জলে। জল দাপিয়ে তড়িৎ গতিতে পৌঁছে যায় শিবুর কাছে। ছেলেটাকে ডাঙ্গায় তুলে দেখে তার নিজের ছেলে জল খেয়ে মৃত্যুর সাথে লড়ছে। ততক্ষণে দশরথ মাইতি এসে গিয়েছে মাঠ থেকে। শিবুকে নয় ঝুমরির পিঠের বাঁধন খুলে শিশুটাকে শুইয়ে দেয় পুকুরপাড়ে। ঝুমরির তবু হুঁশ নেই, সে পাগলের মতো শিবুর পেটে চাপা দিয়ে জল বের করছে। তারপর পা দুটো ধরে বনবন করে ঘোরায় মাথার উপর। পেটের জল ছিটকে বেরয় নাক-মুখ দিয়ে। ধীরে ধীরে সুস্থ হয় শিবু। দশরথ মাইতিও ঝুমরির ছেলেটাকে সুস্থ করে তোলে। পুকুরপাড়ে জমে যায় শ'মানুষের ভিড়। সবাই একবাক্যে বলে, এমন মা কোনদিনও পাওয়া যাবে না। কাকমারা বউটা যদি ঠিক সময় জলে ঝাঁপ না দিত তাহলে শিবু আর বাঁচত না। হা দেখ ওর ছেলেটা কেমন নীল হয়ে আছে জল খেয়ে। মা শীতলা বুড়ির দয়ায় ছেলে দুটো যেন বেঁচে উঠুক। এক মায়ের কোল বাঁচাতে গিয়ে অন্য মায়ের যেন কোল ফাঁকা না হয়ে যায়।

রাম-সীতার দয়ায় দুজনেই বিপদ কাটিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে। ঝুমরির ঠোঁটে

ফুটে ওঠে অনাবিল স্নিগ্ধ হাসি। দশরথ মাইতি এবং তার স্ত্রী রমা তার সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ায়। অশ্রুসজল চোখে তাকায়। রমা তার হাত ধরে বলে, আজ তুমি যা আমাদের উপকার করলে, এ ঋণ যে বুকের রক্ত দিয়েও শোধ করা যাবে না। নিজের ছেলের প্রাণ না দেখে তুমি আমার ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছো। বলো তোমার কী চাই?

ঝুমরি মলিন হেসে তার রুগ্ন ছেলেটিকে আবার পিঠে বেঁধে নেয়। একটাও কথা বলে না, মুখ নীচু করে হেঁটে যায়। দশরথ মাইতি তার হাতে গুঁজে দিতে চায় দশটা টাকা আর সেই পেতলের জামবাটিটা। চোখের জল মুছে বলে, এটা নিয়ে যাও মা। তোমার ছেলে এই জামবাটিতে ভাত খাবে।

ঝুমরি নিল না, ভেজা শরীরে ফিরে এল ছাউনিতে। কোলের ছেলেটাকে বুকের দুধ ধরিয়ে দিয়ে আদর করল বহুক্ষণ। ছেলেব গায়ে হাত বুলিয়ে সে নিজেকে মানুষ ভাববার চেষ্টা করল।

সন্ধেবেলায় গাঁ ঘুরে ফিরে এল পীতাম্বর, ঝুমরির জন্য তার চোখে-মুখে গর্বের রঙ। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আলতো গলায় শুধোল, সেদিন তুরে বহুৎ মেরেচি, তু মোকে মাফ করি দে।

ঝুমরির চোখেও টসটসে জল, কাঁদো কাঁদো স্বরে সে বলল, মোর জন্যি তুর বহুৎ দুখ্-তক্‌লিফ। তু মোকে মাফ করি দে।

কান্নায় ভেঙে পড়ল দু-জনায়।

ভিক্ষাম্বর সেদিন বাটি দুয়েক হাঁড়িয়া বেশি খেল আনন্দে। গলা চড়িয়ে গান গাইল বাম-সীতার। হঠাৎ ঘোলাটে চোখে সে দেখল কারা যেন আসছে ছাউনির দিকে। সংখ্যায় তিন চারজনের কম নয়। ভিক্ষাম্বর সতর্ক হওয়ার আগেই দশরথ মাইতি হাতজোড় করে দাঁড়াল তার সামনে, বিনীত ভঙ্গিতে বলল, আমি গাঁ থেকে এসেছি তোমাদের সাথে দেখা কবব বলে। আজ দুপুরে তোমাদের বউ আমার ছেলেটাকে বাঁচাল। তার ঋণ তো এ জীবনে শোধ দেবার নয়। আমি অক্ষম মানুষ, আমি তা পারবও না। আমি শুধু ঘরের কিছু জিনিস এনেছি। ওগুলো খুশি মনে তোমাদের নিতে হবে।

ভিক্ষাম্বরও হাতজোড় করে উঠে দাঁড়াল, গদগদ কণ্ঠে বলল, হেই বাবু, মানুষ-জেবনটা কুনোদিনও ছোট লয়। জেবন কেলেঘাই নদীর মতুন। তু যা এনেচিস দিয়ে যা। তুঁরে ফিরায় দিলে গুনাহ্ হবেক।

সন্ধ্যার আলোছায়ায় মানুষের জীবনযাত্রা আকাশের চেয়েও উদার হয়ে ওঠে। ফারাক বোঝা যায় না আকাশ আর হৃদয়ের।

## ।। আট ।।

বাঁশ বাগানের ঘুবঘুট্টি আঁধারে ধাড়ী শুয়োরটা বাচ্চা দিয়েছে আটখানা। হরিহরণ জানতেও পারেনি কখন এসব কাণ্ড ঘটেছে। তবে মাদী শুয়োরটা ক'দিন থেকে ডাকছিল। পশুটার পেটটা ঝুলে যাচ্ছিল মাটির দিকে। স্তনবৃন্তে টানটান উত্তেজনা যেন পাকা ফোঁড়া ফেটে যাবার উপক্রম। হরিহরণ বুঝতে পারেনি এত তাড়াতাড়ি ছানাপোনা হয়ে যাবে মাদী শুয়োরটার। পীতাম্বর রোজ সন্ধ্যায় মাল গুণতে এসে দেখল ধাড়ী শুয়োরটা আসেনি।

কোথায় যেতে পারে রাত বেরাতে? চিন্তাটা মাথার মধ্যে ছিল। ভোরের আলো না ফুটতেই সে চলে গিয়েছিল খালধারে। ওখানে গেলে জানোয়ার গুলোর জানোয়ার বৃত্তি শতগুণ বেড়ে যায়। স্ফূর্তি আসে মনে। হরিহরণ ঘণ্টা দুয়েক তন্নতন্ন করে খুঁজে না পেয়ে ফিরে এল বেজার মুখে।

বাঁশঝাড়ে জলকাজ সারতে গিয়েছিল মন্থরাবুড়ি। পচা ডোবাটার পাশের ঝোড়ে সে প্রথম মাদী শুয়োরটার গোঁত গোঁতানী শুনতে পায়। সঙ্গে সদ্যজাত বাচ্চার কচিকাঁচা ধ্বনি। নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারেনি সে, বাঁশ ঝাড়ের আড়লে লুকিয়ে দেখেছে সব কিছু। যা সন্দেহ করেছিল তা হাতেনাতে ফলে গেল। মনটাও ভরে উঠল খুশিতে। শুয়োরের ছা জন্ম নিলে খুশিতে মেতে ওঠে এই ভবঘুরে মানুষগুলো। তাদের মৌজ-মজলিশ জমাবার একটা বাহানা চাই। এর চেয়ে বড় বাহানা আর কিছু নেই। ভেজা পায়ে ডোবা থেকে তড়িঘড়ি করে ফিরে এল মন্থরাবুড়ি। কেন না এসময় মাদী শুয়োরের কাছে ঘেষা ভাল নয়। হালকা পেট নিয়ে মাদীটার এখন গায়ের জোর বেড়ে যায় শতগুণ। ছানাগুলোর উপর দবদ উথলে পড়ে। সবাইকে মনে করে শত্রু। কাউকে ঘেষতে দেয় না ছানাগুলোর কাছে। ছায়া দেখলেই তেড়ে আসে অসুরশক্তিতে।

মন্থরাবুড়ির সঙ্গে হরিহরণ যাচ্ছে ছানাগুলো আনতে। তার হাতে পাকা বাঁশের লাঠি। মাদী শুয়োর ঝামেলা করলে মেরে ঠাণ্ডা করে দেবে সে। মন্থরাবুড়ির হাতে আছে কঞ্চির ঝুড়ি, খড় দিয়ে বানানো বিড়া। ওদের আর সতর্কতার শেষ নেই।

ধাড়ী শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে টপাটপ ঝুড়িতে ভরে গাঢ় নিঃশ্বাস ছেড়ে দিল মন্থরাবুড়ি। এত সহজে এত বড় কঠিন কাজ যে হয়ে যাবে এটা স্বপ্নেও ভাবেনি সে। ফলে হরিহরণকে বলপ্রয়োগ কবতে হল না। কাজটা সহজে মিটে যেতেই মন্থরাবুড়ি বলল, চ। ঝামেলা মিটে গেচে। ইবার ফেরা যাক। আলতায় জল ঢেলে দিলে যেমন রঙ হয় তেমন রঙ শুয়োরের বাচ্চাগুলোর। দেখামাত্রই বিন্দিয়ার আদর করতে মন চায়। মন্থরাবুড়ির বাড়াবাড়ির আর শেষ নেই। সে শুয়োরের ছা-গুলোকে স্নান না করিযে চুমা এঁকে দিল পটাপট। তার লজ্জা-ঘেন্নার বালাই নেই ফলে মন যা চাইল তাই সে কবে বসল। ঝুমরি তার আদর করাব ভঙ্গি দেখে ঠোঁট টিপে টিপে হাসল।

চড়কেব মেলা বসেছে খালধারে। জল সন্ন্যাসী, পাটভক্তা খালের জলে ডুব দিয়ে সরাসরি উঠে যাবে চড়কমাঠে। 'জয় বাবা ভোলানাথের শ্রীচবণে দয়া লাগে'—এই হলো তাদের উপোসকালীন বুলি। বিন্দিয়া গাঁয়েব মধ্যে গিয়ে শুনে এসেছে আজ যাত্রা হবে। পালার নাম—সীতার পাতালপ্রবেশ। রাম-সীতাব গল্প সে কিছু কিছু শুনেছে। মন ভাল থাকলে ভিক্ষাম্বর শোনায় ওদের।

যাত্রার খবরটা শুনে বিন্দিয়া মনে মনে বড় উতলা। সে তাব মনের ঢেউ মনের ভেতর ভাঙছে। ফেরার সময় কাঠপোলটার কাছে জটায়ুর সঙ্গে তাব দেখা হল। দেখা মাত্রই জটায়ু বিড়ি টানতে টানতে তার কাছে চলে এল। হাওয়া যেমন সুগন্ধ বয়ে নিয়ে যায় তেমনি তার চালচলন। মনে মনে খুশি হয় বিন্দিয়া। নিজেকে দেখে বারবার। জটায়ুর মনে সে যে দাগ কাটতে পেরেছে এটাই তার কাছে অনেক বড় কথা।

জটায়ু মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো, তোমার কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটছিলাম। দেখা না হলে খারাপ লাগত।

বিন্দিয়া ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসল, জটায়ু যে তাকে ভালবাসে একথাটা এখন আর বানানো নয়। সেদিন খালধারে সে গঙ্গারামকে যেভাবে পেটাল তাতে মনের টান না থাকলে কোনদিনও সম্ভব হোত না। মার খেয়ে গঙ্গারাম কাহিল অবস্থায় পালাল। জটায়ু সেদিন তার হাত ধরেছিল আবেগের ঘোরে। তার বুকের ভেতর তখন জোয়ার আসার কলকলানী শব্দ। গ্রামের মানুষ খালপাড়ে দাঁড়িয়ে দেখল জটায়ু হাত ধরে আছে কাকমারাদের মেয়েটার। এর চেয়ে আর পাপের কাজ কী হতে পারে। গ্রামের মানুষ একবাক্যে রায় দিল, পাপ খণ্ডাতে খালের জলে গিয়ে ডুব দিতে। জটায়ু কারোব কথা শুনল না। বরং সে গলা চড়িয়ে প্রতিবাদ করে বলল, কেনে ডুব দেব। মানুষের হাত ধরলে মানুষের কি জাত যায় কখনও?

তার এই প্রশ্নের কেউ উত্তর দিতে পারেনি।

দিগম্বর সেদিন জটায়ুকে ভাল চোখে দেখেনি। সে বিন্দিয়াকে সকর্ত করে বলেছিল, নিজেরে সামলা। কাকের বাসায় কোকিল ডিম পেড়ে চলে গেলে কাকের কুনো ফায়দা হয় না। বুন, তুই বড়ো সাদাসিধে। দুনিয়াটা অতো বেশি সাদাসিধে নয়। ইখানে আগুন খেলে মু' পোড়ে। কাদায় হাঁটলে গায়ে ছিটে লাগে।

দাদার মুখের উপর কোনো কথা বলেনি বিন্দিয়া। যেখানকার দানা খায় সে, সেখানকার মানুষকে যদি ভালবাসে তাহলে দোষ কোথায়? দোষ কোথাও নেই, বিন্দিয়া জানে। খালপাড়ে জটায়ুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কুলকুল করে ঘামতে থাকে। জটায়ু তার গায়ের উড়নিটা বিন্দিয়াকে দিতে চায় ঘাম মোছার জন্য। বিন্দিয়া নেয় না। চোখ-মুখ কেমন করে বলে, তু বাবু মানুষ। তুঁর উড়নি আমি নিলে ঠেলে দিতে পারবক না। তুঁর ভালা করতে লা পারি, তুঁর ক্ষতি করতি পারবানি।

জটায়ুর ইচ্ছা করে বিন্দিয়ার গাল টিপে দিয়ে চুমা খেতে, কিন্তু সে পারে না। ঝরে যাওয়া মুকুলের মতো তার আশা মাটিতে লুটায়, স্বরভঙ্গ পাখির গলায় বলে, আজ চড়ক মাঠে যাত্রা আছে। আসরে মুই থাকব। তুমি আসবা তো?

বিন্দিয়ার বুকে ঢেঁকির পাড় দেয়, গাঢ় করে শ্বাস ছেড়ে সে দূরের দিকে তাকায়। এভাবে জড়িয়ে যেতে তার ইচ্ছে করে না। কৃত্রিম ব্যস্ততা দেখিয়ে বলে, মুই যাই। ইখানে বড্ড গরম বাবু!

খালধারে তো কারোর গরম লাগাব কথা নয়?

বিন্দিয়া মুখ নামিয়ে নেয় ধুলোপথে পথ চলতি কেউ যদি তাদের দেখে ফেলে তাহলে আর রক্ষে নেই। নিন্দার তুফান ছুটবে গাঁয়ে-গঞ্জে। তিল হয়ে যাবে তাল। দিগম্বর শাসন করবে তাকে। আবার টেনে আনবে কোকিলের উপমা।

ভবানীচক থেকে খবর এল যমুনাবতীর শরীর নাকি ভাল নেই। ওর হাঁপানীর টান বেড়েছে। ভয়ানক শ্বাস কষ্ট। খবরটা শোনার পর থেকেই দিগম্বর ভাবল তার একবার যাওয়া দরকার। ওখানকার ছাউনিতে যমুনাবতী একা আছে। ছেলে দুটোকে নিয়ে সে কী খাচ্ছে, করছে বলা দায়। ভিক্ষাম্বরকে মনের কথা খুলে বলতেই রাজি হয়ে গেল বুড়া।

দিগম্বর ভবানীচকের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল।

সে গিয়েই দেখা করে ফিরে আসবে। এ সময় বউ নিয়ে শুয়ে থাকার সময় নয়, আর ক'মাসের মধ্যেই বর্ষা নেবে যাবে গ্রামাঞ্চলে। তখন ঘরের বাইরে থাকবে চাষাভুসো

মানুষ। সবার হাতে কাজের গন্ধ লেপটে যাবে। কারোর সাথে কারোর বাজে কথা বলারও সময় থাকবে না। তখন কাকমারাদের শোচনীয় দিন যায়। ফাঁকা মাঠে ছাউনি পোঁতা যাবে না। পোড়ো বাড়ি বা নির্জন কোঠাদালানে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করবে তারা। আপ্রাণ চেষ্টা করবে মাথা বাঁচাতে বর্ষার হাত থেকে। পেট বাঁচাতেই এখন থেকেই সঞ্চয় করার দরকার। বর্ষায় কেউ ভিক্ষা দেয় না। অনেকেই বলে জনমজুর খাটতে। কিন্তু ওরা কর্মবিমুখ। পরের কাজে ওদের তেমন কোনো উৎসাহ নেই। কোনমতে দিনটা চলে গেলেই হলো!

যমুনাবতীর শরীরের অবস্থা ভাল নয়। কাশলে ফ্যাসফ্যাস করে ওর হৃদযন্ত্র। চোখের কোনে জল এসে জড়ো হয়।

দিগম্বরকে দেখে যমুনাবতী আর চোখের জলকে আটকে রাখতে পারল না, হাতটা আঁকড়ে ধরে বলল, মুই মরি গেলে তু আর সাঙা করবুনি মোর মাথা ছুঁয়ে বল! তু যদি ফিরে সাঙা করিস তাহলি মুই তোকে ছাড়বানি। ভূত হয়ে তু'র গর্দানে চাপি বসব। মোর ছুয়া দুটার মন দুধসাদা। তাদের মনে কুনো দুখ্ দিবেনি কও।

দিগম্বর এসব কথার অর্থ বুঝতে পারে না, তার শুধু চোখ ফেড়ে জল আসে। যমুনাবতীর হাতটা শক্তভাবে চেপে ধরে বলে, তু চুপ যা বউ। তুর কতা শুন্‌লে মোর কলিজাটা টুক্‌রা-টুক্‌রা হয়ে যায়।

একদিন যমুনাবতীর কাছে কাটিয়ে পরের দিন সাঁঝবেলায় সে হাঁটা শুরু করে। যমুনাবতীই তাকে দিনের বেলায় যেতে দিল না। বারবার কাঁদাকাটি করে বলল, দিনমানে গেলি মোর চিন্তা হবেক। গাঁয়ের মানুষ-কুকুর দুটাই ভালা লয়। তারা ভরঘুরে লোকগুলাকে দেখলে গ্যাংটাপাথর ছুঁড়ি মারচে।

ছোট বড়র কথা দূর দেশে গেলে শুনতে হয়। দিগম্বর সন্ধ্যার ছায়ায় পথ হাঁটে। পরনে চির পরিচিত সেই পোশাক। হাতের বালা ঠরর্‌ঠরর্ করে নড়ছে। দ্রুত হাঁটতে গেলে ঝোলাটা ডানে-বাঁয়ে। বড় অস্বস্তি হয় তখন। তবু হাঁটার কোনো বিরাম নেই।

যমুনাবতী আসার সময় ছেলেমানুষের মতো কাঁদছিল, তু মোকে সাথে করে লিয়ে চল্। ইখানে একা থাকলে মুই দমঘুঁটে মরে যাব।

রাতের আকাশে চাঁদের গোলমুখ হেসে ওঠে। এলোপাথাড়ি হাওয়ায় দিগম্বরের লম্বা চুল লাফাঝাঁপা খেলে। হাওয়া শুষে নেয় ঘাম। শুনশান পথে ভয় লাগে দিগম্বরেব। তার ভূত-প্রেতকে ভয় নেই, যত ভয় মানুষকে। ছাতিফাটা মাঠের আলের উপর বুনো জামগাছ। আঁধারে জোনাকীরা খেলে বেড়ায়। চাঁদের অলোয় পথ দেখা গেলেও অন্ধকারের ঘনত্ব কাটে না। দ্রুত গতিতে হেঁটে এসে সামনের দিকে তাকিয়ে দিগম্বরের পা আর উঠতে চায় না। শরীরের সব রক্ত বুঝি জমে বরফ হয়ে গিয়েছে এক মুহূর্তে। মাত্র দশ-পনের হাত দূরে দাঁড়িয়ে সে যে দেখছে তা কি সত্যি? চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না সে। গায়ের জোরে চিমটি কেটে দেখে হুঁশ আছে কিনা। বাস্তবের মাটি তাকে আরও সতর্ক করে তোলে। ঠায় দাড়িয়ে লোম চাগান দৃশ্য দেখতে থাকে দিগম্বর। একসময় তার কানে আছড়ে পড়ে কান্নার ধ্বনি। জামগাছের গোড়ায় বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এ কোন হতভাগী? সে কি রক্তমাংসের মানবী না প্রেতাত্মা! কান্নার মর্মস্পর্শী আবেদনে দিগম্বর বুঝতে পারে না এই মুহূর্তে তার কী করণীয়। অনেকটা সময় পার হয়ে যায় ভয়ের সুড়সুড়ি দিয়ে। যত সময় যায় ততই জমাট হতে থাকে ভয়। কুলকুল করে ঘামতে থাকে সে।

গলা শুকিয়ে আসে নির্জন ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে। কী তার করণীয় কোন কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। এত রাতে কে কাঁদে অমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে? গলার আওয়াজ শুনে বোঝা যায় যে কাঁদছে তার বয়স বেশি নয়। তবে কি তাকে ধরার জন্য প্রলোভনের ফাঁদ বিছিয়ে রেখেছে রাত্রি? বিপদের মুহূর্তে দিগম্বর রাম-সীতার নাম আউড়ায় ঘনঘন। বুকের সাহস ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করে। কাজটা যে কত কঠিন তা সে হাড়ে হাড়ে টের পায়। মেঠোপথ ধরে ছাউনিতে ফিরতে হলে তাকে জামগাছের পাশ দিয়ে যেতেই হবে। ঘুরপথে গেলেও কি সে নিস্তার পাবে। বুকে সাহস সঞ্চয় করে দিগম্বর আর একবার জামগাছটার দিকে তাকাল। খুব মন দিয়ে সে বুঝতে চাইল কান্নাটা প্রকৃত মেয়েমানুষের কিনা। কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারল না সে। রহস্যে মোড়া এই দৃশ্য সে কিছুতেই বাস্তবের সাথে মিলিয়ে নিতে পারল না।

রাতের আকাশে তারা ফুটেছে ঝিকিমিকি। অন্ধকারের ঘনত্ব কমছে ধীরে ধীরে। দমকা হাওয়া এসে আছড়ে পড়ল দিগম্বরের বুকের উপর। কিঞ্চিত আরামবোধ হতেই বুকে থুতু দিয়ে এগিয়ে গেল সে। যা লেখা আছে কপালে তা ো হবেই হবে। ক' পা এগোতেই পায়ের শব্দে হুঁশ ফিরে পেল ক্রন্দনরত মহিলা। শাড়ি গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার হাতে ছোট একটা কাপড়ের পোটলা। অন্ধকারে যতটুকু দৃষ্টি বিনিময় সম্ভব তার চেয়ে বেশি কিছু হয়ে গেল চোখে ঠোকাঠুকি লাগতেই। পোটলা বুকের কাছে চেপে খুবই অসহায় গলায় অজ্ঞাত পরিচয় মহিলাটি চেঁচিয়ে উঠল, খবরদার আর এক পাও এগোবে না। যদি এগোয় তাহলে আমি তোমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাব। কেউ আমাকে ছুঁতেও পারবে না।

উদভ্রান্ত দিগম্বর প্রশ্ন করল, তু কে আচিস বটে? ভূত-প্রেত-ডাকিনীযোগীনী যাই হোস না কেনে মুই তোকে ছাড়বানি।

মহিলাটি সব কথা শুনল না পোটলা নিয়ে খালধারের দিকে দৌড়তে লাগল প্রাণপণে। সে হাওয়ার বেগে পেরিয়ে যেতে চাইল এক ফসলের মাঠ। অন্যের পলায়ন দিগম্বরেব সাহসকে বাড়িয়ে দিল শতগুণ। সে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ান যুবক, সে কেন ভয়ে কাঁপবে?

মহিলাটি ছুটছে তো ছুটছে। তার শাড়ি এলোমেলো, পোশাক-পরিচ্ছদের হালচালও ঠিক নেই। তিন চারটে মাঠ পেরিয়ে আসার পরেই শাড়ির পাড়ে পা বেঁধে গুমড়ে পড়ল সে। উঠে দাঁড়াবার আগেই তার কাছে হাওয়ার গতিতে পৌঁছে গেল দিগম্বর। বুকের উত্তেজনা থিতিয়ে গেল মেয়েটার নরম চাঁদের মতো মুখ দেখে। অশ্রুর আলপনা তার মুখের উপর আদৌ মানায় না। দিগম্বর নিজেকে উত্তেজনার হাতে সঁপে না দিয়ে শুধোল, তু কে আচিস বটে? ঘর কুন্‌টি? কথা ক।

—আমি তো তোমার কোনও ক্ষতি করিনি। তবে তুমি কেন আমার পথ আটকাচ্ছ?

—আগে ক তু কে?

—আমি মানুষ। আমি মানুষ গো!

—অত রাতে ইখানে কী করচিস? বল্ তুর ঘর কুন্‌ঠি?

আমার কোনও ঘর নাই। মহিলাটি বলল, হাতের উল্টো পিঠে চোখ মুছে নিয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়াল। দিগম্বরের কী করণীয় কিছু বুঝে পেল না। রাত্রির পান্‌সে অন্ধকার ছুঁয়ে আছে উভয়কে। মহিলাটির ফোঁপানী থামেনি তখনও, অপরিচিত এক পুরুষের কাছে সে তখন অনর্গল কথা বলা এক নারী, দিগম্বর শুনছিল তার কথা।

বিদ্যাধরী অশ্রুভেজা স্বরে বলল, তুমি কেন এ সময় এলে গো? আমি তো মরতেই চাই। আমার এ জীবনের কোনও দাম নেই। আমার ঘরের মানুষটা দেখেও দেখে না। সে আবার বিয়ে করেছে। ওরা মা-ছেলেতে মিলে আমাকে খুন করতে চেয়েও পারল না। কপাল জোরে আমি বেঁচে গেলাম। বেঁচে গিয়ে ওদের চোখের কাঁটা হয়ে গেলাম। তুমিই বলো কারোর চোখের কাঁটা হয়ে কি এত বড় জীবনটা পার করা যায়? কথা শুনে দিগম্বরের চেতনা লুপ্ত হবার উপক্রম। বিদ্যাধরী যে বাবুঘরের বউ এটা বুঝতে তার কোনো অসুবিধা হয় না। সংকোচ-জড়তার বেড়া টপকাতে গিয়ে দিগম্বর একই জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়ায়, শুধু বিড়বিড় করে শুধায়, তুর ঘর কুন্ঠি?

গভীর কুয়োর ভেতর যেন হারিয়ে গিয়েছে বিদ্যাধরীর গলা, কেঁউটগড়িয়া। আমার ঘরের মানুষটাকে তুমি নিশ্চয়ই চিনবা। সে তো চাকুরিয়া মানুষ। আগে কলকাতায় থাকত।

ভবঘুরে দিগম্বরের কাউকে চেনার কথা নয় তবু সে চেনার মতো আন্তরিক গলা করে বলে, হ-হ, সে মানুষটাকে মুই চিনি। তাকে দেখচি। কেঁউটগেড়িয়ায় কত্তো বড় ঘর তার। কত্তো বড় মান তার। সে মানুষটার মুখে কেনে চুনকালি লেপবি? তু ঘুরোন যা। তুর সব দুখ মিটি যাবেক।

—সেখানে যেতে আমার ভয় লাগে। বিদ্যাধরী অসহায় চোখে তাকাল, আমি আর সেখানে যেতে চাই না। ওরা আমাকে ষড়যন্ত্র করে মেরে ফেলবে গো।

—তাহলি তুই যাবিটা কুথায়? দিগম্বরের চোখ অস্বস্তিতে লাল হয়ে উঠে। বিদ্যাধরী বলে, আমার পথ আমি ঠিক দেখে নেব। তোমার যেখানে যাওয়ার চলে যাও।

—তোকে একা ফেলে আমি যাব কী করে? দিগম্বরের কণ্ঠস্বরে দুর্বলতা প্রকাশ পায়। সে স্থির গাছের মতো দাঁড়ায়। অনেক ভেবে বলে, চল, তোকে মুই কেঁউটগেড়িয়ায় ছাড়ি আসি।

—না, সেখানে তুমি যাবে না। ওরা লোক খারাপ। বিদ্যাধরীব ঠোঁট কেঁপে ওঠে ঘন ঘন, ফিরে যাবার জন্য আমি তো ঘর ছেড়ে আসিনি। আমি মরব, আমি মরতে চাই।

কান্নায় ভেঙে পড়ে বিদ্যাধরী।

দিগম্বরের কী করণীয় বুঝতে পারে না। বাবুঘরের বউ বিদ্যাধরীর হাত ধরা তার পাপ। সে অচ্ছুৎ। গ্রামসমাজে তাদের কদর খোলামকুচিব সমান। এমত অবস্থায় সে পরেব ঘরের বউকে নিয়ে কোথায় যাবে? ছাউনিতে ফেরার মতো শক্তি বা সাহস তার নেই। বিদ্যাধরীর কাঁচা বয়স। শরীরের রঙে আগুন আছে। তাকে ছাউনিতে নিয়ে গেলে যে কোনও মুহূর্তে ঝড় উঠবে, উত্তাল হবে কাকমারা সমাজ। বিপন্ন হবে অস্তিত্ব। নিজেদের বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়া উচিত হবে না তার। বিদ্যাধরীকে তার শ্বশুরবাড়ি কেঁউটগেড়িয়ায় পৌঁছে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। অশান্তি তো রাত্রের অন্ধকারের মতো, তার আয়ু বড় কম। সাত-পাঁচ ভেবে দিগম্বর বলল, তুকে ছাড়ি যাই কেমুন কোরে। চ. তুকে তুর শ্বশুরঘর দিয়ে আসি।

## ।। নয়।।

এমন একটা পরীক্ষামূলক রাতের জন্য আদৌ তৈরী ছিল না দিগম্বর। বিদ্যাধরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাত্রির ভয়াবহতা আরও প্রকট হয়ে ধরা দিল তার কাছে। সোমত্ত একজন মেয়েমানুষকে নিয়ে সে যে কী করবে বুঝে পেল না। এরকম পরিস্থিতিতে সে এর আগে পড়েনি। এ এক কঠিন পরীক্ষা। দিগম্বর সমাধান সূত্র খুঁজে না পেয়ে বিড়ি ধরাল। রাতের বয়স বাড়ছিল। রাতপাখিরা উড়ে যাচ্ছিল খালের দিকে। রাতের ভয়াবহ নির্জনতায় ক্রমশ হাঁপিয়ে উঠছিল দিগম্বর। বিদ্যাধরী তাকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, তুমি চলে যাও। আমার জন্য ভেবো না। পৃথিবীর কেউ কোনদিন আমার জন্য ভাবেনি। আর আমি চাই না কেউ আমাকে নিয়ে ভাবুক।

বিদ্যাধরীর পূর্ব ইতিহাস সুখের নয়। বারাসাতে মামার বাড়িতে তার কৈশোর কেটেছে। মা চিরদিন ছিল মুখচোরা। মামীর অত্যাচারে তারা বারাসাত ছেড়ে চলে এল খিদিরপুরে বস্তিতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত তারা। একদিন পেটের দায়ে তার মা দেহকর্মী হয়ে গেল খিদিরপুরের বস্তি ছেড়ে তারা উঠে এল ট্রাম লাইনের ধারে কোঠাবাড়িতে। রোজ তিন চারজনের কাছে দেহদান করে তার ক্লান্ত মা একদিন যৌনাঙ্গের অসুখে হাসপাতালে মার গেল। তখন থেকে মুকুন্দর যাতায়াত বিদ্যাধরীর ঘরে। গা-গতরে তার তখন বেড়ে ওঠা বয়স। চোখে আগুনের ফুলকি। বিদ্যাধরী সাতঘাটের জল খেয়ে বুঝেছিল, এভাবে এ বড় জীবন পার হবার নয়। স্থিতু হতে না পারলে এ জীবনের কোনো মূল্য নেই। মুকুন্দ চোখে তখন বিদ্যাধরীর নেশা। কারখানা থেকে সে সোজা চলে আসত বিদ্যাধরীর ঘরে বিদ্যাধরী তাকে বাজিয়ে নিতে চাইল। সে কাঁদল না, নিজের দুঃখে ভেঙে পড়ল না বর গলায় দৃঢ়তা ফুটিয়ে বলল, আমাকে নিয়ে খেলা করবে তা হবে না। যদি আমাকে ভালবেসে থাক তাহলে আমাকে বিয়ে করে ঘরে তোলো। আমি সেদিন থেকে শুধু তোমার হবে নাহলে সবার।

কথাটায় বিষ ছিল, মুকুন্দর মন ভিজল। বিদ্যাধরীর হাত ধরে সে বলে যায়, তোমাকে বিয়ে করলে খাওয়াব-পরাব কী?

—তা যদি না পার তাহলে কাল থেকে আর এসো না। দেহ দেওয়া আমার ধর্ম নয় আর যদি ধর্ম হিসাবে মেনে নিই তাহলে যে আমাকে বেশি পয়সা দেবে আমি তার কাছে চলে যাব। কাল থেকে আমি আর তোমার অপেক্ষায় থাকব না। বিদ্যাধরীর কোমর দুলি চলে যাওয়া ভাল চোখে দেখেনি মুকুন্দ। সে তখন প্রেমের জোয়ারে ভাসছে। বিদ্যাধরী সিঁদুর কেন শরীরের রক্ত দিতেও পিছ পা হবে না। কথা হয়েছিল কালীঘাটে কারখান বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্যাধরীর ফাঁকা সিঁথি সিঁদুরে ভরিয়ে দেবে মুকুন্দ। কথার নড় করেনি সে। নির্দিষ্ট দিনে মা কালীকে সাক্ষী রেখে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। লাল শ পরে, নতুন সিঁথিতে সিঁদুর চিহ্ন এঁকে নিয়ে বিদ্যাধরী বলেছিল, আমি আর কোঠাবাড়ি ফিরব না। ওখানকার সব পাঠ আমি চুকিয়ে এসেছি। মামীর চিলনজর যেখানে যা না তুমি সেখানে আমাকে নিয়ে চল। আমি একবেলা খেয়ে থাকব তবু আর ওপথে হাঁ না।

ক'দিন কলকাতায় কাটিয়ে মুকুন্দর সঙ্গে কাঁথি ফেরার বাস ধরেছিল বিদ্যাধরী। মুকুন্দ তাকে বলেছিল, দেশে যা জমিজমা আছে তাতে আমাদের চলে যাবে।কলকাতায় এত অল্প টাকায় আমার দিন যাবে না। আমি ঠিক করেছি কারখানার চাকরি আর করব না। এবার থেকে গ্রামেই থাকব।

কত আশা আর স্বপ্ন নিয়ে বিদ্যাধরী জানলার পাশে বসেছিল সেদিন। দ্রুতগামী বাস কাঁথিতে পৌঁছে দিল তাদের। মুকুন্দ সেদিন তাকে গর্বভরে বলেছিল, এখানে এলে আমার আর কলকাতায় যেতে মন করে না। তুমিও কদিন থাকো, দেখবে তোমারও মন করবে না যেতে।

কেঁউটগেড়িয়ায় পৌঁছাতে সন্ধে হলো। গ্রামে ঢুকেই মুকুন্দর মুখের কথা ফুরিয়ে যায়। ঘরে পৌঁছাতেই তার মুখোশ খসে পড়ে বিদ্যাধরীর সামনে। মুকুন্দর প্রথমপক্ষ সাবিত্রী সব শুনে আছাড়-পাছাড় দিয়ে কাঁদল দোরগোড়ায়। বিদ্যাধরীকে শাপ-শাপান্ত করল মনের দুঃখ মেটাতে। মুকুন্দর বৃদ্ধা মা আপোষ করার জন্য এগিয়ে এল, বিদ্যাধরীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ঘরের ভেতর; বুঝিয়ে বলল, যা হয়ে গিয়েছে তা আর কোনদিনও স্বাভাবিক হবে না। তোমাদের দুজনকেই মানিয়ে নিতে হবে। সাবিত্রী তোমার দিদি, আজ থেকে তুমি তার বোন। দুজনেই মুকুন্দকে ভাগাভাগি করে নাও। দেখবে পাড়াগাঁয়ের লোক যেন না হাসে। লোক হাসাহাসি হলে তাতে তোমাদের কারোরই সম্মান বাড়বে না। শক্তি ক্ষয় না করে শক্তিকে ধরে রাখো। এতেই তোমাদের মঙ্গল।

মানিয়ে নেওয়া ছাড়া বিদ্যাধরীর ফিরে আসার কোনো পথ ছিল না। সাবিত্রীর হাত ধরে চোখের জল মুছে নিয়ে সে বলেছিল, দিদি, এই হতভাগীকে তুমি ছোট বোনের মতো মেনে নাও। আমি যত দিন বাঁচব তোমাকে দিদির সম্মান দিয়ে যাবো। মায়ের সামনে শপথ করে বলছি আমি কোনদিন তোমার সুখ ছিনিয়ে নেব না। তুমি জোর করে যেটুকু দেবে ঠিক ততটুকুই আমি খুশি মনে মেনে নেব।

—থাক আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না। গা ঝাড়া দিয়ে সাপের মতো মোড়া মেরে সাবিত্রী চলে গিয়েছিল তার নিঃশ্বাসের বাইরে। আপোষের কোনও নামগন্ধ ছিল না তার চড়া কথা-বার্তায়। সে তার দুই ছেলেকে নিয়ে সবসময় ছায়ার মতো ঘুরঘুর করত মুকুন্দর চারপাশে। বৃদ্ধা শাশুড়িও ক'দিন পরেই বিগড়ে গেল। সবার চোখের বালি হয়ে গেল বিদ্যাধরী। বছর না ঘুরতেই সে টের পেয়ে গেল এঘরে তার আর স্থান নেই। সাবিত্রী তার জায়গাটুকু কেড়ে নিয়েছে ধীরে ধীরে। হপ্তাভর দেখা হোত না মুকুন্দর সাথে। দেখা হলেও সে গুরুত্ব দিত না তাকে। এভাবে প্রেমের সম্পর্ক যে পান্‌সে হয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবেনি বিদ্যাধরী। তবু সে মাটি কামড়ে পড়েছিল। আপোষ করতে চাইত সবসময়। সাবিত্রীর রোষানল থেকে বাঁচতে পারল না। গ্রামের মানুষ কী ভাবে যেন জেনে গেল সে খিদিরপুরের খারাপ বস্তি থেকে উঠে এসেছে এখানে। নাক কুঁচকে মুকুন্দর মা বলল, কালা হাঁড়ি আমার ঘরে রাখব না। ও হাঁড়ি আমি ফেলে দেব বাঁশবনে।

বাঁশবনে নয় ঘরের ভেতরে হাঁড়ি ফাটাবার চেষ্টা করেছিল ওরা। একা বিদ্যাধরী ওদের সাথে পেরে উঠল না। প্রতিনিয়ত মার খেতে খেতে তার শরীর শুকিয়ে গেল; মনে শান্তি নেই, মানুষের ছায়া দেখলে আঁতকে ওঠে। হৃদয়ের জন্য সে তো এখানে ছুটে আসেনি।

সে চেয়েছিল তৃষিত হৃদয়ের জন্য অল্প একটু ভালবাসা। কী পেল আর কী পেল না এই হিসেব করার সময় তার ছিল না। তার আগেই সে টের পেয়ে গেল অনিবার্য মৃত্যু সংবাদ। ষড়যন্ত্র করছে সবাই। এখানে কেউ তার পক্ষে নেই। কোথায় যাবে সে, কোথা পালাবে? সব রাস্তা যার বন্ধ সে কোন পথ দিয়ে হাঁটবে? উদভ্রান্ত বিপর্যস্ত বিদ্যাধ চোখের সামনে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পায়নি। মৃত্যুর জন্য তিলে তিলে নিজে প্রস্তুত করেছিল সে হঠাৎ ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল—পালা বিদ্যাধরী, পালা এখানে থাকলে তুই মরে যাবি। এরা তোর ভাল চায় না যখন কেন তুই এদের ভালবাস ভিক্ষা করবি? ভিক্ষা করে ধন-দৌলত পাওয়া যায়, ভালবাসা পাওয়া যায় না।

সেই প্রথম বাঁচার জন্য ঢেউ উঠল বুকের ভেতর। ভগবানের দেওয়া এই জীবন হেলা হারাবে না। ঘব ছেড়ে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে নেমে আসল পথে। হাঁটতে হাঁট অন্ধকার নেমেছে, সব পথ ঢেকে গিয়েছে আঁধারে।

দিগম্বর অশিক্ষিত, আনপড় হলেও তার যে মন আছে, এটা টের পায় বিদ্যাধরী পর পুরুষের কাছে তার সংকোচের শেষ নেই। তবু সে মুখ ঘুরিয়ে নেয় অন্য দিকে নিস্তেজ স্বরে বলে, আমার জন্য ভেবো না গো। তুমি কাজের মানুষ, তুমি কেন আমা জন্য সময় নষ্ট করবে? রাত ফুরোলে আমি ঠিক বাস রাস্তায় পৌঁছাতে পারব। আ পথঘাট ঠিক চিনি না তবে যমের সদর দোরে যাবার রাস্তা আমার চেনা।

দিগম্বর চমকে উঠল কথা শুনে, ব্যথিত গলায় বলল, তু মরবি কেনে, তুর কী হয়েচে এত বড় দুনিয়ায় চরে খা মোদের মতন।

কী ভেবে বিদ্যাধরী বলল, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। কিসের জন্য বাঁচ বলতো? জ্ঞানপড়ার পর থেকে দুঃখ আমার পিছু ছাড়ল না!

—তুর ভোক লাগচে, তু মোর সাথে চ। দিগম্বরেব প্রস্তাবে বিদ্যাধরীর বুকের ভেত কাঁপন উঠল, সত্যিই তো দুদিন হলো তার পেটে একটা দানাও পড়েনি। আঁধারে মানুষ কি অন্তর্যামী? কী করে বুঝল তার ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা? সে তো একবারও ক্ষুধার্ত ব জাহির করেনি। বিদ্যাধরীর ঠোঁট নড়ে ওঠে, আমি যাব না। তুমি চলে যাও।

—তুই না গেলি পরে মুইও যাবানি। একা মায়ঝি তু, তোকে ফেলি মুই কুথায় যাব দিগম্বরের পীড়াপীড়িতে বিদ্যাধরীর মন ভিজল। আঁচলে মুখ ঘষটে নিয়ে সে শর্তসাপে কণ্ঠে বলল, আমি যাব কিন্তু তোমাদের ছাউনিতে থাকব। আমাকে তাড়িয়ে দিলে চল না। আমি তোমাদের দলের একজন হয়ে থাকতে চাই।

দিগম্বরের ঠোঁটে কোন উত্তর নেই। বিদ্যাধরী চড়া সুরে বলল, আমি জানতাম—কারে সাহস নেই আমাকে নিয়ে যাবার। তাছাড়া কুকুরের পেটে কি ঘি ভাত সহ্য হবে। ত চেয়ে আমি যেমন আছি থাকতে দাও, তুমি তোমার মতো চলে যাও।

দিগম্বরের জেদের কাছে, অন্তরের টানের কাছে হার মানল বিদ্যাধরী। সামনে দিগম্ব তার হাত পাঁচেক পিছনে মুখ ঝুঁকে আসা বিদ্যাধরী হাঁটছে, সে জানে না কোথায় গি ঠেকবে বানে ভাসা সবুজ পাতা!

ছাউনির ঘুমকাতর শরীরে দিগম্বর যখন নিঃশ্বাস ছাড়ল নিঃঝুম প্রকৃতিতে তখন জেগে আছে তারা, বাসি চাঁদ ম্লান বিধুর। পথ ক্লান্তির রেশ কাটিয়ে কিছুটা চাঙ্গা হব চেষ্টা করল দিগম্বর। বিদ্যাধরীর দিকে নিঃঝুম, নিস্তরঙ্গ দৃষ্টি মেলে সে ঢোক গিলল, ব

ালতে গিয়ে কথা বলার উদ্যম হারিয়ে ফেলল সে। এত রাতে পুরো ছাউনির মানুষকে াগিয়ে তোলা ঠিক নয়। দিগম্বর কী ভেবে ভিক্ষাম্বরের ছাউনির কাছে গিয়ে দাঁড়াল, নচু স্বরে ডাকল, বাপ, এ বাপ! বুড়ো মানুষটার ঘুম পাতলা, এক ডাকেই বিছানা ছেড়ে ড়ফড়িয়ে উঠে বসল ভিক্ষাম্বর, চোখে জল নিয়ে দিগম্বরকে দেখল, তারপর বিস্ময় ভরা ণ্ঠে শুধোল, কখুন এলি বেটা? ওদিককার খপর সব ভালা তো? দিগম্বর বলল, তুই এট্টুস বাইরে আয় বাপ। মোর সাথে মেহমান এসেচে।

—কে বটে সে? ভিক্ষাম্বর উৎসাহিত হল, ঝুঁকে দেখতে গিয়েই নজরে পড়ল দ্যাধরীকে। চোখের তারা কুঁকড়ে গেল তার। ভয়ের মেঘ বিছিয়ে গেল পুরো মনে। ন কিছু প্রশ্ন করার আগেই দিগম্বর বলল, মায়াঝিটার শ্বশুরঘর কেঁউটগেড়িয়ায়। সে শুরঘর ছাড়ি চালি আসলা। তার অনেক দুখ্-তকলিফ। সে আর শ্বশুরঘর যাবেকনি। ালমাঠে বসি বসি কাঁদছিলো। জান হারিই দিবে সে। তার দুখ্ শুনি মুই তাকে সাথে রি লিয়ে আসলাম।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ভিক্ষাম্বর বলল, কাজটা তু ভাল করলি লাই বেটা। বাবুঘরের মায়াঝি ন কাকমারাদের ছাউনিতে এলে তার যে জাত চালি যায়। গাঁ ঘরের কথা, দশকান হিলে বাই মোদের দুষবে।

—তাহলে অখন উপায়? দিগম্বরের মুখ ঝুলে পড়ল ভয়, উৎকণ্ঠায়। ভিক্ষাম্বর বিচক্ষণ ্যক্তি, বিদ্যাধরীর মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, মায়াঝিটার ভোক লাগচে। যা বেটা, বিন্দিয়ারে বল ওর জন্যি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করুক। তারপর দেখা যাক কী করা । দিগম্বর চলে যেতেই ভিক্ষাম্বর বিদ্যাধরীর দিকে নিবিষ্ট চোখে তাকাল; কন্যাস্নেহে ল, বিটিয়া, মানুষজেবন দুখ-তকলিফে ভরা। এ জেবনের কী দাম আচে বল?

বিদ্যাধরীর ঠোঁট কেঁপে উঠল, অশ্রুধারা অনর্গল গড়িয়ে পড়ল গাল বেয়ে। প্রশ্রয় য়ে সে বলল, আমি আর এ যন্ত্রণা সহ্য করতে পারছি না। শ্বশুরঘরে আমার জন্য লেখা নেই। আমি মরব, না হলে ভেসে যাব। কেউ আমাকে আর এ পৃথিবীতে ধরে াতে পারবে না।

—ভেসে যাওয়া সহজ কিন্তুক রুখে দাঁড়ানো কঠিন। যে মানুষটা রুখে দাঁড়ায় মো ারে সে তো আসলি মানুষ। ভিক্ষাম্বর ধীরে-সুস্থে বুঝিয়ে বলল কথাগুলো।

বিদ্যাধরী হতাশ চোখে তাকাল, মাজা ভেঙে গেলে মানুষ কি আর দাঁড়াতে পারে? মি তো মাটিতে মিশে গেছি। এবার পচে গলে সার হতে যা বাকি।

বিদ্যাধরীর ভাঙা মন জোড়া লাগাবার মন্ত্র ভিক্ষাম্বরের জানা ছিল না। তবে মেয়েটার স্ত কিছু শোনার পরে তার মনে সহানুভূতির বান ডেকেছে। কোনো কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়ার গে সে পীতাম্বরের সঙ্গে আলোচনা করে। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না।

পীতাম্বর সব শুনে বিষাদভরা গলায় বলল, পরের ঘরের বউকে ছাউনিতে ঠাঁই দেওয়া ক হবে না। আমে-দুধে মিলে গেল আঁটির কুনো ইজ্জোত থাকে না। মোর বিচারে য়াঝিটাকে তার শ্বশুরঘর পেঠিয়ে দেওয়া ভাল হবেক। তাছাড়া ঝগড়া-কাজিয়া তো মানুষ খানে সিখানে তো হবেকই। অপরের ঝগড়া-কাজিয়া নিজের ঘাড়ে চেপিয়ে লেওয়া উচিত য়।

—হ, তু যা কইচু দামী কথা। ভিক্ষাম্বর মাথা চুলকে ভাবল। বিন্দিয়া বলল, কাকা

ঠিক বলেচে। এ মায়াঝিকে ইখানে রাখা যাবেকনি। দশ লোক শুনলে মোদের দুষবে
এমনিতে মোদের শতেক দোষ।

বিদ্যাধরীর ঠাঁই হলো না ছাউনিতে। দিগম্বর সবার রায় মেনে নিল। সেও মনে-প্রা
চাইছিল বিদ্যাধরী ফিরে যাক। নিজের সংসারে সে সুখে-শান্তিতে থাকুক। অন্যের বো
তারা কেন বইতে যাবে। এমনিতে ভদ্রসমাজে তাদের অনেক বদনাম। সেই বদনাম
কবে ঘুচবে তা তারা জানে না।

বিদ্যাধরীর ফিরে যাবার মন নেই। খালপাড়ে উঠে এসে সে দিগম্বরকে বললো, তু
ফিরে যাও। আমার জন্য তোমার সারা রাত ঘুম হলো না। খুব কষ্ট হলো তোমার। আমা
মাফ করে দাও।

—এক রাত না ঘুমালে মোর কিছু হবেনি। দিগম্বরের ঠোঁটে সহানুভূতির ছোঁয়া, মে
বাপ বলেচে তুকে কেঁউটগোড়িয়ায় ছাড়ি আসতে, তার কতা মুই ফেলি পারবানি।
চল, তুকে কেঁউটগেড়িয়ায় ছাড়ি আসি। তারপর তু যেথা খুশি চালি যা। মুই তোকে বা
দিবানি।

—আমাকে বাঘের মুখে ঠেলে দিয়ে তোমার কি লাভ হবে? বিদ্যাধরী বুক ভাসি
কেঁদে উঠল। ভোরের ভেজা বাতাস বয়ে নিয়ে গেল তার কান্নার সুর। দিগম
কিংকর্তব্যবিমূঢ়। মেয়েমানুষের চোখের জল তার অন্তরকে কাদার চেয়েও নরম করে দে
সে তখন খুব অসহায় বোধ করে। বাপের কথার সে অবাধ্য হতে পারবে না। বিদ্যাধরী
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বলল, চল, আর দেরী করা ঠিক হবেক নাই। অখন ও আ
ফুটতে ঢের বাকি। মুই তোকে কেঁউটগেড়িয়ায় পৌঁচে দিযে চলে আসব।

সারাটা পথ ওদের মধ্যে কথা হয় না। একরকম বাধ্য হয়ে পথ হাঁটে বিদ্যাধরী
পুরুষজাতটাকে সে আর বিশ্বাস করতে চায় না। খোঁটা উপড়ান গোরুর যে স্বাধীন
আছে তার এখন নেই। মুকুন্দকে সে হাড়ে হাড়ে চিনেছে। যে তাব মৃত্যু কামনা না ক
জলপান করে না তার কাছে স্বেচ্ছায় ফিরে যাওয়ার অর্থ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া। ক
হল দিগম্বর দাঁড়িয়ে থাকবে গাছতলায়,বিদ্যাধরী একাই যাবে তার ঘরে। মুকুন্দ যদি তা
ঘরে না নেয় তাহলে সে আবার ফিরে আসবে। একজন শক্ত সমর্থ কাকমারার স
তার শ্বশুরবাড়িতে ফেবা উচিত হবে না। গ্রামসমাজ হয়ত এই ঘটনাটা নিয়েই জলঘো
করবে আরও বেশি কুৎসা, কলঙ্কের কালি ছুঁড়ে দেবে বিদ্যাধরীর গায়ে। সেখানে দিগম্বর
রক্ষা পাবে না।

সবে ঘুম ভেঙে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল মুকুন্দ। ঘুম চোখে সে বিদ্যাধরীকে
রাগে-ক্ষোভে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর, মাগী আবার ফিরে এসেছিস তুই? আমি
ভেবেছিলাম তুই মরেছিস, আমার হাড় জুড়োল।

বিদ্যাধরী কাতর হয়ে বলল, আমি তো মরতেই গিয়েছিলাম কিন্তু মরা যে আ
হলো না! মরতে গেলে যে পদে পদে বাধা তা আমি জানতাম না।

—ন্যাকামু করিস নে! যদি বাঁচতে চাস তো আমার চোখের সামনে থেকে এ
পালিয়ে যা। এখনও পাড়ার লোক জাগেনি। তুই পালিয়ে গেলে কেউ টের পাবে
আমি সবাইকে বলে দেব তুই ঘর ছেড়ে পালিয়েচিস।

মুকুন্দর কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে এল, যা চলে যা। নাহলে সকালবেলায় খুনখারাপি

যাবে।

—সেই ভাল, তুমি আমাকে মেরে ফেল। তুমি আমার হাত ধরে এ গাঁয়ে এনেছিলে। তুমিই তোমার হাত দিয়ে আমার গলা টিপে দাও। আমি তোমাকে বাধা দেব না। তোমার হাতে মরে আমি শান্তি পেতে চাই।

মুকুন্দ দাঁতমুখ বিকৃত করে বলল, আমি অত কাঁচাছেলে নই। খুন করে আমি জেলে গেলে তোর তো শান্তি হয়।

তার কথা শেষ হলো না ঘর থেকে আলুথালু চেহারায় ছুটে এল সাবিত্রী। বিদ্যাধরীকে দেখে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল সে, উঠোন থেকে ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে সে ছুটে গেল, আবার এসেছিস বেশ্যামাগী? আমার মানুষটার মাথা চিবিয়ে তোর বুঝি কলিজা ঠাণ্ডা হনি? যা আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যা, নাহলে কী ভাবে তোর মাথা থেকে বিষ নামাতে হয় তা আমি জানি।গাঁয়ের মানুষকে লাগবে না, আমি একাই ঝেঁটিয়ে বিষ নামিয়ে দেব।

জোর করার অভ্যাস বিদ্যাধরীর কোনকালেও ছিল না তবু নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য স শেষবারের মতো চেষ্টা করল, ছুটে গিয়ে পা জড়িয়ে ধরল সাবিত্রীর, দিদি, আমি তা তোমার ছোটবোনের মতো। আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিলে আমি কোথায় যাব বল তা? তোমরা ছাড়া আমার যে আর কেউ নেই। আমি তো ওর হাত ধরে এ গাঁয়ে বউ হয়ে এসেছি। ওর সিঁদুর এখনও আমার সিঁথিতে আছে।

—বেশ্যার সিঁদুরের আবার কী দাম? তোর বিষনজর থেকে আমি যে ওকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি তা শুধু সম্ভব হয়েছে আমার সতীত্বের জোরে। সাবিত্রী চুলের মুঠি ধরে বে সরিয়ে দিতে চায় বিদ্যাধরীকে কিন্তু পারে না, তখনই জ্বলে ওঠে তার ভেতর। নখের আঁচড়ে খামচে রক্তাক্ত করে দেয় বিদ্যাধরীর মুখ। চুলছিঁড়ে ক্রোধে উড়িয়ে দেয় বাতাসে। তবু মাটি কামড়ে পড়ে থাকে সে। বিদ্যাধরীর পতন জ্বালা ধরিয়ে দেয় মুকুন্দর মনে। স মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়ে বেড়া থেকে উপড়ে নেয় খুঁটি। তারপর গায়ের জোরে পেটাতে থাকে বিদ্যাধরীকে। প্রহারের শব্দ যন্ত্রণার আর্তিকে ছাপিয়ে যায়। গাছতলায় দাঁড়িয়ে সব দেখতে পায় দিগম্বর। তার চোখ ভরে ওঠে জলে, কী তার করণীয় কিছু বুঝতে পারে না।

বিদ্যাধরী যখন ফিরে এল তখন হাঁটা চলার ক্ষমতা নেই। দিগম্বর সেই রক্তাক্ত শরীরের দিকে তাকিয়ে ক্ষমতাভরা গলায় বলল, তু ঘুরোন চল। ইখানে তুর আর জায়গা হবেনি।

—কোথায় যাব আমি? বিদ্যাধরী অসহায় চোখে তাকাল, আমার তো যাওয়ার কোনো জায়গা নেই। কান্নায় ভেঙে পড়ার আগে সে দেখল দিগম্বরের হাত তার বিধ্বস্ত শরীরটাকে ভর করে দাঁড় করানোর চেষ্টায় মত্ত।

## ।। দশ।।

বিদ্যাধরীকে নিয়ে ছাউনিতে ফিরে এল দিগম্বর। সকালের নরম রোদে তখন সুখের চিহ্ন নেই। কোথাও কোনো অসুখ নেই, দুঃখ নেই সকালের আলো তা বলে দেয় জোর

গলায়। দিগম্বরের পাময় ধুলো, বিদ্যাধরীর শাড়িতে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। ঘেমে নেয়ে ওর যা চেহারার দশা হয়েছে তাতে ওর দিকে তাকাতে কষ্ট হলো দিগম্বরের। পুকুরপাড়ে উঠে এসে বুকে হাত চাপা দিয়ে বসে পড়ল বিদ্যাধরী। তার আর হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই শরীরের সব শক্তি সে বুঝি রেখে এসেছে শ্বশুরবাড়িতে। কেমন বিষণ্ণ চোখ মেলে সে দিগম্বরের দিকে তাকাল, কথা বলার ইচ্ছা হলো না, শুধু নির্নিমেষ চেয়ে থাকল।

গাঁ ঘুরতে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিল ভিক্ষাম্বর। দূর থেকে দিগম্বরকে দেখে লাঠিতে ভর দিয়ে এগিয়ে এল সে। বিদ্যাধরীর দিকে নজর পড়তেই অস্বস্তিতে তার বুকের ভেতরটা কেমন কুঁকড়ে গেল। দিগম্বরকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে শুধোল, ই ব্যাটা, মায়াঝিটারে আবার ঘুরোন আনলি কেনে?

দিগম্বর কী জবাব দেবে ভেবে পেল না।

ভিক্ষাম্বর অস্থির হয়ে উঠল, পরের ঘরের মায়াঝিকে ছাউনিতে জায়গা দেওয়া ঠিক লয়। মেয়েমানুষের জাত হলো গিয়ে আগুনের ঢিপি। কখন দাউ দাউ আগ জ্বলবেক কেউ টের পাবেকনি। তখুন সবাইকে পুড়তে হবেক।

বিমর্ষ দিগম্বর কোনমতে বলল, মোর কুনো উপায় ছিলো না বাপ। মায়াঝিটা মোর সাথে না আসলে ওর মরদটা ওকে জ্যাতা মারি ফেলতা। হা দেখ, উর গা-গতরে কেমন চাকড়া দাগ। ওরা একে বাঁচতি দেবেনি বাপ!

—সেটা তাদের জাত মামলা, তারা বুঝতা? ভিক্ষাম্বরের গলায় কাঠিন্য প্রকাশ পেল। আশাহত, ব্যথিত দিগম্বর বাপের মুখের উপর কোনো কথা বলল না। তার ভেতরটা জ্বালাপোড়া করছে। যে সমাজ একটা ভেসে যাওয়া মেয়েকে জায়গা দিতে পারে না তেমন সমাজের কী দাম? প্রতিবাদ টগবগিয়ে ওঠে দিগম্বরের বুকের ভেতরে। খুব অসহায় গলায় সে বলে, বাপ, মুই মানুষ। মানুষ হয়ে অবলা মায়ঝিটাকে কি করি ফেলি আসি দানোর মুখে? মুই পারিনি বাপ। তু মোকে মাফি দে।

ভিক্ষাম্বর কী বুঝল কে জানে, দাড়িভর্তি এবড়ো খেবড়ো গালে হাত বুলিয়ে সে দূর আকাশের দিকে তাকাল। ঝলমলে আকাশে সুখের চিল উড়ছে ডানা মেলে। পাতিকাকের দল মাঠ পেরিয়ে উড়ে যাচ্ছে দূরান্তে। এ হেন সুখেব সময় মাথা গরম করে কোন লাভ নেই। মানবিকতার খাতিরে দিগম্বব যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাকে সে অশ্রদ্ধা করতে পারে না। সে নিজে হলেও তো এই একই সিদ্ধান্ত নিত। তার রক্ত যার শরীরে বইছে তাকে সে শাসন করবে কী ভাবে? দিগম্বরের চরিত্রের সততা নিয়ে ভিক্ষাম্বরের মনে কোনো প্রশ্ন নেই। দলের মধ্যে দিগম্বরই ধোয়া তুলসীপাতা। মেয়েছেলে নিয়ে তার কোনো দুর্বলতা চোখে পড়েনি ভিক্ষাম্বরের। যমুনাবতীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে সে তো ভিক্ষাম্বরের পছন্দানুসারে। সেখানে জোর জবরদোস্তির কোনো টালবাহানা ছিল না। ছেলেব মুখের দিকে তাকিয়ে ভিক্ষাম্বরের মুখ শুকিয়ে যায়, কপালে অবাঞ্ছিত ভাঁজ পড়ে, দুঃশ্চিন্তায় গলা কেঁপে ওঠে তার, বেটারে, কাজটা মনে হয় ভালা হলোনি। পরের ঘরের মায়াঝি কি মোর ছাউনিতে মানিয়ে লিতে পারবেক? ওর গায়ে তো বাবুঘারাণার ছায়া!

দিগম্বর অসহায় স্বরে বলল, মানুষের বিপদে মানুষই তো পাশে দেঁড়ায় বাপ।

—তাহলে ও থাকুক।

—হ থাকুক। দিগম্বরের কণ্ঠস্বরে ঋজুতা প্রকাশ পায়।

বিন্দিয়া এল হাসি মুখে, তার পেছনে মন্থরাবুড়ি। বিদ্যাধরীর শোচনীয় দশা দেখে বিন্দিয়ার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। মন্থরাবুড়ি গিয়ে বসল বিদ্যাধরীর পাশে। নম্র গলায় ডাকল, এ বেটি, মুখ তুল। চ। যা হয়েচে সব ভুলে যা বেটি। ইখানে হাস, খেল্।

বহু কষ্টে চোখ মেলে তাকাল বিদ্যাধরী, ওর সজল চোখে ভাষার কোনো ফোয়ারা নেই। বিন্দিয়া হাত ধরে উঠাল বিদাধরীকে, চ মোর সাথে চ। আচ থিকে তু মোর সাথে শুবু, থাকবু। তুর মতুন ভাগ্য লিয়ে মুইও এ দুনিয়ায় আসচি। মোকে দেখ, অখন কেউ মোকে দেখে বুঝবেনি মোর ভিতরে অতো কষ্ট আচে।

সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে বিদ্যাধরীর দম বন্ধ হয়ে আসে, সামনে ঘোরাফেরা মানুষগুলোর কোনো স্বাভাবিকত্ব তার নজরে পড়ে না। জলে যেমন মাছ স্বচ্ছন্দ, এরাও তেমন এখানে। বটতলার কাছ থেকে রোগা শুয়োরটার চিৎকার ভেসে আসছে। লেজ কাটা কুকুরটা মুখ নামিয়ে নিয়েছে মাটির দিকে। চারপেয়ে জন্তুটা কী ভাবে যেন বুঝে গিয়েছে এই মেয়েটাকে দেখে ডাকতে নেই।

ছাউনিতে তোলপাড় শুরু হয়েছে বিদ্যাধরী আসার পর থেকে। ঝুমরির মুখে রা নেই। শুধু মন্থরাবুড়ি আর বিন্দিয়া ঘাড় নীচু করে বসে আছে বিদ্যাধরীব পাশে। ভিক্ষাম্বরের নির্দেশে দিগম্বর গিয়ে ডেকে আনল পীতাম্বর, হরিহরণ আর দলের সবাইকে। ওরাও গোল হয়ে বসেছে বিদ্যাধরীকে ঘিরে।

সবার আগে ভিক্ষাম্বর শুধোল, এ বিটিয়া, তুর মনে কুনো দুখ্ থাকলে বল? মোদের এই সমাজটাকে তু তো লিজের চোখে দেখচিস। ঝড়-ঝাপটা যা আসবেক সব তুকে হাসি মুখে সইতে হবেক। তুর কী মত স্পষ্টাস্পষ্টি ক?

কথা বলার মতো ক্ষমতা বিদ্যাধরীর ছিল না, নীরবে সে শুধু সম্মতি জানিয়ে ঘাড় কাৎ করল। পীতাম্বব কম কথার মানুষ। যখন যা বলে মেপে বলা তার স্বভাব। সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। গলা খেঁকাবি দিয়ে বলল, তুব দুখ তকলিফে মোরা তুঁকে সাথ দিব। থানা পুলিশ হতে তু মোদের সাথ দিস। তখন মোদের নামে ঝুটা কথা বলবি না। তাহলে মোদের সর্বনাশ হয়ে যাবেক।

এবারও বিদ্যাধরীর সেই নীবব জবাব। দিগম্বর খুশি হল। ভিক্ষাম্বর ছেলের হাত ধরে ভাঙা গলায় বললো, বেটা, তু মায়াঝিটাকে লিয়ে ছাউনি ছেড়ে ক'দিন পেলিয়ে যা। বেটিয়া ইখানে থাকলি পরে ঝুট-ঝামেলা বাড়তে পারে। তুরা ইখন নজবের বাইরে চলে যা। দশ-গাঁ ঠাণ্ডা হলে পরে তুর সাথে দিখা হবেক।

দিগম্বরের মুখ কালো হয়ে এল, বিন্দিয়া তাকে বুঝিয়ে বলল, এ দাদা, মনে দুখ লিবিনে। বাবু মানুষের মন ভালা নয়। ওরা বউকে খেতে দিবেনি, পিটবে—তবু বউ ওদের বেজাতের ঘরে চলে গেলে ওদের মাথায় বিষ ভোমরা কেমড়ে দেয়। তখন যত দোষ ঐ কাকমারাদের! তাই বলচি কী, তুর ইখানে থাকা লিরাপদ লয়। ক'দিন লজরের বাহারে চলে যা। কাদা জল থিতিয়ে গেলে ফির ফিরে আসবি।

ঠিক হলো রাত নামলে দিগম্বর বিদ্যাধরীকে নিয়ে মেঠোপথ ধরে চলে যাবে। ভবানীচকের ছাউনিতে যমুনাবতী একা আছে। সেখানে অসুস্থ বউটার দেখভাল করবে বিদ্যাধরী। রাঁধাবাড়া এমন কী তার কাপড়ও কাচতে হবে তাকে। বিদ্যাধরীর এসবে কোনো ঘেন্না বা অরুচি নেই। সৎভাবে বেঁচে থাকার জন্য এগুলো কোনো কাজের মধ্যেই পড়ে

না।

যাওয়ার ঠিক ঘণ্টা দেড়েক আগে মন্থরাবুড়ি এসে বিদ্যাধরীকে নিয়ে গেল বটতলায়। আগে থেকে সেখানে অপেক্ষায় ছিল বিন্দিয়া আর ঝুমরি। জড়ো করা পাতার আগুন ধরিয়ে দিল বিন্দিয়া। ঝুমরি এগিয়ে গিয়ে বিদ্যাধরীর হাত ধরল। সস্নেহে বলল, লুগাটা বদলে লে। গড়িয়ায় ডুব দিয়ে আয়। ডুব দেওয়ার আগে এই হলদি-তেল মেখে লে জবজবিয়ে। তুর পুরনো পাপ ধুয়ে যাক।

বিদ্যাধরীর প্রশ্ন বোঝাই চোখ। খরাবেলায় সে ভাল করে স্নান করেছে পুকুরে। এই ভর সন্ধ্যায় আবার হলুদ-তেল মেখে স্নান করার কোনো অর্থই তার মাথায় ঢোকে না। তবু ওদের আব্দার, অনুরোধ তাকে মেনে নিতে হয়। যে সমাজের যা রেওয়াজ।

ভরা পুকুরে ডুব দিয়ে এসে বিদ্যাধরী লাজুকলতা শরীর নিয়ে দাঁড়াল। চোখে মুখে টান টান উত্তেজনা। যথাসম্ভব নিজেকে সে সামাল দেবার চেষ্টা করছে।

ভেজা শাড়ি বদলে নেবার জন্য বিন্দিয়া তার দিকে একটা কাচা শাড়ি এগিয়ে দিল, জোড়া ঠোঁটে হাসির ফুলঝুরি ফুটে উঠল পলকে, মোর শাড়িটা তু পিন্‌ধে লে। যা বটগাছটার আড়ালে চলে যা।

মন্থরাবুড়ি পাতার আগুন উসকে দিল, সতর্ক গলায় বললো, মোটে দেরী করবিনি ঝটপট যা।

এত ব্যস্ততার কোন কারণ অনুমান করতে পারল না বিদ্যাধরী। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল তার। শুকনো শাড়িটা হাতে নিয়ে সে চলে গেল বটগাছটাব পেছনে। শাড়ি বদলে মন্থরাবুড়ির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। মুখে কোন কথা নেই। ঘাসের দিকে নামানো মুখ ভেজা মুখে স্নিগ্ধ করুণ ছায়া।

শুকনো পাতা পড়পড় শব্দে পোড়ে। বিন্দিয়াব চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে খুশির আভা আড়চোখে সে মন্থরাবুড়িকে দেখে।

কিছু একটা যে ঘটতে চলেছে অনুমান করে নেয় বিদ্যাধরী। ভয়ে তার গলা শুকিয়ে যায়, শুকনো ঢোক গিলে সে চেয়ে থাকে উদগত আগুনেব দিকে।

মন্থরাবুড়ি খনখনে গলায় বলে, ইধাব পানে সরে আয় বিটি। কথা শুনে বিদ্যাধরীর পা ঠকঠক করে কেঁপে ওঠে। ঘন ঘন ঢোক গিলে মন্থরাবুড়ি ঈষৎ বিবক্ত হয় তার নীরবতায়, কী কথা বুঝি কানে ঢুকে না? আয়, আয় বলচি।

বাধ্য হয়ে কাঁপা কাঁপা পায়ে এগিয়ে যায় বিদ্যাধরী। বিন্দিয়া এগিয়ে গিয়ে হাত চেপে ধরে বিদ্যাধরীর, মৃদু চাপ দিয়ে বলে, ডরলে চলবেকনি। তুর মতুন মায়াঝি দলে রইলে যে কুনো সময় বিপদ আসতে পারে। তু যদি ভেগে যাস তার লাগি তোরে দাগা দেওয় হিবে। হা দেখ, লোহার চাকু পুড়চে পাতার আগুনে। কাঁপা কাঁপা চোখে বিদ্যাধরী তাকাল একটা বাঁট ছাড়া চাকু পাতার আগুনে পাকা তেলাকচুর রঙ ধারণ করেছে। মন্থরাবুড়ি চার-পাঁচটা বটের কাঁচা পাতায় বাঁটহীন চাকুটাকে শক্ত হাতে চেপে ধরে। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় বিদ্যাধরীর দিকে। অনমনীয় স্বরে বলে, মোটে ভয় পাবিনে, চক্ষু মুঁদ মুই তুর চিবুকে চাকু ঠেকিইবা।

ভয়ে চোখ বন্ধ হয়ে এল বিদ্যাধরীর। ভেজা নরম শরীর নিমেষে শুকনো কাঠের মতো দৃঢ় হয়। মন্থরাবুড়ি কাঁপা পায়ে এগোয়। তাতানো চাকুটা আলতো ছুঁইয়ে দেয় বিদ্যাধরীর চিবুকে: অতর্কিত যন্ত্রনায় চোখ-মুখ বেঁকে যায় বিদ্যাধরীর। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে হজম করার চেষ্টা করে যন্ত্রণা। পারে না। টপটপ করে খসে পড়ে চোখের জল।

বিন্দিয়া তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। মমতাভরা গলায় বলে, ভয় পাসনি এ বাবুঘরের বউ। দাগা না দিলে তু যে মোদের দলে এলি তা বোঝা যাবেক না। ইবার তু পেলিয়ে গেলেও লোক জানবে তু মোদের ঘরের মায়াঝি।

সন্ধ্যার পরে গাঢ় হয়ে আসে চারপাশ। গুমোট ভাব সর্বত্র। নিরুদ্দেশ হল দলছুট হাওয়া। দু-একটা তারা দেখা যায় আকাশে। চিবুকে ফোসকা নিয়ে বিদ্যাধরী তবু অপেক্ষায় থাকে দিগম্বরের। আজ রাতের মধ্যে তারা এই জায়গা ছেড়ে পালাবে। পোড়া মাংসের চারপাশ থেকে উঠে আসছিল বেদনা। বিন্দিয়া কী সব পাতা ছেঁচে লাগিয়ে দিয়েছে পোড়া জায়গায়। বিদ্যাধরীর হাত ধরে সে বললো, মোর দাদার মতুন মানুষ আর পাবি না। ও তুর গায়ে আর কারোর আঁচড় লাগতে দিবেনি। তু বাঁচি গেলি।

সব কথা কানে আসছিল বিদ্যাধরীর। তবু সে নিরুত্তর। পায়ের বুড়ো আঙুলে মাটি চেপে দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ। বুকের ভেতর ঢেউ উঠেছে তোলপাড়। কাঁচা রক্তে জোয়ার আসা উত্তেজনা। তার বোবা চোখ দুটো দিগম্বরকে খুঁজছিল।

দিগম্বর এল কিছু পরে। বিন্দিয়া বিদ্যাধরীর হাতটা ধরে জোর করে নিয়ে গেল দিগম্বরের কাছে। দু-হাত এক করে দিয়ে বললো, যা, চালি যা। যেদিকে চোখ যায়, পেলিয়ে যা। রাম-সীতা তুদের দেখবে।

## ।। এগার।।

যার কপালে সুখ নেই সে সুখের দেখা পাবে কী করে?

দু'হপ্তার উপর হলো তবু চোখের জল শুকাল না বিদ্যাধরীর। পুকুরপাড়ে কলাঝাড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে আনমনে সে কাঁদে। যমুনাবতীর কথাগুলো তার মোটেও সহ্য হয় না। উঠতে-বসতে মুখ ঝামটায় যমুনাবতী। চোখ নাচিয়ে বলে, তু কেনে ইখানে এলি হ্যারে বেবুশ্যে? তুর কি ডুবে মরতে জল জুটলানি? মোর ভাতারটা শেষতক তুর নজরে ধরল?

এরকম হাজার প্রশ্ন রোজ ছুঁড়ে দেয় যমুনাবতী। রাগে গর্জায় খোঁচা খাওয়া সাপিনীর মতো। রোজই মুখ বুজে থাকতে হয় বিদ্যাধরীকে। সে জানে—বোবার শত্রু নেই। কিন্তু এই সহজ সত্য যে তার জীবনে মিলছে না। তবে কি তার জীবন অন্য সকলের চাইতে আলাদা।

কলাঝাড়ের পিছনে দাঁড়ালে বাতাস ফিসফিসিয়ে কত কথা বলে যায়। সব কথার অর্থ বোঝে না সে। শুধু চোখ দুটো জলে ভরে উঠলে তখন মায়ের কথা খুব মনে পড়ে তার। মা চেয়েছিল সে বড় হোক বাবু ভদ্রলোকের মেয়েগুলোর মত, তার জীবন সিধা দেবদারু গাছের মত বেড়ে উঠুক সুন্দর ভাবে। বিদ্যাধরীও মনে মনে এসব স্বপ্ন দেখত।

মুকুন্দ তার সব স্বপ্ন ছিঁড়েখুঁড়ে ধুলোয় মিশিয়ে দিল। মিথ্যার নৌকোতে চাপিয়ে সে তাকে জীবনের সমুদ্র পার করিয়ে দেবে বলেছিল। একদম গলা জলে নৌকো ডুবিয়ে পালিয়ে গেল মুকুন্দ। দিগম্বরের হাত সে ধরতে চায়নি, অথচ ভাগ্য তাকে টেনে আনল এখানে। এখানেও যে সুখের স্পর্শ পাবে তেমন কোনো পূর্বাভাস নেই। যমুনাবতীর মুখভার করা কথা গায়ে বড্ড জ্বালা ধরায়। দুটো ভাতের জন্য এত কথা কোনো মানুষই বুঝি সহ্য করতে পারবে না।

চোখের জল মুছে নিয়ে বিদ্যাধরী নেমে এল পুকুরঘাটে। শরীরের তাপ জ্বালা পুকুরের জলে না জুড়োলে নিস্তার নেই। যা গুমসা গরম শরীরে এখন কাপড় রাখা দায়। চুলার সামনে রাঁধতে বসলে কুলকুল করে ঘাম বেরয়। যমুনাবতী দূর থেকে দেখে তার রূপ রঙ্গ। মরমে জ্বলে পুড়ে মরে সে। হিংসা উথলে ওঠে মনে। দিগম্বরকে প্রায় সময় সে বলে, ও মাগীকে ভাগাও। ও ডাইন। মোর সনসার জ্বালিই পুড়ি খাক করি দিবে। দিগম্বর তাকে চুপ করতে বললেও সে থামবে না। তার অনর্গল কথার স্রোত যেন জ্বালামুখী থেকে ছিটকে আসা তপ্ত লাভা।

আজও রাঁধতে বসে চুলার সামনে চুপ করে ওদের কথা শুনছিল বিদ্যাধরী, দিগম্বর গাঁ থেকে ফিরেছে। খিদেয় তার পেট জ্বলছিল। বিদ্যাধরীর কাছে এক গ্লাস জল চাইতেই ফুঁসে উঠল যমুনাবতী. কেনে মুই কি মরি গেচি? মোকে কি চক্ষে দেখা যায় না? গুটে গিলাস জল মুই দিলে কি মোর হাত ক্ষয়ি যাবে?

দিগম্বর গাঁ ঘুরে এলে ঝগড়াকাজিয়া পছন্দ করে না। যমুনাবতী তার এই নীরবতার সুযোগ নিল। নাভির কাছে আঁচলের খুঁট গুঁজে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, মুই অখন পচি গেচি! বাবুঘরের নাঙ পেয়ে ভাতার মোকে ভুলি গেচে।

—তু চুপ যা। দিগম্বর ফুঁসে উঠতে গিয়েও পারে না, ভোকে মোর পেট জ্বলচে। অখন টুকে চুপ যা।

—কেনে চুপ যাবা, কার ভয়ে চুপ যাবা। মুই বাঁচি থাকতে এসব রাঢুয়া বিদ্যা চলবেকনি। যমুনাবতী গলা চড়াল বাতাসে। হাতের কাছে যা কিছু পেল ছুঁড়ে মারল উঠোনে। তাতেও শান্ত হলো না তার রাগের পারদ। বিদ্যাধরী বাহির চুলায় শুকনো কাঠ ঠেলে দিয়ে ভাত ফোটাচ্ছিল। যমুনাবতীর নজর পড়ল সেখানে। নিজের আজন্ম অধিকার সে কেন অন্যের হাতে ছেড়ে দেবে? শরীর খারাপের অজুহাতে সে কেন হেঁসেল ঠেলতে দেবে অন্যকে? রাগে ক্ষোভে ঝিনঝিন করে তার গা-গতর। কপালের ঘাম ঠোঁটের কাছে পড়তেই রি-রি করে জ্বলে ওঠে সর্বাঙ্গ। সে লাফ দিয়ে নেমে আসে দাওয়ায়। দাওয় থেকে ছুটে যায় চুলার কাছে। ঠেলা মেরে সরিয়ে দিতে চায় বিদ্যাধরীকে, যা সর। খবরদার মোর ভাতের হাঁড়ি ছুঁবুনি। যদি ভাতের হাঁড়ি ছুঁবু তো তুর হাত দুটা আমি ভাঙ্গি দিব আচ ভাতের হাঁড়ি লিবু, কাল মোর ভাতারকে লিবু তা মুই হতে দিবানি। বিদ্যাধরী কিংকর্তব্যবিমূঢ়। চোখের পাতা পড়ে না, ঠায় বসে থাকে চুলার এক পাশে। অত্যন্ত নিস্পৃহ তার দৃষ্টি। এই মৌন নিস্পৃহতা যমুনাবতীকে হিংস্র বাঘিনীর চেয়েও ভয়ঙ্করী করে তোলে ঝটকা দিয়ে যমুনাবতী চুলার এক পাশে সরিয়ে দেয় বিদ্যাধরীকে। হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে যায় বিদ্যাধরীর দিকে। ওকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে চেপে বসে বুকের উপর। বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় বিদ্যাধরী। শুকনো খটখটে উঠোনের মাটি জড়িয়ে যায় তার ঘর্মাক্ত

পিঠে। কঁকিয়ে ওঠে সে, আর্তনাদ ভাসায় বাতাসে, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও গো।

যমুনাবতী চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকায়, চুল ছিঁড়ে তুর হাতে দিব। তু মোর নিদ কাড়চু, সুখ কাড়চু—তোকে মুই ছাড়বা না। দিগম্বর বিপদের গন্ধ বুঝে লাফ দিয়ে নেমে আসে উঠোনে, বিদ্যাধরীকে মুক্ত করতে চায় সে। পারে না। যমুনাবতীর কঠিন হাত দুটো বিদ্যাধরীর চুলের শেকড় উপড়ে ফেলতে বদ্ধ পরিকর। বেগতিক দেখে যমুনাবতীর চুলে হাত দেয় দিগম্বর, সক্রোধে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলে, ছাড়ি দে, ছাড়ি দে। নাহিলে তুর চুলের গোড়া উপড়ে নিব।

যন্ত্রনায় শিথিল হয়ে আসে যমুনাবতীর হাতের মুঠি, বিদ্যাধরীর চুলের গোছ আলগা করে সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। পা দিয়ে উল্টে দেয় ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ি। ফোটা ভাত গড়িয়ে যায় উঠোনে। ধোঁয়া ওঠা ধুলো মাখামাখি ভাতের দিকে তাকিয়ে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারে না দিগম্বর। চ্যালা কাঠ তুলে নেয় ক্রোধে। এলোপাথাড়ি মারতে থাকে যমুনাবতীর রুগ্ন-শীর্ণ দেহে।

আবার কঁকিয়ে কেঁদে ওঠে বিদ্যাধরী। ছুটে গিয়ে কেড়ে নেয় দিগম্বরের হাতের শুকনো কাঠ। চোখ-মুখ শক্ত করে বলে, তুমি যে ভাবে ওকে মারছ, ওভাবে কেউ গোরুকেও মারে না। এত দিন আমি জানতাম তুমি মানুষ, এখন দেখছি তুমিও পশুর চাইতে কম কিছু নয়।

বিদ্যাধরীর শরীর বেয়ে গড়িয়ে নামে ক্রোধের ঢল। যমুনাবতীর হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে যায় উঠোনের একপ্রান্তে। হতচকিত দিগম্বর বিদ্যাধরীর কাছ থেকে এমন ব্যবহার আশা করেনি। বিদ্যাধরী যমুনাবতীর গায়ে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, কেঁদো না, চুপ করো। আমি তোমার সুখ ছিনিয়ে নিতে এখানে আসিনি। বানের জলে ভেসে যাওয়া পাতার কোনো জোর থাকে না। আমি সেই পাতার চেয়েও অসহায়। তোমার স্বামী যদি আমাকে আশ্রয় না দিত তাহলে আজ হয়ত পচে-গলে সার হয়ে যেত আমার এই দেহ। ভগবান আমার কপালে সুখ লেখেনি। জ্ঞানপড়ার পর থেকেই দুঃখে আমার জীবন কাটছে। মাকে চোখের সামনে কষ্ট পেয়ে মরতে দেখেছি। স্বামীসুখও আমার কপালে জুটল না। তোমার সুখের সংসার আমি কেড়ে নিতে আসিনি—দিদি। আমি বাঁচতে চেয়েছি, সেইজন্য তোমার এখানে ঠাঁই নিয়েছি। ভগবানের দিব্যি, এছাড়া আমার মনে আর কোনো কু-চিন্তা নেই।

এত কথা শোনবার পরেও যমুনাবতীর মুখে কোন রা নেই। তার উদোম পিঠে চ্যালাকাঠের আঘাত হেলে সাপের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বিদ্যাধরীর অন্তর নিঃসৃত কথাগুলো তার কাছে অভিনয় মনে হয়। বাবুঘরের মেয়েরা কথায় পটু। স্বামীর ঘর ছেড়ে যে মেয়ে অন্যের ঘরে আশ্রয় নেয় সে যে দুঃখী এ বিষয়ে যমুনাবতীর কোন দ্বিধা নেই। তার শুধু একটাই চিন্তা পুরো পৃথিবী পড়ে থাকতে বিদ্যাধরী কেন তার সংসারে এসে আশ্রয় নিল। এসব হলো কপাল পোড়ার আগাম সংকেত। কাঁদব না বলেও না কেঁদে সে থাকতে পারে না। অভিমানের বাষ্প এসে জড়ো হয় দু-চোখের কোনে, ঠোঁটও অবাধ্য হয়ে ওঠে, ঠোঁটের অস্থির কাঁপুনি বুকের ভেতরে এসে ঝড় তোলে। এ সমাজে পুরুষ-নারীর কারোরই বহু বিবাহে বাধা নেই। আর বাধা থাকলেও সেই ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র অনুশাসনকে অনেকেই বুড়ো আঙুল দেখায়। সে রোগ জ্বালায় কাহিল হবার পর থেকে দিগম্বর শারীরিক

সুখ পায়নি। মন তার তিরিক্ষি হয়ে আছে। ঠিক এরকম একটা কঠিন সময়ে আগুন আর ঘি পাশাপাশি থাকা শুভ নয়। পথের কাঁটা যত তাড়াতাড়ি সরিয়ে দেওয়াই ভাল। নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে অন্যের পা'কে মজবুত করার বোকামী সে করবে না। ফলে বিদ্যাধরীর দিকে তাকিয়ে তার প্রতি সহানুভূতি না জানিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল যমুনাবতী। রাগে তার দেহ ফুটছে। আজ মন ঘুরিয়ে দিয়েছে বিপথে। রূপের আঠায় মানুষটার মাথা ঘুরে গিয়েছে। ঘরের বউয়ের উপর তার আর কোন নজর নেই। এত অবহেলা নিয়ে যমুনাবতী বাঁচবে কী ভাবে? তার অসুখ আরও বাড়বে, সে আরও বুড়িয়ে যাবে, ভেঙ্গে পড়বে, ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। তাই প্রথম থেকেই সাবধান হওয়ার দরকার। সাপের বিষদাঁত ভেঙে দেবে সে। দরকার হলে সাপকে খতম করে দেবে সে। সেও পোড়াখাওয়া মাঠচরানো মেয়েমানুষ। সাপকে কী ভাবে খেলাতে হয় সে জানে। বিকালের ম্লান আলোয় বিদ্যাধরীর মুখখানা ঘোলাটে চাঁদের মতো দেখায়। নিজেকে নিয়ে তার আর এখন কোন স্বপ্ন দেখা নেই। আগত দিনগুলো কোনভাবে কেটে গেলে সে যেন বেঁচে যায়। দিগম্বর না খেয়েই চলে গিয়েছে কোথায়। আজ সে নিশ্চয়ই নেশা করে ঘরে ফিরবে। যমুনাবতীর শরীর ভাল থাকলে ভাত পচিয়ে হাঁড়িয়া বানায় ঘরে। তখন ওরা দুটিতে মিলে হাঁড়িয়া খায়, সুখ-দুঃখের গল্প করে, গান গায়। তখন সেই সুখের দৃশ্য দেখে ভীষণ মন খারাপ করে বিদ্যাধরীর, নিজের ঘরের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে মুকুন্দর প্রথম দিককার আবেগঘন চাহনি। সে যে তার শরীরের নেশায় মজেছিল তার ঐ কুতকুতে প্রেমকাতর চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে অনুমান করতে পারত সে। ভাল লাগত ভীষণ। একটা মানুষ তার জন্য পাগল এই ভাবনায় বুঁদ হয়ে থাকত সে। জীবনে স্বপ্ন দেখার বুঝি শেষ নেই। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় তা আগাম কেউ বলতে পারে না। মাজা জলে নেমে বিদ্যাধরী নিজের আলুথালু শরীরটার দিকে তাকায়। দুঃখ-বেদনা ঠেলে ওঠে মনের কিনারায়। মুকুন্দকে সে কি কোন দিন ক্ষমা করতে পারবে? একটা জীবন শেষ হয়ে যাবার জন্য সে-ই তো একমাত্র দায়ী।

পুকুরে ডুব দিয়ে ভেজা কাপড়ে পাড়ে উঠে আসে বিদ্যাধরী। ভ্যালভেলিয়ে তাকায় কিন্তু আশেপাশে কাউকে দেখতে পায় না। রোজই সে ভাবে তার শ্বশুরঘর থেকে কেউ আসবে তাকে ফিরিয়ে নিতে। মুকুন্দ নত মুখে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলবে, ঘর চলো। ঝগড়াঝাটি, অশান্তি কোন সংসারে না হয়ে থাকে। এই কথা কটা দিনের মধ্যে হাজারবার তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খায়। হাঁপিয়ে ওঠে সে। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায় সে।

রাতের বেলায় চাঁদ উঠে আসে আকাশে। বিদ্যাধরীর মন ভাল ছিল না বলেই তাকিয়েছিল শূন্য মাঠের দিকে। দিগম্বর ফিরে আসেনি তখনও যমুনাবতী তার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে হাঁড়িমুখ নিয়ে বসে আছে। ওর কাছে যাওয়ার সাহস নেই বিদ্যাধরীর। অগ্নিকুণ্ডের কাছে সে কেন যাবে আগ বাড়িয়ে?

অনেক রাতে দিগম্বর যখন ফিরে এল তখনও জেগে ছিল বিদ্যাধরী। সে এসে যমুনাবতীর কাছে গেল না, ভীতু পায়ে বিদ্যাধরীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, তুকে দুটা কথা কইতি, মন দিই কী শুন?

—কী কথা? ধড়ফড়িয়ে তালাইয়ের উপর উঠে বসল বিদ্যাধরী, বলো কী বলতে

চাও? তার বিস্ফারিত চোখে-মুখে উপচে পড়া বিস্ময়।

—আচ তাজপুর হাটে দুটা লোকের সাথে দিখা হিলা। হঠাৎ কথা থামিয়ে বিদ্যাধরীব চোখের দিকে তাকাল দিগম্বর, ভয়ে গলা কেঁপে উঠল তার, লোক দুটার ঘর কেঁউটগেড়িয়ায়। তারা তুর খুঁজ করছিল। মুই সব শুনি পালিই আসলি।

বিদ্যাধরীর বুকের ভেতরে কেউ বুঝি হাতুড়ির ঘা দিল, তারা কি তোমাকে চিনতে পেরেছে?

—না, চিনবে কী করি। দিগম্বর আলতো হেসে উঠতে চাইলেও পরিপূর্ণ ভাবে তা পারল না, মুই মুখ ঘুরিই চালি আসলি। সেই থিকে মোর চোর মনে সুখ লাই। ওরা যদি তুকে লিয়ে যায়?

বিদ্যাধরী চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ, দিগম্বরের কপালে ভাঁজ পড়েছে দুঃশ্চিন্তার, মাথায় হাত দিয়ে সে বসেছে বিছানার একপাশে। মুখ কালো হয়ে আছে চিন্তায়। বিদ্যাধরীর গলায় ভাবালুতা প্রকাশ পেল, ওরা যদি আমাকে নিতে আসে তাহলে আমার চলে যাওয়াই মনে হয় মঙ্গল হবে। তোমার ঘাড়ে বসে আর কত দিন খাবো?

—আমি তুকে কি খাওয়ার খোটা দিয়েছি? দিগম্বরের কণ্ঠস্বর ভারাক্রান্ত হয়ে এল, তুর যেতে মন চায় চালি যা, আমি তুকে বান্‌ধা দিব না। তুই তো খাঁচার ময়না, ক'দিন উড়ে এসে মোর ইখানে ঠাঁই লেছিলিস। মায়া যে পড়েনি তা লয়। মোর মায়া পড়লে তাতে তুর কী এসে যায়? বিদ্যাধরী ঝাপসা আঁধারে আশে পাশে তাকাল, যমুনাবতী ছেলে দুটোকে সাথে নিয়ে ঘুমুচ্ছে পরম নিশ্চিন্তে। কী সাহসে দিগম্বরের হাতটা সজ্ঞানে ধরল বিদ্যাধরী, আবেগ থরোথরো কণ্ঠে বলল, আমার আর এখানে থাকা ঠিক নয়। দিদি আমাকে ভাল চোখে দেখছে না। ওর মনে সন্দেহ ঢুকছে। ও ভাবছে আমি তোমাকে ছিনিয়ে নিচ্ছি।

—ও ছোটলুকের বিটির কথা বাদ দে।

—দিদির সন্দেহ মিথ্যে নয়। মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত কাজ। বলতে আমার লাজ নেই, কদিন তোমাব সাথে মিলেমিশে আমার মনটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমাকে এর আগে তো কেউ তোমার মত ভালবাসা, আশ্রয় দেয়নি। আমার মনটা দুর্বল হওয়া স্বাভাবিক। আমি অনেকদিন পবে একটা আসল মানুষের দেখা পেয়েছি।

দিগম্বর হাতটা ছাড়িয়ে নেয় না, চুপচাপ বসে থাকে বিদ্যাধরীর পাশে। বিদ্যাধরী বলে, তোমার সুখের সংসার ভেঙে যাক এ আমি চাই না। তাছাড়া দিদি আমাকে ভাল চোখে দেখছে না। সে আমাকে ধুতরোর বিচি বাঁটা খাইয়ে মারতে চেয়েছিল। আমি তো সেদিন ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছি।

দিগম্বরের এর পরে আর কোন কথা বলার ক্ষমতা থাকে না, হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। বিদ্যাধরী বাধা দিয়ে ওঠে, আর একটু বসো। সারাদিন তুমি তো টো-টো করে ঘুরতে থাকো। রাত ছাড়া তো তোমার দেখা পাওয়া যায় না।

দিগম্বর নীরবে তাকাল, তার চোখে-মুখে অদ্ভুত স্নিগ্ধ ছায়া। বিদ্যাধরীর নিঃশ্বাসের আওতায় থেকে সরে যেতে তার ইচ্ছে করে না। এই মায়াময় পরিবেশে তার বেঁচে থাকতে ভাল লাগে। এমন বেঁচে থাকার অদ্ভুত একটা নেশা আছে, উত্তেজনা মিশে আছে। আগে তার মনে ভয় ডর ছিল না। এখন ভয়ের আধিক্যে সে যেন কুঁজো হয়ে যাচ্ছে। দলের প্রতি তার অনুগত্য অসীম। তবু এখন তার মনে হয় যত দিন সে দলের বাইরে আছে

ততদিন বিদ্যাধরীর সাহচর্য সে পাবে। এখন যমুনাবতীকে তার ভাল লাগে না অন্তর থেকে। পরশ্রী কাতরতা, হিংসা, সংকীর্ণতা যমুনাবতীর অলঙ্কার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যাধরীর সঙ্গে কথা বলতে দেখলে সে মরমে জ্বলে যায়, নিজেকে সে কিছুতেই সুস্থির রাখতে পারে না। এসবের মূলে তার দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতাই দায়ী। দিগম্বর পারোতপক্ষে তাকে অবহেলা করতে চায় না। সে অধর্মের পথে হাঁটবে না। ধর্ম বাঁচিয়ে যতটুকু করা সম্ভব ততটুকু সে করবে। যাকে সে সজ্ঞানে আশ্রয় দিয়েছে তাকে সে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারবে না। প্রয়োজন হলে বিদ্যাধরীকে নিয়ে সে সকলের দৃষ্টির বাইরে চলে যাবে। এ এক নেশা। মদ- হাঁড়িয়ার চেয়েও এ নেশার তীব্রতা বেশি।

অন্ধকার ফুঁড়ে হঠাৎ কাশির শব্দ উঠল, ভয়ার্ত বিদ্যাধরীর চোখ দুটো কেঁপে উঠল ঘনঘন। যমুনাবতীর কাশির বেগ উঠলে সহজে তা আর থামতে চায় না। ঘুম চোখে সে যদি দিগম্বরকে তার বিছানায় বসে থাকতে দেখে মাঝ রাতে তাহলে কুচিন্তায় নিজের মনকে খনন করে ফেলবে। দিগম্বরকে সে এসময় চলে যাবার কথাও বলতে পারে না। যমুনাবতীর কানে অবশ্যই তার কম্পিত কণ্ঠস্বর পৌঁছে যাবে। ভয়ে বুকের সমস্ত রক্ত বুঝি মুখের মাঝখানে উঠে আসে বিদ্যাধরীর। দিগম্বর কিছু বলতে গেলে নিঃশ্চুপে তার মুখে হাত রাখে বিদ্যাধরী। কিন্তু তাতেও কোন কাজ হয় না। যমুনাবতীর কাশির বেগ ক্রমাগত বাড়তে থাকে। অন্ধকার ফুঁড়ে বিছানায় হাতের ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সে। কেরোসিনের অভাবে তাদের ঝুপড়িতে কোনদিনও আলো জ্বলে না। জ্যোৎস্নার ম্লান আলো এসে পড়েছে ঝুপড়ির আনাচে কানাচে। একটা কুকুর রাতের নীরবতাকে খুন করে এক নাগাড়ে ডাকছিল। টানা ঝিঁঝিঁপোকার ডাক ঝোপঝাড় থেকে উঠে আসছিল ঝুপড়ির ভেতরে। গা ছমছম করা পরিবেশে চাপা গলায় বিদ্যাধরী বললো, তুমি চলে যাও। দিদির টানটা আবার উঠেছে। তোমার এখন ওর কাছে থাকা উচিত।

দিগম্বর কিছু বলতে গেলেই বাধা দিয়ে ওঠে বিদ্যাধরী, যা বলছি তাই করো। চলে যাও, আর দেরী করো না।

দিগম্বর পায়ে পায়ে অন্ধকার ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছিল, তখনই ভেসে এল যমুনাবতীর রুষ্ঠ গলা, মোর কাচে আসার কুনো দরকার লাই। মুই কাশি লিয়ে মরবা। তাঁর কাচে তো সব হিসাব লিখা থাকে। তাঁর কাচে তুরা মাফ পাবি নে। কথা শেষ হয় না, যমুনাবতীর ফোঁপানীর শব্দ ভেসে আসে। অনর্গল ঘড়ঘড় আওয়াজ যুক্ত হয় কথায়। নাকের সঁকড়ি টেনে সে বলে, মোর চক্ষের সামনে তুরা অতো লীচে নামতে পারলু? ছ্যাঃ! এসব চক্ষে দিখার আগে মোর মরণ হিলে ভালা হিতা।

দিগম্বরের রক্ত ফুটে ওঠে রাগে, সে ছুটে যায় যমুনাবতীর রুগ্ন বিছানায়। ঘন ঘন শ্বাস টেনে বলে, তুর মন পাপে ভরি গেচে।

—হ, হ, পাপে ভরি গেচে! যমুনাবতীর গলার ঘড়ঘড়ানী থামে না, সাচ কতা বললে সবার গুস্সা হয়। হয় হোক। মুই যতদিন বাঁচবা সাচ কতা কইতে ছাড়বানি।

দিগম্বর কী জবাব দেবে কিছু ভেবে পায় না। স্থানুবৎ দাঁড়িয়ে থাকে। তার পাশে এসে দাঁড়ায় বিদ্যাধরী। যমুনাবতীর পাশে বসতেও তার ভয় করে। তার মনে হয় হিংস্র বাঘিনীর সামনে যাওয়া বোকামীর কাজ। তবু যমুনাবতীর ভুল ভেঙে দেওয়া উচিত। সে আশ্রিত বলেই যে তার কোন মানসম্মান থাকতে নেই এমন ভাবটা যমুনাবতীর অন্যায়

বিদ্যাধরী মৃদু স্বরে বললো, দিদি আমাকে ভুল বুঝো না।

—চক্ষে দেখে ভুল না বুঝে থাকি কি করে? যমুনাবতী ফুঁসছিল, মোকে আগে মরতে দে, তারপর যা খুশি কর তুরা। মুই বাধা দিতে আসবানি। এবার ডুকরে কেঁদে উঠল যমুনাবতী। বিদ্যাধরী হাঁটু মুড়ে বসল তার পাশে। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গেলে ঝটকা দিয়ে তার হাতটা সরিয়ে দিল যমুনাবতী, আর মোকে দরদ দেখাসনি রে। মুই দুটা দিন যাওবা বাঁচতি, তুর জন্যি বাঁচতে পারবানি। তুই কালসাপ হয়ে মোর দুয়ারে আসচু। তুর বিষজ্বালা মুই আর সহ্য করতি পারিনি। মুই মরবা। দেখবু, মুই ঠিক মরবা। বিছানায় গড়াগড়ি খেয়ে ক্রমাগত কাঁদতে থাকে যমুনাবতী। তার কান্না কিছুতেই সহ্য করতে পারে না বিদ্যাধরী। অন্ধকারে সে ছিটকে বেরিয়ে আসে ঘরের বাইরে। পুকুরপাড় ধরে ছুটতে থাকে সে। অচেনা পথ জ্যোৎস্নার আলোছায়ায় ঢাকা। মেঠো হাওয়ায় তার আঁচল ওড়ে পতপতিয়ে। সে যে কোথায় চলেছে তা সে নিজেও জানে না। কিছু পরে দিগম্বরের আর্তিভরা ডাক তার কানে পৌঁছোয়। ভ্রুক্ষেপহীন বিদ্যাধরীর গতি তবু থামে না। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আর ফিরবে না দিগম্বরের ছায়ায়। অন্যকে কাঁদিয়ে সে তো সুখ চায়নি কোনদিন। অমন সুখের প্রয়োজন নেই তার।

দিগম্বরের কণ্ঠস্বর হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। ভয় পেয়ে দিগম্বর ছুটতে থাকে বিদ্যাধরীব পেছন পেছন। বড়মাঠ পেরিয়ে এলেই সরুখাল চলে গিয়েছে পূর্বদিকে। শাড়িতে পা বেঁধে বিদ্যাধরী হুমড়ে পড়ে ঢেলা খেতে। উঠে দাঁড়াবার আগেই দিগম্বর হাওয়ার বেগে ছুটে আসে তার কাছে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে বিদাধরীর শরীরের উপব। ঘন ঘন শ্বাস নিয়ে বলে, তু মোকে ফেলি চালি যাবু কেনে? মোর কী দোয? তুই চালি গেলে মুই বাঁচবা নি রে!

—এ কথা তোমার মুখে শোভা পায় না। বিদ্যধরী কঠিন হয়ে উঠল। দিগম্বর তবু সংযত হতে পারে না, বারংবার সেই একই কথা বলে যায়, মোকে ছাড়ি তু কুথাও যাবুনি। যদি যাস মুই মরবা তোর গোড়তলে। বিদ্যাধরী বুঝতে পারে না দিগম্বরের এই আর্তিভরা কথার অর্থ। গায়ের ধুলো ঝেড়ে সে উঠে দাঁড়ায়। এক ঝলক তাকায় দিগম্বরের ঘর্মাক্ত মুখের দিকে, আমার কাছে তুমি কী চাও বলো? তুমি আমাকে জীবন দিয়েছ, তার বদলে তুমি যদি আমার সর্বস্ব নিতে চাও তো নিতে পারো। এ ছাড়া তোমার ঋণ শোধ করার তো আমার কাছে আর কিছু নেই। আমি তো বেশ্যার মেয়ে। আবার নয়ত বেশ্যা হয়ে যাব। দিগম্বর ডানে বাঁয়ে মাথা ঝুকায়, বুকে জোরে কিল মেরে কোঁকায়, মুই তুর কাছে কিছু না চাই। তু শুধু মোর ছিমুতে থাক। তু চালি গেলে মুই পাগল হি যাবা। দিগম্বরের ঘামে ভেজা হাত বিদ্যাধরীকে ছুঁয়ে দেয়, ঘর চ। আর মোর মাথাটা খারাপ করি দিস না। সে শালীকে মুই খুন করবা। তবু তু মোর ঘব চল।

—আমার কাছে তুমি কিছু পাবে না। আমি তোমার কাছে শুধু বোঝা।

—মুই কিছু না চাই, তু ঘর চ।

বিদ্যাধরী মুখ নীচু করে ফিরে আসল দিগম্বরের ঘরে। তখন কত রাত ঠাহর করা যাকিল। শুধু তারা- নক্ষত্র নিয়ে রাত জাগছে আকাশ। পৃথিবীর উষ্ণতা শুষে নিচ্ছে রাত। পোকামাকড়ের ডাকে রাতের বয়স অনুমান করা সহজ সাধ্য কাজ নয়।

যমুনাবতীকে যাওয়ার আগে বেদম প্রহার করেছিল দিগম্বর। কাঁদতে কাঁদতে সে চুপ হয়ে আছে বিছানায়। এখন তার কান্নার ফোঁপানীও শুনতে পায় না দিগম্বর। অনুশোচনার

আগুনে সে পুড়ছে। রাগের ঘোরে বউয়ের গায়ে হাত তুলে সে ভাল কাজ করেনি। এখন যমুনাবতীকে সান্ত্বনা দিতে গেলে সে শুকনো খড়কুটোর মতো জ্বলে উঠবে। রাতটা মাটি হয়ে যাবে তাহলে। দিনের আলোয় সে বউয়ের মুখোমুখি দাঁড়াবে। ক্ষমা প্রার্থনা করবে। যমুনাবতী মনে কিছু পুষে রাখতে জানে না। সে ক্ষমা করে দেবে তাকে।

অনেক রাতে শুলেও ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে যায় দিগম্বরের। রোজই ভোরবেলায় যমুনাবতী তার কাছে এসে বসে। সংসারের টুকিটাকি কথাবার্তা সেরে সে তার নিজের কাজে মন দেয়। আজও সে ব্যাকুল চোখে তাকাল। ছেলে দুটো তখনও বিছানা আঁকড়ে ঘুমাচ্ছে। যমুনাবতী তাদের পাশে নেই। মনটা খচখচ করে উঠতেই বিড়ি ধরিয়ে বাইরে এল দিগম্বর। ফাঁকা উঠোনে ছাগল দুটো বাঁধা। যমুনাবতী নেই।

উঠোন ছাড়িয়ে পুকুরপাড়ে চলে এল দিগম্বর। কোথাও যমুনাবতীর পায়ের ছাপ সে খুঁজে পেল না। হঠাৎ তার চোখ গেল সিঁদুরের আমগাছটার দিকে। এক ফেরতা শাড়ি হাওয়ায় দোল খাচ্ছিল ভৌতিক চেহারা নিয়ে। শাড়িটা যমুনাবতীর। ভয়ার্ত পায়ে সেদিকে ছুটে গেল দিগম্বর। ভোরের আলোয় সে দেখল যমুনাবতীর নিথর দেহ আমগাছের ডালে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে। মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে জিভ। দাঁত বসে গিয়েছে ফ্যাকাসে জিভে। দিগম্বর ভোরের বাতাসে গলা ফাড়িয়ে কেঁদে উঠল।

## ।। বারো।।

উত্তরমুখো শোওয়ান যমুনাবতীর দেহ। নিথর, নিষ্পন্দ, কষ্টকাতর মুখশ্রীতে আলো এসে পড়েছে সকালের। চারিদিকে গড়ে উঠেছে এক বিষময় অর্ন্তলীন শোকের পরিবেশ। দিগম্বর মাথার চুল চেপে বসে আছে যমুনাবতীর পাশে। পলকহীন দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে নিকট আত্মীয় বিয়োগের মর্মান্তিক জলছবি। যমুনাবতীর মৃত্যুর জন্য সে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী, এ সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারছে না। রাতে বউটার সাথে এমন দুর্ব্যবহার সে না করলেই পারত। মেয়েছেলে সব দেয় কিন্তু স্বামীর ভাগ কাউকে দিতে চায় না। জোর করে কারোর অধিকার ছিনিয়ে নিলে সে কেন মেনে নেবে মনেপ্রাণে, ফলে অঘটন যা ঘটার ঘটে গেল।

যমুনাবতীর নিস্তরঙ্গ, পাংশু বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে বুক ভেঙে যায় দিগম্বরের। ঝাপসা হয়ে আসে তার চোখের দৃষ্টি। বারবার নিজেকে অপরাধীর কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েও সে নিষ্কৃতি পায় না কিছুতেই। বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে ওঠে অনতিক্রম্য দুর্বিসহ যন্ত্রণায়। যমুনাবতী তাকে যে এমনভাবে হারিয়ে দেবে স্বপ্নেও সে ভাবতে পারেনি। তাই ওর ঝুলন্ত মৃত শরীরটা দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল পাষাণদেহী দিগম্বর। তার আর্ত চিৎকার শুনে বিছানা ছেড়ে পড়িমড়ি করে ছুটে গিয়েছিল বিদ্যাধরী। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারেনি সে। মাথা ঘুরে মাটি নেওয়ার আগেই দিগম্বর ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে, ভেঙে পড়া গলায় বলে, তু নিজেরে সামলা। খপখপ যা, পুকুরঘা

গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে আয়। আমার একার ডর লাগচে ওকে ছুঁতে। ও তো আমার জন্যি দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল। দু-হাতে মুখ ঢেকে শিশুর কান্নায় ভেঙে পড়েছিল দিগম্বর। পুরুষমানুষকে বিদ্যাধরী খুব কমই কাঁদতে দেখেছে নিজের চোখে। দিগম্বরের অন্তর নিঃসৃত কান্না তার বুকের ভেতরটাকে পুড়িয়ে খাক করে দেয়। যমুনাবতী যে তার উপস্থিতি সহ্য করতে পারেনি একথা সত্যি। এও সত্যি সে নিজেও যমুনাবতীকে সহ্য করতে পারত না। জ্বালাময়ী হিংসাত্মক বাক্যবান সব সময় সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি সে। তবু সে তো কোনদিন যমুনাবতীর মৃত্যু কামনা করেনি। সে চেয়েছিল এদের সংসারে দাসী হয়ে থাকতে। স্বামীখেদান মেয়ের কপালে সুখ বলে কোনও কথা লেখা থাকতে নেই, সে যদি কোনদিন সুখের মুখ দেখে তাহলে পরে সেই সুখ তার কাছে বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়ায়। চোখের জলে ঝাঁপসা হয়ে এসেছিল বিদ্যাধরীর চোখ, পুরো মুখ জ্বালাপোড়া করছিল তাতা চোখের জলের স্পর্শে। তবু সে দিগম্বরের কথা অনুযায়ী অত্যন্ত শ্লথ পায়ে এগিয়েছিল পুকুরঘাটের দিকে। শরীরে যে টালমাটাল ভাব শুরু হয়েছে তা চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিলে কখনই স্বাভাবিক হবে না। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে বিদ্যাধরী যখন ফিরে এল দিগম্বরের কাছে তখন রোদের পোকা কিলবিল করছে চারপাশে। অন্য দশ-পাঁচটা সকালের সাথে এই শোকমূহ্যমান সকালের সে কোন ফারাক খুঁজে পেল না। মাঠ থেকে ছুটে আসছিল হাওয়া; পুকুরের জলে ফণা তুলেছে জলের শরীর। বাঁশবাগানে হুটোপুটি খেলছে দামাল হাওয়া। কাক-পক্ষীর চিৎকার ভেসে আসছে রোজকার মত। চাষের কাজে মাঠের দিকে চলে যাচ্ছে সারিবদ্ধ মানুষ। হুমড়ে পড়া ঘরখানার দিকে তাকিয়ে দিগম্বর আর একবার আর্তনাদ করে উঠল বুক চাপড়ে, এ আমার কী হলো গো, অখন আমি বাপের কাছে কী ভাবে মুখ দেখাবো।

আড়ষ্ট শরীর নিয়ে বিদ্যাধরী দূরে দাঁড়িয়ে থাকল, এ সময় কী তার করণীয় এই বোধ হারিয়ে ফেলেছে। তবু কিছু বলতে হয় বলেই বললো, শোক পরে করবে, আগে দিদিকে নামিয়ে আন গাছ থেকে। ওর কষ্ট যে আর চোখে দেখা যাচ্ছে না।

বহু কষ্টে যমুনাবতীকে গাছ থেকে নামিয়ে আনল দিগম্বর। কোলপাঁজা করে তাব শরীরটা বয়ে আনল উঠোন পর্যন্ত। বিদ্যাধরীও তার পেছন পেছন এল। মুখে কথা নেই, দ্বিতীয় ভাষা তার বুকের ভেতর আটকে গেছে, সে যেন বোবা হয়ে গেছে মুহূর্তে। কী তার করণীয় সব ভুলে গেছে সে। সেই শোকস্তব্ধ মুহূর্তে দিগম্বরকে তার মনে হল যেন অপরিচিত নির্দয় মানুষ, যার দিকে তাকালে এক্ষুণি তার দু-চোখে আঙুল ঢুকিয়ে দেবে। তাহলে কি যমুনাবতীর মৃত্যুর জন্য দিগম্বর তাকে দোষী করছে? কেন ওর চোখ দুটো ছোট হয়ে আছে, ও কেন আগের মতো সুন্দর করে তাকাতে পারছে না ? দিগম্বর যদি তাকে অপরাধী ঠাওরায় তাহলে কোথায় যাবে বিদ্যাধরী? তার তো আর কোথাও যাওয়ার মতো জায়গা নেই। ভেঙে পড়ার পূর্ব মুহূর্তে সে দিগম্বরকে বলল, তুমি যাও। আমি ওর মুখের গ্যাঁজরাগুলো শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিই। দিদি এমনভাবে চেয়ে আছে ওর চাহুনি আমার সহ্য হচ্ছে না।

দিগম্বর কী ভেবে ঘাড় তুলে তাকাল, রুষ্ট গলায় বললো, মুই জানতি গো এমন অঘটন হবে। সে এমন ভাবে কথাগুলো বলল যা শুনে আরও কুঁকড়ে গেল বিদ্যাধরী। দিগম্বরের

চোখে স্পষ্টত শোক মুছে গিয়ে ফুটে উঠেছে রাগ অসন্তোষ আর অতৃপ্তি। যমুনাবতীর মৃত্যু সেও তো মেনে নিতে পারছে না মন থেকে। পথের ঝামেলা ঘরে ঢুকিয়ে একি কাল হল তার? কেন বিদ্যাধরীকে সে নিয়ে এল এখানে। বিদ্যাধরী যদি তার এই ছোট্টঘরে না আসত তাহলে কোনদিনও আত্মহত্যার পথ বেছে নিত না যমুনাবতী। বিদ্যাধরীর রূপগুণ কথাবার্তা, নম্র সহবাস্থান কোন কিছুই মেনে নিতে পারেনি যমুনাবতী। না পারাটাই স্বাভাবিক। সন্দেহের পোকা ওর শান্ত মনটাকে তখন পুরোপুরি চষে ফেলেছে, ক্ষত-বিক্ষত মন নিয়ে সে আর কতদিন বাঁচতে পারত? দিগম্বর অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরে বসতেই যমুনাবতীর কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল বিদ্যাধরী। চোখ ছাপান জলকে সংযত শাসন করে সে তার শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দেয় যমুনাবতীর। তার হাত কেঁপে ওঠে, বুকের ভেতব কেউ হাতুড়ি দিয়ে পেটায় সশব্দে। কেঁপে ওঠে সে। শোকের চাইতে অনাগত ভয় তাকে বেশি কাঁপায়। কাকমারা সমাজের মৃত্যু -পরবর্তী আচার-আচরণ-বিধি সম্পর্কে সে নিতান্তই অজ্ঞ। যমুনাবতীর শরীরে হাত ছোঁয়াতেই তার সাজান শরীরে ধস নামা শুরু হয়, এক জঘণ্য অপরাধবোধ তাকে খুঁবলে খুঁবলে নিঃশেষ করে দিতে চায়।

দিগম্বর এক কাপড়ে চলে যায় পাশের গাঁয়ে খবর দিতে। ফিরে আসে তড়বড়ে ঘোড়াব মত। আত্মীয়-স্বজনদের খবর না দিলে মৃতদেহ সৎকার করা যাবে না। রোদ বাড়ছিল চড়চড়িয়ে। শোকের মুহূর্তগুলো খসে পড়ছিল টুপটাপ। সময় যত হারাচ্ছিল ততই গভীরভাবে শোক চেপে বসেছিল বুকের ভেতর। বিদ্যাধরীর মুখের দিকে তাকাতে তা আর ইচ্ছে করছিল না। ওই সর্বনাশী মেয়েছেলেটার জন্য যমুনাবতীকে চলে যেতে হলে অসময়ে। এত দিনের জমিয়ে রাখা প্রেম-ভালবাসা আকর্ষণ সব এখন রূপ নিয়েছে ঘৃণায় তবু সে মুখ ফুটিয়ে কিছু বলতে পারে না। বিবেক যন্ত্রণায় কাতরায়। বেলা যত বা রোদের ঠোঁট তত ধারাল হয়ে ওঠে। হুড়মুড়িয়ে গ্রাম ভেঙে আসতে থাকে লোক। শো সংবাদ রটে যায় হাওয়ার গতিতে। যমুনাবতীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ভাবিয়ে তোলে সবাইকে সন্দেহের গুঞ্জন ওঠে বাতাসে। সবার আঙুল বিদ্যাধরীব দিকে ফেরান। ক্রমশ কোনঠা হয়ে পড়ে একাকী বিদ্যাধরী। মনের ভেতর বয়ে যায় হুলুসস্থুলুস ঝড়। কথাগুলো অতর্কি খামচে ধরে বুক। সামান্য নিরপত্তার জন্য সে এদের কৃপাপ্রার্থী। এর বেশি সে তো কারো কাছে কিছু চায়নি। এখনও পর্যন্ত দিগম্বরের দিকে সে প্রেমকাতর স্বৈরিণী নারীর চো তাকায়নি। যতটুকু সে করেছে সবটুকুই তো একজন আশ্রয়দাতার প্রতি তার সলা কৃতজ্ঞতা।

খড়ের ঘরের ছোট্ট উঠোনটাতে গিজগিজ করে নানা বয়েসী লোকজন। ভিক্ষাম্ব অপেক্ষায় সবাই যেন সময় গুণছিল। যমুনাবতীর গলায় দড়ি দেওয়ার কী কারণ গবেষণায় গুঞ্জন উঠছিল ভিড়ের মাঝখান থেকে। দিগম্বরের মুখে কোন কথা নেই, স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে যমুনাবতীর মুখের দিকে। শোকে পাথর হয়ে গিয়েছে ত চোখ দুটো। এ অবস্থায় বিদ্যাধরীর যে কী করণীয় তা সে বুঝতে পারে না, দলছুট ভী হরিণীর চোখে তাকায়। বুকের ভেতর ধড়াস ধড়াস করে। সব সময় ভয় হয় এই বু কেউ তার চুলের মুঠি ধরে উঠোনে এনে কড়া ভাষায় অপমান করার জন্য উদ্গ্রী তেমন যদি কোন ঘটনা ঘটে তাহলে তাকে বাঁচাবার মতো কেউ নেই এখানে। স্ত্রীর মৃ পরে দিগম্বরের চোখে তার জন্য এক ফোঁটা দয়া-মায়া অবশিষ্ট নেই। যার ভরসায় এ

ছুটে আসা, সেই মানুষটা শোকে কেমন নীথর হয়ে গিয়েছে।

ভিক্ষাম্বব এল দুপুরের দিকে, তার সঙ্গে পীতাম্বর ঝুমরি আর বিন্দিয়া। দূর থেকে ওদের দেখতে পেয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল বিদ্যাধরীর, সে অনুভব করল তার হাত-পা স্নায়ু সব অসাড় হয়ে আসছে। চরম লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করার জন্য সে প্রস্তুত হল মনে মনে।

ওরা এসেই কোন দিকে না তাকিয়ে যমুনাবতীর পাশে গিয়ে বসল। ঝুমরি তার খড়খড়ে হাতটা যমুনাবতীর খসখসে কপালে বার তিনেক বুলিয়ে দিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল। এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য কে দায়ী তার অনুসন্ধানী চোখ নিমেষে দিগম্বরের শরীর ছাপিয়ে আটকে গেল বিদ্যাধরীর মুখের উপর। চোখে চোখ পড়তেই আগুন ঠিকারান কচি পাতার মতো কুঁকড়ে গেল বিদ্যাধারীর দৃষ্টি। ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে সে ঢোক গিলল বার কতক। ঝুমরি অত লোকের সামনে কিছু না বললেও তার রুষ্ট চাহনি বিদ্যাধরীকে স্বস্তি দিল না এক ফোঁটা। দাগা দেওয়ার সময় এই ঝুমরিই জোর করে তার হাত দুটো চেপে ধরেছিল যাতে সে যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে বাতাস কাঁপিয়ে। অন্যাকে কষ্ট দিতে পারলে এক শ্রেণীর মানুষের যে প্রভূত আনন্দ হয় তাদের দলে ঝুমরির নামটা সবার আগে থাকবে এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত। ঝুমরির কান্না থামল না বরং বাড়ল। শোকপ্রকাশের এমন সহজ সুযোগ সে হাতছাড়া করতে রাজি নয়। বিন্দিয়া তার সঙ্গে গলা মেলাতেই দাঁড়িয়ে থাকা অন্যান্য মেয়েরা হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ল যমুনাবতীকে ঘিরে। কান্নায় ভরে উঠল উঠোন। ভিক্ষাম্বর গাঢ় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হাত ধরল দিগম্বরের, উঠ্ বাপ। তুর এখন মেলা কাজ। যা হবার তা তো হয়েচে। যে গিয়েচে সে তো আর ফিরে আসবেনি।মিছে কেন তার জন্য শোক করা।

হাট থেকে তেল-হলুদ কিনে এনেছিল ভিক্ষাম্বর। বিন্দিয়াকে কাছে ডেকে বলল, এ বিটিয়া, বেলা চড়চে। সুরজ ঢলবার আগেই লাশ তোপ দেওয়া দরকার। তার আগে বাহুরাণীকে তেল-হলুদ মাখায় দে ভাল করে। মাটি দেওয়ার আগে এ গুলো না মানলে পাপ হবে।

বিন্দিয়া চোখের জল মুছে, নাকের সঁকড়ি টেনে এগিয়ে গেল বিদ্যাধরীর দিকে। হাত ধরে বললো, তুমি অমন চুপচাপ খাড়ায় আছো কেন? চলো আমার সাথে।ভাবীকে তেল-হলুদ মাখাবো। বিন্দিয়ার সহজ কথায় কোন জড়তা ছিল না, খোঁচার কোন স্পর্শে ছিল না তবু বিদ্যাধরী স্বাভাবিক হতে পারল না। কেমন অসহায় বেদনা তার পুরো মুখটা গ্রাস করে নিল সহসা। বিন্দিয়া বুঝি অন্তর্যামী, কী বুঝে বললো, তুমি কেন ভয়ে শুকিয়ে আছো? তোমার কি শরীল খারাপ?

বিদ্যাধরী অস্ফুটে বলল, না, শরীর আমার ঠিক আছে।

—তাহলে চলো, আমাকে সাহায্য কর। তেল-হলুদ মাখানো আমার একার দ্বারা হবে না। বিন্দিয়া বিদ্যাধরীর হাত ছাড়ল না, সমব্যাথীর গলায় বলল, আমাদের সমাজে মরা মানুষকে তেল-হলুদ মাখিয়ে তবেই মাটি দেওয়া হয়। হলুদ-তেল মাখানোর সময় আড়াল দরকার। আমি তেল হলুদ মাখাব, তুমি আর ভাবী কাপড় আড়াল করে দাঁড়াবে।

ভিক্ষাম্বর গম্ভীর গলায় ভিড়টাকে সরে যেতে বলতেই পাতলা হয়ে গেল মানুষের জটলা। কিছু লোক বিড়ি টানতে টানতে চলে গেল পুকুরপাড়ের দিকে। দিগম্বরকে ঘিরে

থাকল ওর বয়েসী ক'জন। সমবেদনা জানিয়ে ওরা বললো, রাম-সীতার দয়ায় বোহুটা সঙ্গে চলে যাবে। তবে অপঘাতে মরণ, এর জন্য পূজাপাঠ করার দরকার। নাহলে তোর বোহু পিছু ছাড়বে না। জ্বালিয়ে মারবেক।

দিগম্বরের কানে কোন কথাই ঢুকছিল না, অকস্মাৎ ধকল সামলাতে গিয়ে সে যে কাহিল হয়ে পড়েছে তা তার চোখ-মুখ দেখে অনুমান করা যায় সহজে। পুকুরপাড়ে হাঁড়িয়া নিয়ে বসেছে জনা ছয়েকের দল। শোক ভুলবার জন্য ওরা বাটি-বাটি হাঁড়িয়া গিলছে আর হা-হুতোশ ভাসিয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়।

তেল-হলুদ মাখান শেষ হতেই ডাক পড়ল দিগম্বরের, টলোমলো পায়ে সে উঠে গেল উঠোনে। বাঁশ ঝাড়ের সামনে যে এক টুকরো জমি আছে সেখানে মাটি খুঁড়ছিল পীতাম্বর আর ভিক্ষাম্বর। ভুরভুরিয়ে মাটি থেকে উঠে আসছিল চেনা গন্ধ। যমুনাবতীকে ধরাধরি করে উত্তর দিকে মাথা করে শুইয়ে দিল দিগম্বর। দু-মুঠো মাটি তার বুকের উপর ফেলে দিয়ে শেষবারের মতো কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। তাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল পীতাম্বর। কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, বেটা, নিজেকে সামলা। ঝড়-ঝাপটা সব মানুষেরই আসে। ভেঙে পড়লে চলবে কেন?

কোদাল দিয়ে দ্রুত হাতে মাটিগুলো ঠেলে দিল ওরা। চোখের নিমেষে হারিয়ে গেল যমুনাবতীর দেহ। সন্ধে নেমে আসছে তখন। কাকপক্ষীর ডাকে চারদিক মুখরিত। একদল মানুষ বাঁশঝাড় থেকে ফিরে গেল খড়ের ঘরে। শোকের কাজল ওদের চোখে পরানো। নেশায় বুঁদ না হলে শোকের কাজল কোনদিন ফিকে হবে না।

বিদ্যাধরী আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল দিগম্বর যেন কাকে খুঁজছে। ওর চোখে শূন্যতার ছায়া। যমুনাবতীর ছেলে দুটো তখনই কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এল ওর কাছে। ওদের জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল বিদ্যাধরী।

## ।। তেরো।।

তাজপুরের আকাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে মেঘ-রোদ্দুরের খেলা। যমুনাবতীকে কব দেওয়ার পরই কেমন যেন পাল্টে গেল দিগম্বর। তার পুরো মুখে খোঁচা খোঁচা দাি চোখে-মুখে ক্লান্তি আর অবসাদের চিহ্ন। যেন একটা বিধ্বংসী ঘূর্ণি ঝড়ে তার সমগ্র স কাহিল হয়েছে রীতিমতন। এখন তার কি করা উচিত, কি করা উচিত নয় বুঝতে পার না সে নিজেও।

দিগম্বরের মুখোমুখি বসে সে বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটছিল আপন মনে। কী ভাবছি তা সে নিজেও জানে না।

ভিক্ষাম্বর আকাশপানে মুখ তুলে তাকাল। সকালের ফুটফুটে রোদ হারিয়ে গিয়ে মেঘের গর্ভে। যে কোন সময় বৃষ্টি নামলেও নামতে পারে। ভিক্ষাম্বর ভেবেছিল সে সকা সকাল চলে যাবে কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে তার পা আটকে গিয়েছে তাজপুরের মাটিতে

কাল গেরো দেবার সময় পুলিশী হুজ্জোতির ভয় ছিল। স্থানীয় মানুষ যমুনাবতীর মৃত্যুর খবরটা চাউর করে দিয়েছিল মুখে মুখে। গাঁয়ে বাস করে গাঁয়ের মানুষদের চটালে ধান্দা চলবে না। ভিক্ষাম্বর আড়ালে ডেকে ধমকেছে ছেলেকে। দিগম্বর ঘাড় নীচু করে শুনেছে, বাপের মুখের উপর কোন জবাব সে দেয়নি। তাছাড়া তার কোনো জবাবও জানা ছিল না। অভিমানী যমুনাবতী এভাবে ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিজেকে যে সরিয়ে নেবে ভাবতে পারেনি দিগম্বর। যদি আগাম জানতে পারত তাহলে এত বড় ভুল সিদ্ধান্ত সে যমুনাবতীকে নিতে দিত না। কাকমারা সমাজে ঝগড়া-কলহ, হাতহাতি-মারামারি অষ্টপ্রহর। গালিগালাজ ছাড়া এখানে কোনো কথা বুঝি গুরুত্ব পায় না। যমুনাবতী সব জানত তবু এত বড় ভুল সে কেন করল? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বেজায় ঘেমে উঠছিল দিগম্বর। ভয়ে তার ডান চোখ লাফচ্ছিল বার বার। তাছাড়া পুলিশী ঝামেলার ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল সে।

কংস যমুনাবতীর দাদা। সে এসেছে খবর পেয়ে। তার নেশাচ্ছন্ন চোখ বারবার করে গিলছিল অসহায় দিগম্বরকে। দিগম্বর সেই অসুর দৃষ্টির দিকে অপলক তাকিয়ে থাকতে পারেনি। তার চওড়া বুক কেঁপে উঠেছে ভয়ে। সেই ভয়ের ঘনত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বিদ্যাধরী। বিদ্যাধরীর উপস্থিতি তাদের সমাজে বড় বিসদৃশ। কংস শুধু দিগম্বরকে নয়— বিদ্যাধরীকেও গিলছিল। রাগে কটকট করছিল তার চোখের তারা। বিদ্যাধরী আড়ালে গিয়ে বেঁচেছে কিন্তু দিগম্বরকে কংস ছাড়ল না। একথা সে কথার পরে সে হিংস্র গলায় বললো, মোর বুনটা অকালে ঝরি গেলা! সে মুখপুড়ি দুখ সইতে পারলানি। কেনে পারবেক? এক আসমান, দো চান্দা—মানায় নাকি? এ হিলা দিগম্বরের জগত ছাড়া বেচার। রাঢ় পুষতে হয় তো তু ভিন জায়গায় লিয়ে গিয়ে পুষ। কে তোরে মানা করচে? তা না এক জায়গায় এক খাঁচায় দুটা বাঘিনীকে পুরি দিলা। এতে যা হবার হিলা। গটে ফুল ঝরি গেলা! কার গেলা? মোর গেলা, মোর বাপের গেলা। কংস কথা থামিয়ে আবার অঙ্গার চোখে তাকাল, তবে মুই ছাড়বানি, মুই এর বেচার চাইবা। কাকমারা ঘরের মায়াঝি কি অত সস্তা নাকি। তাজপুরে আসার পর থেকেই কংস চেষ্টায় ছিল ঝামেলা বাঁধিয়ে অশান্তির আগুন ছড়িয়ে দেবার। কিন্তু তার চেষ্টা বিফল করে দিল দক্ষ-অভিজ্ঞ ভিক্ষাম্বর আর পিতাম্বর। ভিক্ষাম্বর কংস'র মনোভাব বুঝতে পেরে মোলায়েম স্বরে বলেছিল, বাপো, তু যা কোউটু তা পুরাপুরি ঠিক লয়। মানুষের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ কেউ আগাম কইতে পারে নাই আচ পর্যন্ত। কেনে মিছামিছি মাথা গরম করুটু। চুপ যা বাপো, চুপ যা।

—চুপ করবা, কেনে করবা, তুমাদের ভয়ে নাকি? হাতের পেশী ফুলিয়ে ফুঁসে উঠেছিল কংস। পরিস্থিতি যাতে আয়ত্বের বাইরে না চলে যায় সেইজন্য আগেভাগে এগিয়ে এসেছিল পীতাম্বর। কংসর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সে বলেছিল, অখন মাথা গরম করার সময় লয়। ঘরে আগুন লাগলে বাতাস করা উচিত লয়। আগুন আগে নিভুক, তারপর সবাই মিলে বেচার করা যাবে। এ তো পরের ঘরের মামলা লয়, এ হলো নিজের ঘরে। বাপো, তুর বেজায় মাথা গরম। নিজেরে ঠাণ্ডা কর আগে। গরম মাথায় চোটপাট করলে সবকিছু বিগড়ে যায়—বুঝলি। কংসর ঝাঁকড়া চুল, ঘোমো গতর, চওড়া বুকে লুটিয়ে থাকা তাবিজ নজরকাঠি সব যেন পলকে তাকে বন্য নেশায় ক্ষেপিয়ে তোলে। সে নিজেকে আর ধরে রাখতে পরে না, বুকে দুমাদুম ভুকড়া মেরে 'এ যমুনে তু কুথায় গেলিরে-এ-এ' বলে অবুঝ কান্নায় ভেঙে পড়ে। ভিক্ষাম্বর বা পীতাম্বর কেউ-ই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না,

তারাও ঘাবড়ে গিয়ে আশেপাশে তাকাল। শোকসংবাদ দ্রুত ছোটে। তারা চাইল কংস'র কান্নাকে থামিয়ে দিতে। কান্না বড় ছোঁয়াচে। এক চোখ থেকে অন্য চোখে চলে যায় লাফিয়ে লাফিয়ে। মুহূর্তে কান্নার রোল উঠল পুকুরয়াড়িতে। দিগম্বরের দুই ছেলে 'মামু, কাঁদোনি গো' বলে কঁকিয়ে উঠল। বড় পুকুরের জলে তখন অগাধ ঢেউ। মাছ ঘাই দেয় মাঝপুকুরের জলে। হ্দীর উপর দিয়ে দ্রুত হেঁটে যায় বেলা শেষের ডাহুকপাখি। কলমীলতার ফিকে গোলাপী ফুলগুলো তখন ফুটব-ফুটব করছে। বিদ্যাধরী ছেলে দুটোকে ধরতেই ওরা ছাড়িয়ে নিল হাত। ফুঁসে উঠে বললো, খবরদার, তু মোদের ছুঁবুনি। তুর জন্যি মোদের মা মরল। ওরা পিছিয়ে গেল হাত চারেক। দিগম্বরের ভাল লাগেনি এসব। অন্যসময় হলে সে তাদের চুলের মুঠি ধরে পেটাত। আজ অন্য কথা। নিজের বমি নিজে গিলে নেবার মতো তিতকুড়ো মুখ নিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল সে। আঁচলে চোখের জল মুছে নিয়ে সে তফাৎ-এ গিয়ে দাঁড়াল।

পীতাম্বর সব দেখে-শুনে বললো, যার যখুন সময় হিবে তাকে তো যেতেই হবে। রাম-সীতার মার, দুনিয়ার বার। যতদিন দানা-চাল লিখা আছে দুনিয়ার ততদিন তো মানুষে দানা খাবে! তুমি-আমি জোর করে খাওয়াতে গেলে চলবেকনি।

পীতাম্বরের নির্দেশে দিগম্বর হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে গেল কংসকে। যেতে যেতে সে বললো, যমুনাবতী আমার চোখের দৃষ্টি ছিল গো! সে চলে যাবর পর আমি অন্ধ হয়ে গেলাম।

কংস মুখের থুতু মুছে নিয়ে বললো, অন্ধ কেন হবে গো, তুমার তো আবার চান্দ উঠেচে আকাশে। তুমার অখন তো শুধু জুৎস্না আর জুৎস্না!

বিদ্রুপটা গায়ে মাখেনি দিগম্বর কেন না সে জানত হাতি যখন কাদায় পড়ে চামচিকিতে লাথি মারে। এটাও দুনিয়ার নিয়ম। সেই নিয়মে বাধা পড়ল তার বিবেক। কলাইকরা বাটিতে হাঁড়িয়া ভরে সে এগিয়ে দিয়েছিল কংসর দিকে, টুকো লিশা করে লাও, মেজাজটা ঠিক হবে। লেশায় দুঃখ জুড়িয়ে জল হয়। পরপর চার বাটি হাঁড়িয়া গিলে কংস নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারল না, ভারী শরীর এলিয়ে দিল ঘাসের বিছানায়। দিগম্বর আর সময় ব্যয় না করে চলে গিয়েছিল বিদ্যাধরীর খোঁজে। কিন্তু সহসা সে বিদ্যাধরীর দেখা পেল না। বিদ্যাধরী পালিয়ে গেছে ফাঁকা মাঠে, ফাঁকা মাঠই বুঝি তার আসল জায়গা এ সংসারে পরগাছা হয়েও বাঁচতে পারবে না এটা সে বুঝে গিয়েছে হাড়ে হাড়ে। এদের সমাজ, বুদ্ধি বিচার, আদব-কায়দা, জীবনধারণ সব আলাদা। সে ভেবেছিল মানিয়ে নিতে পারবে, কিন্তু অসম্ভব। জল আর তেলে মিশ খায় না কোনদিন। সে মিশতে চাইলে এরাই বা মিশবে কেন? যমুনাবতী তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। কথায় কথায় গাল দিত সেই কটু গালিগালাজ এখনও কানের পর্দায় ভেসে ওঠে বিদ্যাধরীর। সে তখন তার চোখের জলকে সামাল দিতে পারে না। যার হাত ধরে সে এই সমাজে এল সেই মানুষটাই বা কী করেছে তার জন্য। তারও তো হাত-পা বাঁধা। বিদ্যাধরী ভাবল তার এই জীবন রাখার চাইতে না রাখাই ঢের ভাল। সে যেখানে গেল সেখানেই জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেল সংসার তবে কি তার নিঃশ্বাসে বিষ আছে? তার ছায়ায় কি দূষিত হয়ে ওঠে সংসারের পবিত্র ছায়া? বিদ্যাধরী ঢ্যাঙ্গা আলের উপর বসে খোলা আকাশের নীচে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল বাতাস বয়ে নিয়ে গেল তার সেই কান্না, বিস্তৃর্ণ মাঠ তার চোখের জলকে বুকে নিয়ে

বোবায় ধরা মেয়েমানুষের মতো শুয়ে থাকল চুপচাপ। ঠিক সেই সময় গিয়ে দিগম্বর তার ঘাড়ের উপর সান্ত্বনার হাত রাখল, ঘর চল। মাঠে বসে কাঁদলে তুর ঘায়ে কেউ মলম লাগিয়ে দিবেনি।

চমকে তাকাল বিদ্যাধরী, আমি আর ঘর যাবো না। তুমি চলে যাও।

—ঘর যাবুনি তো যাবু কুনঠি?

—আমি ঘর না গেলে তোমার কোনো ক্ষতি হবে না। বিদ্যাধরী অশ্রুসজল চোখে তাকাল।

দিগম্বর জোর করে হাত ধরল বিদ্যাধরীর, চল বলচি। অত গোঁসা ভাল লয়। মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকল বিদ্যাধরী। দিগম্বর সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। নিমেষে ওরা ঢ্যাঙ্গা আল থেকে ছিটকে পড়ল জমিতে। ধূলোয় ভরে গেল গা-গতর। একসময় বিদ্যাধরীর বুকের উপর দিগম্বরের দাড়িভর্তি মুখটা খেলা করতে লাগল। রৌদ্র-ছায়ার চিরন্তন খেলার মত। শোকে-কাতর গতর নিয়ে চুপচাপ পড়ে থাকল বিদ্যাধরী। মেঠো হাওয়ায় শুকিয়ে গেল তার শরীরের নুনঘাম।

সকালে নানা ঝামেলায় আর যাওয়া হয়ে উঠল না ভিক্ষাম্বরের। দিগম্বরেরও মত ছিল না ওরা এত তাড়াতাড়ি চলে যাক। তাছাড়া আকাশের অবস্থাও ভাল নেই, কখন বৃষ্টি নামবে কে জানে! দূরের আত্মীয় সব থেকে গেল। তাদের রেঁধে-বেড়ে খাওয়াল বিদ্যাধরী একাই। দিগম্বরও হাত বাড়াল সহযোগিতার। কংস মোটেও খুশি হল না দিগম্বরের ব্যবহারে। সে সুযোগ খুঁজছিল দিগম্বরের মুখোশ খুলে দেবার জন্য।

বাস-স্ট্যাণ্ডে চা খেতে গিয়ে কংসর মেজাজটা বিগড়ে গেল। চা-দোকানী তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললো, শুনলাম কাকমারাদের একটা বউ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে? কি ব্যাপার গো? সেই ছোকরা কাকমারাটা কি তার প্রথমপক্ষকে মেরে ফেলল? বলা যায় না ভাই—যা দিনকাল পড়েছে, কার মনে কী আছে তা বুঝব কী করে?

—যে মরেচে, সে আমার বুন হয় গো!

কংস'র কথায় নড়ে চড়ে বসেছে চা-দোকানী, ইস, তোমার জন্য কষ্ট হয়। অমন পশুর হাতে বোনটাকে কেন দিলে ভাই? তোমাদের জাতে কি আর ভাল ছেলে ছিল না?

মুহূর্তে তেতে উঠল কংস, হাতের পেশি ফুলিয়ে বললো, ঐ হারামখোরটার জন্যি আমার বুনটা বেঘোরে মারা গেল গো! আমার ছাতি ফেটে যাচ্চে, আমি যে কী করব কিছু বুঝতে পারচি নে।

কংস চায়ের দাম মিটিয়ে আর সময় ব্যয় করল না, ফিরে গেল পুকুরয়াড়িতে। তার মাথা তেতে উঠছিল ঘনঘন, সে যে কী করবে কিছু বুঝতে পারছিল না। দিগম্বরকে ধারে কাছে দেখতে না পেয়ে কংস ঢুকে এল কলাবাগানের ভেতর। অবছা আলো এসে পড়েছে কলাগাছের পাতায়, হাওয়ায় কাঁপছিল বেগো ভাঙা পাতাগুলো। পাতাগুলো যেন মেটে রঙের সাপের মত নড়ছিল। কংস চারপাশ ভাল করে দেখে নিয়ে বেরিয়ে এল সেখান থেকে। গরমে ভিজে গেছে তার পুরো শরীর। রাগে তার গা-হাত পা কাঁপছিল থরথরিয়ে। এসময় বিদ্যাধরীকে হাতের কাছে পেলে সে তার রাগ জল করে ঘরে ফিরতে পারত। কিন্তু কোথায় বিদ্যাধরী? কংসর চঞ্চল চোখ বিদ্যাধরীকেই খুঁজছিল কিন্তু ধারে কাছে সে কোথাও বিদ্যাধরীকে দেখতে না পেয়ে বড়ই হতাশবোধ করল নিজেকে।

বিদ্যাধরী মাঠ পেরিয়ে চলে গিয়েছে বহুদূর। তার ভাগ্যে রাম-সীতা মনে হয় সংসার লেখেনি। তাড়া খাওয়া অসহায় মেয়েমানুষ একটা ঠিকানা কিংবা আশ্রয়ের খোঁজে নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছিল এই ছিন্নমূল সমাজে। কিন্তু সেখানেও তার ঠাঁই হলো না। শেকড়ের মাটি কেড়ে নিলে কোন গাছই বাঁচতে পারে না। শুকনো মরুভূমি এই জীবন নিয়ে সে দাঁড়াবে কোথায়? বিদ্যাধরী অনন্ত আকাশের ছায়ায় হাঁটছে। কোথায় যে তার গন্তব্য সে নিজেও জানে না। শুধু এটুকু জানে তাকে ফিরে যেতে হবে আগের জীবনে। জীবনের কোন শেষ নেই, জীবনও অনন্ত সীমাহীন আকাশ।

বিদ্যাধরী বড় বাঁধের উপর উঠে এসে শুধু আর একবার পিছন ফিরে তাকাল। সে দেখতে পেল লম্বা লম্বা ছায়া ফেলে তার দিকে ধেয়ে আসছে দিগম্বর। বিদ্যাধরীর পালাবার কোন শক্তি নেই। হাঁটু মুড়ে সে বসে পড়ল বাঁধের ধুলোয়।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে পায়ের শব্দ। ঝড়ের শব্দ। এই ঝড় তার জীবনের গতি কি বদলে দিতে পারবে?

বিদ্যাধরীর শরীর বেয়ে ঠেলে উঠল কান্না। ঝাপসা চোখে সে দেখল হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীটা ক্লান্ত-বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে হুমড়ে পড়েছে তার সামনে।

মানুষ পাহাড় ডিঙালেও ভালবাসার টিলা পেরতে পারে না। সে হাত ধরে দাঁড় করায় দিগম্বরকে। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলে, চলো আজ থেকে তোমার দুঃখ আমার দুঃখ। তোমার সব কিছুই আমার। একা থাকাব জ্বালা অনেক। আমি হেরে গেলাম।

বড় বাঁধের উপর দুটি ছিন্নমূল মানুষ জীবনের নতুন স্বাদ খুঁজে পায়।

---

# টিটলাগড়ে সূর্যোদয়

## ।। এক ।।

স্টেশনের নাম সিকির। ট্রেনের নাম লাকি 'থ্রী'। টিটলাগড় স্টেশনে দাঁড়িয়ে ভোরবেলায় হাই তুলল মহেশ্বর। সারারাত তার চোখে ঘুম আসেনি। গ্যাং থেকে ফিরেই তার দম নেবার ফুরসৎ কোথায়? ওয়েস্ট-কেবিনের কাছে ফেলিওর ছিল। লিঙ্ক এক্সপ্রেস মার খেয়েছে পাক্কা দেড় ঘণ্টা। স্টেশন মাস্টারের মেমো পেয়েই কাঁচা ঘুম ছেড়ে সে ছুটে এসেছিল ওয়েস্ট-কেবিন। ফেলিওরটা ধরতেই সময় লেগে গেল অনেকটা। সেই থেকে ভয় জমাট বেঁধে আছে মনের ভেতর। মহেশ্বর টুল-কিটসটা নামিয়ে আড়মোড়া ভাঙল আরেকবার. চারিদিকে আলো ফুটছে কৃষ্ণচূড়া ফোটার মত। ঠিক এই সময়টাতে টিটলাগড়ের পরিবেশ অতি মনোরম। আঁধারের বুক ফুঁড়ে ফিনকি দেওয়া রক্তের মত ছিটকে আসছে সূর্যের আলো। রেল ব্রিজটার ওপারেই রামুর চায়ের দোকান। কাঠের চুলায় অ্যালুমিনিয়ামের ডেকচিতে চা ফুটছে টগবগিয়ে। ঢিল মারা মৌচাকের মৌমাছির চেয়েও সেখানে এখন থিকথিক করছে মানুষের মাথা। সকালের চা'টা রামু ভালই বানায়। আদা দেয়, এলাচও থেঁতো করে দেয়। সুন্দর একটা বাস ওঠে রামুর ধুমায়িত চায়ে। সেই সুগন্ধের নেশায় খেটে খাওয়া মানুষগুলো সাত সকালে ভিড় জমায় ওখানে।

মহেশ্বর বারদুয়েক স্টেশনের এমাথা থেকে সেমাথা পর্যন্ত পায়চারী সেরে এসে নিজেকে কিছুটা হাল্কাবোধ করল। তবু মাথা থেকে ফেলিওরের চিন্তাটা কিছুতেই গেল না। সিগন্যাল-ইন্‌সপেক্টর প্রসাদবাবুর কাছে সে কি জবাব দেবে কিছুই খুঁজে পেল না। এবং মনে মনে সে রীতিমত ঘাবড়ে গেল। লিঙ্ক এক্সপ্রেস দেড় ঘণ্টা মার খাওয়া মানে এই চাকরিতে ঝুঁকির ব্যাপার। সুবিধামত কারণ না দর্শালে তার কপালে যে কি লেখা আছে কে জানে। আজকাল সে ভীষণ চাকরিকে ভয় পায়। মমতা বারবার করে তাকে সতর্ক করে দিয়েছে, পুরুষমানুষের চাকরি না থাকলে তার এক পয়সাও দাম নেই।

দাম যে নেই এটা মহেশ্বর নিজেও স্বীকার করে। মাসের প্রথমে কড়কড়ে নোট গুনতে কার না ভাল লাগে। টাকার যে শক্তি সেই শক্তি আর কারোর বুঝি নেই। ফলে মমতার কথাগুলোকে বেদবাক্য বলে মনে করে মহেশ্বর।

এই সাত সকালে তার আর মমতার কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। স্টেশনের দেওয়াল ঘড়িটায় ঢং-ঢং করে ছ'টা বাজার শব্দ হল। এখন প্লাটফর্মের এদিক-সেদিক ফাঁকা। দু-একজন যারা আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাদের প্রায় সবাই মুখ চেনা। ওদের বেশির ভাগই প্লাটফর্মের বাসিন্দা, সেডের নীচে রাত কাটিয়ে ওরা চলে যাবে যে যার ধান্দায়। আর পি এফ মেরে ভাগিয়ে দিলেও ওদের যাওয়ার কোন জায়গা নেই। ওদেরই একজন, তার নাম বিলা। সে এসে দণ্ডবৎ করে বলল, বাবুর মনে হয় রাতে আজ ঘুম হয়নি?

বিলার প্রশ্নে কিছুটা বিরক্ত হল মহেশ্বর, শুনেও না শোনার ভান করে সে তাকাল, তার চোখে-মুখে এমন কী শরীরের সবখানে অবজ্ঞা আর লুকানো থাকল না। এই বিলাকে মহেশ্বর চেনে অনেক বছর ধরে। বছর ছয়েক আগেও বিলা চুরিচামারী করত রেল কলোনীতে, রানিং ট্রেন থেকে নামতে গিয়ে সে তার ডান পা'টা খোয়ালো। ডান পা হারিয়ে

বিলা এখন এ চত্বরে ল্যাংড়া বিলা। আশেপাশের ঝুপড়ি দোকান থেকে শুরু করে রেল কলোনীর অনেকেই এখন বিলাকে এক ডাকে চেনে। তাকে চেনার অনেক কারণ আছে। প্রথম কারণ হল তার দাড়ি-গোঁফ ভর্তি জমাট মুখখানা। দ্বিতীয় কারণ হল-বিলা ভাল বেড়া বাঁধে। মাটি কুপায়। বাগান পরিষ্কার করে। বিনিময়ে সে যা দক্ষিণা পায় তাতে তার একটা পেট ভাল মতন চলে যায়।

বিলা এখন মহেশ্বরের কাছে হাত পেতে অদ্ভুত কায়দায় দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে ঠেস দেওয়ার লাঠি নেই, লাঠি পড়ে আছে পায়ের এক হাত দূরে। বিলা কেন অমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে মহেশ্বরের তা অজানা নয়। একটি টাকা পেল বিলা চলে যাবে রামুর চায়ের দোকানে। গল্পগুজব সেরে সে ফিরবে সাতটা নাগাদ। তার আগে অস্থায়ী বিছানা গুটিয়ে তুলে দেবে টিনের ছাদে। সারাদিন তার বিছানা রোদ খায়, ছারপোকার কোনো উৎপাত নেই। যেদিন বিলার পকেট গরম থাকে সেদিন তার অন্য মূর্তি। ঘুম থেকে উঠে সোজা চলে যাবে হাটপাড়ায়। ওখানে চোলাইয়ের ঠেক আছে। নেশালী জল দিয়ে মুখ না ধুলে ওর দিন নাকি ভাল যায় না। বিলার সাথে মহেশ্বরের এসময় দেখা হোক এটা জ্ঞানত চায়নি সে। ফলে পকেট থেকে এক টাকার একটা কয়েন বের করে দিতেই সে ঘাড় সোজা করে স্যালুট দিয়ে ওভার ব্রিজের উপরে উঠে গেল। আপদ বিদেয় হতেই মহেশ্বর যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল

দিনের প্রথম আলো ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে জেগে উঠছে টিটলাগড়। দু-একজন করে লোক জড়ো হচ্ছে স্টেশন এলাকায়। হঠাৎ গাঁ থেকে একদল হাড়-জিরজিরে পোড়াটে চামড়ার নর-নারী এসে জড়ো হল। ওদের কথাবার্তা শুনে মহেশ্বর স্পষ্টত বুঝতে পারল ওদের গন্তব্য হল সিকির স্টেশন। ওরা হয়ত রোজই আসে রঙ্গবতী প্যাসেঞ্জারে যাবে বলে এই ট্রেনটার বিশেষত্বই আলাদা। লাকি-থ্রি'র নাম বদলে ওরা রগড় করে বলে রঙ্গবতী প্যাসেঞ্জার। টিটলাগড় ছাড়লেই দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই দেখা যাবে সিকির স্টেশন ছবির মত সেই স্টেশনটার পা ছুঁয়ে এগিয়ে গিয়েছে পাহাড় আর জঙ্গল। সিকিরের চারদিক জুড়ে ঠাস বুনোট বন। বন বিভাগের রক্ষীরা থাকে সেই জঙ্গলের পাহারায়। তবুও শয়ে শয়ে মানুষ এখানে আসে জীবিকার সন্ধানে। কারোর হাতে থাকে কুডুল দা-কাতান আর কাঠ বাঁধার জন্য রশা-দড়ি। কারোর বা হাতে থাকে ট্রেনের জানলায় কাঠের বোঝা ঝোলানোর জন্য আংটা শিক। সিকিরের জঙ্গল না থাকলে এরা সব যেত কোথায়? বিলাও আগে আসত এদের সঙ্গে কিন্তু ডান পা'টা বাদ যাওয়ার পর সে একাজে পুরোপুরি বাতিল হয়ে গেল। দৌড়-ঝাঁপের কাজ এখন আর তার দ্বারা হয়না। বাঁ পা'টা সে আর ট্রেনের চাকায় পিষ্ট হতে দেবে না। এই এক ভয়ে বিলা এখন গাড়ি-ঘোড়া-ট্রেন-বাস এড়িয়ে চলে

ল্যাংড়া বিলা ওভারব্রিজের উপরে উঠে দাড়িতে হাত বুলিয়ে শুধু একবার আকাশের দিকে দার্শনিক চোখে তাকাল। স্টেশনে ভিড় যত বাড়ে তার তত মজা। সেদিন তার কামাই হয় মনের মত। সেদিন হাত পাতলেই পয়সা আসে, সেদিন আর রেল কলোনীর ভেতরে মজুর খাটতে যায় না বিলা। ঝুপড়ির হোটেলে ভাত খেয়ে সেদিন সিমেন্টের বেঞ্চিতে আরামে নিদ যায় সে। পৃথিবীর কোন কিছুতেই তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। মহেশ্বরের চোখে বিলা বরাবরই এক অদ্ভুত জীব। এমন উদাসীন মানুষ সে বুঝি জীবনে আর দুটি দেখেনি

রামুর চায়ের দোকানে ভিড় বেড়েছে আরো। রঙ্গবতী প্যাসেঞ্জারের যাত্রীগুলো রামুকে কেমন ঈর্ষার চোখে দেখে। রামুর ব্যবসা ভাগ্য ভাল। তার চা-দোকানটা যদি ঠিকঠাক ন

চলত তাহলে তাকেও হয়ত দা-কুড়ুল নিয়ে কাঠের সন্ধানে ছুটতে হত সিকিরের জঙ্গলে। রাত করে ফিরতে হোত কাঠের বোঝা নিয়ে।

ঠিক সকাল সাড়ে আটটায় রঙ্গবতী প্যাসেঞ্জার ছেড়ে যাবে। মাইকে বলছিল হীরাখণ্ড এক্সপ্রেস এক ঘণ্টা পনের মিনিট লেট আছে। মহেশ্বর মনে মনে অঙ্ক কষে দেখল গাড়িটা ছ'টা পনের বা সাড়ে ছ'টা নাগাদ আসতে পারে। এই একটা গাড়িই তাকে প্রতিদিন মনে করিয়ে দেয় চিলকা-সংলগ্ন বালুগাঁওয়ের কথা। আর বালুগাঁওয়ের কথা মনে পড়লেই তার মনে দোল দেয় টুনি আর শোভার কথা। কালও একমাত্র মেয়ে টুনির চিঠি এসেছে। টুনি লিখেছে, 'বাবা, পত্রপাঠ তুমি চলে এসো। মায়ের শরীর বিশেষ ভাল নেই। রোজই সন্ধ্যায় জ্বর আসে। ডাক্তারবাবু বলেছেন-রক্ত পরীক্ষা করাতে। তোমার পাঠানো সাতশ টাকা মা পেয়েছে। আজ চারমাস তুমি ঘরে আসোনি। বাবা, তোমার জন্য আমাদের মন ভীষণ খারাপ করে। চিঠি পাওয়ামাত্র তুমি ছুটি নিয়ে চলে এসো। শরীরের যত্ন নিও। সময় মত খাওয়া-দাওয়া কোরো। ইতি-তোমার টুনি।'

টুনির চিঠিটা বারকতক পড়েও শান্তি পায়নি মহেশ্বর, নিজেকে তার মনে হয়েছে দাগী আসামী। অপরাধ যে করে তার মুখের আদলই অন্যধরনের। আয়নায় চুল আঁচড়াতে গিয়ে চমকে উঠেছিল মহেশ্বর। এই টিটলাগড় তার জীবনের সুন্দর ছকটাকে বদলে দিয়েছে পুরোপুরি। সে এখন আর শোভার মুখোমুখি হতে পারে না। কে যেন খামচে ধরে তার বুকের ভেতর। অসহ্য অসহনীয় যন্ত্রণা অনুভূত হয় তখন। সে ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে পড়ে। শোভার পাশে সে টিটলাগড়ের মমতাকে কিছুতেই দাঁড় করাতে পারে না। মমতা হেরে যায়, সেও হেরে যায়। মনে মনে পিছোতে থাকে মহেশ্বর। এক সময় তার পিঠ ঠেকে যায় দেওয়ালে। সে হাঁপিয়ে ওঠে, দু'চোখে অন্ধকার দেখে। গ্রাম্য শোভার নিরুত্তর, নীরব ব্যথাহত দৃষ্টি তাকে যেন হাবিয়ে দেয় বারবার। একধরনের অপরাধবোধে সে কুঁকড়ে থাকে ফলে নিজের জন্মভিটায় ফিরেও সে মানসিক শান্তি বা আরাম খুঁজে পায় না। দুপুরে খাওয়ার সময় টুনি বলে, বাবা, তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমার খুব কষ্ট হয়। তোমার কি আমার জন্য একটুও কষ্ট হয় না?

কষ্ট যে হয় না তা নয় তবু মহেশ্বর কেমন যেন উদাসীন। সে আর আগের মত তার মেয়েকে বলতে পারে না, তোর কথা আমার সবসময় মনে পড়ে মা। তুই ছাড়া আমার আর কে আছে বল?

পনের বছর আগে মহেশ্বর চাকরি নিয়ে যখন এখানে এল তখন টুনির বয়স মাত্র তিন বছর। সেই টুনি এখন আঠারো বছরের ফোটা ফুল যুবতী, এ বছর হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের অপেক্ষায় বসে আছে ঘরে। শোভা তাকে আগলে রাখে। একা কোথাও যেতে দেয় না। দিনকাল খারাপ। একবার আইবুড়ো মেয়ের গায়ে বদনামের পাঁক লাগলে তা সহজে মুছতে চায় না। কাল রাতে কি মহেশ্বর একটু বেশি আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছিল? তাহলে মমতা কেন ছোঁ-মেরে ছিনিয়ে নিল টুনির চিঠিটা? এ ঘটনায় মহেশ্বর একটু বেশি মাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। চটে ওঠা স্বরে সে বলেছিল, চিঠিটা দাও।

—যদি না দিই? মমতার ঠোঁটের কঠিন হাসিটা আদৌ ভাল লাগেনি মহেশ্বরের, সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, দাও বলছি। টুনির চিঠিতে তুমি হাত দেবে না।

— কেন, হাত দিলে কি পচে যাবে? অভিমানে ফুলে উঠেছিল মমতার কমলা কোয়া

ঠোঁট। চিঠিটা দলা পাকিয়ে সক্রোধে ছুঁড়ে দিয়েছিল মহেশ্বরের বুকে, তারপর ফুঁপিয়ে উঠে বলেছিল, যতই করি না কেন, আমি জানি কোনদিন তোমার ভেতর ছুঁতে পারব না। মেয়ে আর বউ তোমাব সবটুকু জুড়ে বসে আছে। তারা বেঁচে থাকতে আমার আর পরাগের সেখানে তিলমাত্র জায়গা হবে না। আমি যার জন্য কাঁদি, ছটফট করি— সে আমার কেউ নয়। তোমার কাছে আমি হলাম বিষাক্ত আগাছা।

কেঁদে-কেটে রাতের খাওয়াটাই মাটি করে দিল মমতা। পাত ঠেলে দিয়ে উঠে পড়েছিল মহেশ্বর। কী বুঝে মমতাই আবার টেনে আনল তার হাত ধরে, আমার উপর রাগ করছো ঠিক আছে কিন্তু ভাতের উপর রাগ করো না। অন্ন হলো মা লক্ষ্মী। বসো, আমি আর একটু মাছের ঝোল দিচ্ছি।

মমতার অনুরোধ অগ্রাহ্য করা বড়ই কঠিন কাজ মহেশ্বরের পক্ষে। সে বাধ্য ছেলের মত আবার বসল খাওয়ার জন্য। মমতার স্বামী বৃন্দাবন তখন খাটে বসে পা দোলাচ্ছে আর মজাসে ফুঁকফুঁক করে বিড়ি টানছিল। বিড়ি টানলেই বৃন্দাবনের খুঁকখুকানি কাশির মাত্রা বাড়ে। মমতার সেদিকে কোন খেয়াল নেই। বৃন্দাবন যে মানুষ, তার যে পরিচয় এবং অস্তিত্ব আছে—এটা সে প্রথম দিন থেকেই অগ্রাহ্য করেছে। আসলে সে বৃন্দাবনকে দয়ার চোখে দেখে। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ বৃন্দাবন সব তেজ লজ্জা ঘৃণা মান-সম্মান হারিয়ে এখন মণিহারা বৃদ্ধ ফণীর মত অথর্ব হয়ে দিন গুজরান করছে। তার পেনশনের টাকায় সংসার চলে না। মাসেব দশটা দিনও ভালভাবে কাটে না। মমতা ছোট থেকেই অভাব একদম সহ্য করতে পারে না, হাতে টাকা না থাকলে তার মাথায় বুঝি কাঁকড়াবিছে কামড়ে দেয়। সে তখন পাগলের মত হয়ে ওঠে। তার এই পাগলামী পনেব বছর আগে প্রথম টের পায় মহেশ্বর। তার তখন পঁচিশ বছরের যুবক বয়স। যৌবন ধানমাঠের ছাড়া কইমাছেব মতন ছটফটায়। উপোসী অভাবী মমতাব ফাঁদে সে ধরা পড়ে গেল। সেই যে ধরা পড়ল মহেশ্বর আজ পর্যন্ত ফাঁদ ছিঁড়ে সে বেবিয়ে আসতে পারেনি। ফাঁদটা জড়িয়ে গিয়েছে তার সবাঙ্গে। একদিকে মমতা, অন্যদিকে শোভা ধরে টানছে সেই ফাঁসের দড়ি। ক্রমশ গলায় চেপে বসেছে রশা।

আপন খেয়ালে মহেশ্বরের ডান হাতটা উঠে এল গলার কাছে। আঙুলের স্পর্শ দিয়ে সে অনুভব করতে চাইল বশাব দগদগে লালচে দাগটাকে। কিসের স্পর্শ পেয়ে শিউরে উঠল মহেশ্বর। ভীতু চোখে সে দেখল তাব জামার খুঁট ধরে টানছে পরাগ, কাকা, ঘবে চলো। মা তোমাকে ডাকছে।

পরাগের পেছন পেছন মুখ নীচু করে হাঁটতে থাকল মহেশ্বর। টিটলাগড় আলোর পোষাক পরে ঝলমলে হয়ে উঠছিল ক্রমশ।

## ।। দুই।।

ঘণ্টাশনি মন্দিরের পাশেই হাটপাদা।

মমতা ধোঁয়া ওঠা এক কাপ চা ধরিয়ে দিয়ে মহেশ্বরকে বলল, কাল রাতভোর ঘরে এলে না যে, কী ব্যাপার?

মহেশ্বর গুরুত্বহীন চোখে তাকাল। রাত জাগার ফলে ম্যাজম্যাজ করছিল তার গা-গতর। চল্লিশ পেরনোর পর থেকেই শরীরটা তার এখন বশে নেই। প্রায়ই কিছু না কিছু লেগে আছে। ডিউটির ঝামেলায় তার খাওয়া-শোওয়া বসাবও কোন ঠিক নেই। মমতা বিগত পনের বছরে ভাল মতন জেনে গিয়েছে মহেশ্বরের স্বভাব-মেজাজ। বালুগাঁও থেকে চিঠি এলে কিংবা কেউ এখানে এলে মহেশ্বরের স্বতঃস্ফূর্ততায় ভাটা পড়ে। তখন দু-নৌকোয় পা দেওয়া যাত্রীর মত তার অসুবিধা হয়, সে যেন সাঁতাব না-জানা মানুষের মত মাঝ নদীতে হাবুডুবু খায়।

মমতা চালাক মেয়েমানুষ সেইজন্য সকালবেলায় চিঠির প্রসঙ্গে আর গেল না। চা-খাওয়া শেষ হতেই সে বাজারের ব্যাগটা ধরিয়ে দিল মহেশ্বরেব হাতে, ঠোঁটে আলতো হাসি ফুটিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি হাটপাদা থেকে ঘুরে আসো। আজ শনিবার খেয়াল আছে তো? আজ আবার ভুল করে মাছ এনো না। তুমি ফিরে এলে তোমাকে নিয়ে ঘণ্টাশনির মন্দিরে পুজো দিতে যাবো।

বাজারের ব্যাগটা ধরে নিয়ে মহেশ্বব কেমন নিবিড় চোখে মমতার দিকে তাকাল। মমতার ফর্সা ছিপছিপে চেহারাটা যেন যাদুমাখা আকর্ষণের খনি, ওর টানা দিঘল চোখ দুটোয় সবসময় কে যেন পরিয়ে দিয়েছে গরম কাজল। সেই কাজলটানা চোখের ভূমিতে বিধাতা জোর করে লেপে দিয়েছে দুঃখ আর করুণতার সূক্ষ্ম প্রলেপ। এই আর্তিমাখা, আবেদনভবা চোখ দুটোই মহেশ্বরকে সদা সর্বদা আগুনপোকাব মত টেনে আনে এখানে। মমতাব স্বভাবেব মিষ্টতা, অমায়িক ব্যবহার তাব সারাদিনেব ক্লান্তিকে দূর করে দেয়। প্রাণদায়ী টনিকের কাজ করে মমতার সঙ্গ। ওই হাসিমাখা স্বপ্নিল কিশোরী প্রগলভতায় মগ্ন মুখটাকে মহেশ্বর কিছুতেই ভুলে থাকতে পারে না। কলোনীর মানুষের শত অপবাদ গায়ে সয়ে নিয়ে সে এখানে এসে নিজেকে হাল্কাবোধ করে। সম্বলপুরের কোন এক অখ্যাত বস্তিতে মমতার বাড়ি। খুব ছোটবেলায় মাকে হারায় সে। তার আগেই তার চাব দিদি পৃথিবীর আলো দেখেছে। বসরাজের ছোট ভূষিমালের দোকানটা ভাল চলত না, ধার বাকিতে তাব বস্তি লাগোয়া দোকানটা একদিন পচা নৌকার কাঠের মত অকেজো হয়ে পড়ল। রসবাজ চার মেয়েব কোন মতে বিয়ে দিলেও মমতার বেলায় গিয়ে তার গলায় কন্যাদায়ের কাঁটাটা আটকে গেল, আর ঠিক তখনই খবর এল বৃন্দাবনের। সদ্য স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে তাব। ঘব সামলানোব কেউ নেই। পুলিশের পোশাক পরে বৃন্দাবন ডিউটিতে চলে গেলে ফাঁকা ঘবেব দায়িত্ব নেবাব কেউ নেই। রসরাজ বয়স্ক বৃন্দাবনের প্রস্তাবকে ঠেলে দিতে পারেনি, নিমরাজি হয়ে সে মমতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। মমতা জলভরা চোখে সেদিন বলেছিল, বাবা, তুমি যেটা ভাল বুঝো সেটাই করো। তোমার মতই আমার মত। বিনা পণে বৃন্দাবন মমতার সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে টিটলাগড় নিয়ে গেল। বয়স্ক বৃন্দাবনের হাত ধরে মমতা যেদিন টিটলাগড় স্টেশনে নামল সেদিনই সে অনুমান করে নিয়েছিল তার ভবিষ্যৎ জীবনের রেখাচিত্র। পাকা ঘরে আছে, সরকারী চাকরি করে এমন ভাল ছেলের সঙ্গে তার কোনদিন বিয়ে হবে এটা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সে এ-ও ভাবেনি তার স্বামীর বয়স হবে পঞ্চান্ন। তার স্বামী প্রথম থেকেই হবে একটা রোগের ঢিপি। মানিয়ে নেওয়া মেয়েদের ধর্ম, স্বামীর ঘরই তার মন্দির- এই বিশ্বাসবোধে যুবতী মমতার হৃদয় ভরপুর ছিল সেদিন। বৃন্দাবনের জন্য তার শরীরে যথেষ্ট দয়া-মায়া বেঁচেছিল তখনও। বৃন্দাবনও নিজের সর্বস্ব দিয়ে আপন করে নিতে

চেয়েছিল মমতাকে। কিন্তু রাতে বিছানায় সে হাঁটু ভাঙা ঘোড়া। অবসাদে বুক ভরিয়ে বলত, জানো, এখন আর শরীর চলে না। জানো মমতা, আমার বড় খোকার বয়স তোমার চেয়েও পাঁচ বছর বেশি। মমতা কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিয়ে উঠে যেত বারান্দায়। চোখ ফেটে জল এলেও তার তো কিছু করার নেই। বুক পুড়ে গেলেও সেখানে মলম লাগাবার কেউ নেই। বিয়ের মাত্র তিন মাস পরেই নিজের অক্ষমতা বুঝতে পেরেই বিছানা আলাদা করে নিয়েছিল বৃন্দাবন। মমতা বাধা দিতে গেলে সে যুক্তি দেখিয়ে পানসে হেসে বলেছিল, রেসের ঘোড়া যদি ছুটতে না পারে তার রেসের মাঠে থাকা উচিত নয়। তুমি এসব নিয়ে আর ভাববে না।

—এত যদি জ্ঞানের নাড়ি টনটনে তাহলে আমাকে বিয়ে করলে কেন? মমতার তীক্ষ্ণ জ্বালাময়ী প্রশ্নের কোনো উত্তর জানা ছিল না বৃন্দাবনের। তবু সে কুঁইকুঁই স্বরে বলেছিল, সব মানুষই শেষ বয়সে সঙ্গী চায়। মায়া ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়েই আমাকে একা ফেলে স্বার্থপরের মতে চলে গেল। ওর সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর আগে। এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে আমি তেমনভাবে মায়াকেও সুখী করতে পারিনি। হয়তো মায়াও অসুখী ছিল মনে মনে। তবু কোনদিন সে মুখ ফুটিয়ে আমাকে কিছু বলেনি। সে তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে খুশি ছিল। তবে মায়া কোন দিনও আমাকে অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা করেনি। আমার অভাবের সংসারকে সে এতদিন ধৈর্য ধরে নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে গেছে। আমি তাকে খেতে পরতেও দিতে পারিনি। দেব কোথা থেকে? তখন পুলিশের চাকরিতে কতই বা বেতন পেতাম।

মমতা সব শুনে থ' হয়ে গিয়েছিল সেদিন, তার চোখের জল চিবুকের নীচে সাপের চোখের চেয়েও চকচকে তিলে বাধা পড়ে ভীষণ করুণ করে তুলেছিল সমগ্র সত্তা। সে ভেবেছিল—সম্বলপুরের বস্তিতে ফিরে যাবে, সেখানে না খেয়ে শুকিয়ে মরবে—সেও ভাল তবু সে আর কোনদিন বৃন্দাবনের ঘরে ফিরে আসবে না। বাবার প্রতি অভিমানে মমতার ঠোঁট ফুলে উঠেছিল ঘনঘন, সে তার এই দুর্ভাগ্যের জন্য সরাসরি দায়ী করেছিল রসরাজকে। বাবা হয়ে ঠুঁটো মানুষের হাতে তাকে না তুলে দিলেই বুঝি ভাল করত।

লেভেল ক্রশিংয়ের গেটের অদূরেই ওয়েষ্ট-কেবিন। ঝলমলে আলোয় চকচক করে রেলপাত। ক'দিন থেকে গরমের তীব্রতা একটু কমেছে। তবু বাতাসের শুকনো ভাবটা এখনও বিরাজমান। মহেশ্বর ঘণ্টাশনির মন্দির পেরিয়ে হাটপাদায় এসে দাঁড়াল থিকথিকে ভিড় না হলেও মানুষের গমগমে কোলাহল বিব্রত করে তুলল মহেশ্বরকে। আজ বাসায় এসে পরাগকে সে দেখতে পায়নি। সকাল হলেই পরাগ সাইকেল নিয়ে চলে যায় রেল কলোনীতে, ওখানে ওর ক্লাসের বন্ধুরা আছে। পরাগটা দিন দিন বড় কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছে - মহেশ্বর ভাবল। অত বড় ছেলে, এবছর মাধ্যমিক পাশ করবে তবু তার সংসার সম্বন্ধে কোন ধারনাই গড়ে উঠল না। সে জানে না কিভাবে চলছে তাদের এই সংসার। বৃন্দাবনের পেনশনের টাকায় মমতার সংসার দশ দিনও চলে না। বাদবাকি দিনগুলো কীভাবে চলে সেই খোঁজ নেবার কোন উৎসাহ পরাগের নেই। মহেশ্বরের মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল ছেলেটার দায়-দায়িত্বহীন স্বভাব তাকে যেন ক্ষেপিয়ে তুলল মনে মনে। তার রক্তের ভেতরে ঝড় উঠল হঠাৎ। সেই আচমকা ঘূর্ণিঝড়ে কাবু হয়ে গেল মহেশ্বর। পরক্ষণে সে ভাবল কার উপর সে রাগ করছে? নিজের রক্তের উপর কি মানুষ রাগ করে থাকতে পারে? পরাগ তার মুখেব আদলই পেয়েছে। পনের-ষোল বছর বয়সে মহেশ্বর কেমন দেখতে ছিল

নই অনুমান এখন তার মনে আবছা জলছবি। পরাগের দিকে তাকিয়ে সে এখন প্রায়ই
্যাকা খায়, চমকে ওঠে। খুশি হওয়ার বদলে রক্ত ঝিমিয়ে পড়ে। কলকল করে ঘামতে
াকে মহেশ্বর। বিপর্যস্ত তাকায়। তাকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়তে দেখলে মমতা বোঝায়,
া হবার ছিল, তাই হয়েছে। পরাগ না এলে আমি কাকে নিয়ে বাঁচতাম? মেয়েমানুষ শুধু
ি ভাত-কাপড় চায়? এ ভিন্ন আর যা যা দরকার তুমি আমাকে দিয়েছ। তুমি আমার মরুভূমি
ীবনে গোলাপের ফুল ফুটিয়েছ। এখন যদি আমি মারা যাই তাহলে আমার মনে কোনো
খদ নেই। আমি জানি পরাগ আমার চিতায় আগুন দেবে। এই সুখ কটা মানুষ পায় জীবনে?
মতা আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিত মহেশ্বরের মুখের ঘাম। মমতার বুকে মাথা রেখে সে হারিয়ে
যত বালুগাঁওয়ে। তখনই ঠেলে উঠত সেই অপ্রতিরোধ্য অপরাধবোধ। মমতা তাকে আশ্বস্ত
রে বলত, তুমি তো কাউকে ঠকাওনি। দিদির জন্য তুমি তো প্রতি মাসে টাকা পাঠিয়ে
াও। ওরা চিঠি লেখে, তুমিও ছুটি নিয়ে ঘরে যাও। এতে তাদের তো কোনো অসুবিধা
বার কথা নয়। দূরে চাকরি করলে এছাড়া তুমি কীই বা করতে পারতে? বাজার সেরে
হেশ্বর যখন ঘরে ফিরে আসে তখনও বারান্দায় খাটিয়ে পেতে ঝিমোতে থাকে বৃন্দাবন।
স ক'মাস হলো বাইরে বেরনো ছেড়ে দিয়েছে। বাইরে বেরলে দশ লোকে তাকে দশ কথা
ানায়, তখন কানের ভেতর বুঝি বা বোলতা হুল ফোটায়। সেই অসহ্য যন্ত্রণা সইতে-
ইতে বৃন্দাবনের এখন আর তেমন বিরূপ অনুভূতি হয় না। মমতা খুশি থাকলেই যেন
াব জীবন স্বচ্ছন্দ। ঘরের অশান্তি সে একদম সহ্য করতে পারে না। কখনও তার মনে
য় আত্মহত্যা করে মমতাকে চিরদিনের জন্য মুক্তি দিতে কিন্তু তাও সেও করে উঠতে
ারে না। মমতা তাকে কিছুতেই মরতে দেবে না। যতদিন সে বাঁচবে মমতার ঢাল হয়েই
াকে বাঁচতে হবে। এ বাঁচার কী যে মানে হয় কিছুই বুঝে উঠতে পারে না বৃন্দাবন।
টায়ারমেন্টের থোক টাকা দিয়ে পুরনো বাড়িটাকে মেরামত করেছে সে। ছেলে-মেয়েরা
উ এখন তার খোঁজখবর নেয় না। ওরাও নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে ওই বৃদ্ধ মানুষটার
যা থেকে। বড় খোকার ছানাপোনা হয়েছে, সে টিটলাগড় থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে
কে তবু একদিনের জন্য ভুল করেও বুড়ো বাপটার খোঁজখবর নিয়ে যায় না। এই আক্ষেপ
াবন কিছুতেই লুকাতে পারে না, একা থাকলে প্রায়শ ঢেকুর ওঠে। তখন বড় কোণঠাসা
য় পড়ে সে। মাথাটা ঝিমঝিম করে। পায়ের তলার মাটি সরে যায়, দু'চোখে অদ্ভুত এক
ধার ঘনিয়ে আসে। ঠিক সেই মুহূর্তে আত্মহত্যার প্রবণতা তীব্র হয় বৃন্দাবনের, কিন্তু
তার সতর্ক চোখ থেকে সে কিছুতেই নিষ্কৃতি পায় না।

জাফরির ভেতর দিয়ে রোদ এসে পড়েছে খোলা বারান্দায়। এই রোদ এক সময় চলেও
বে। তবু বৃন্দাবন সেই একইভাবে বসে থাকবে জীর্ণ খাটিয়ায়। কর্মহীন মানুষের সময়
ছুতেই যে কাটতে চায় না। মহেশ্বর এলে তবু দু'একটা কথা বলার সুযোগ পায় বৃন্দাবন।
য়ে পড়ে কথা না বললে মহেশ্বরও তাকে এড়িয়ে চলে। মমতা তাকে টাইমে-টাইমে খেতে
, তার আদর যত্নের কোনো অভাব নেই। তবে মহেশ্বর ঘরে এলে পুরোপুরি বদলে
মমতা। তখন বৃন্দাবনের উপস্থিতি তাদের কাছে কোনো সংকোচের কারন হয়ে দাঁড়ায়
।

মহেশ্বর বাজারের ব্যাগটা রান্নাঘরে নামিয়ে রেখে কাঠের চেয়ার টেনে বৃন্দাবনের

মুখোমুখি বসল। সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, বুকের ব্যথাটা কি এক
কমেছে?

বৃন্দাবন পুরনো খাটিয়ায় ক্যাচকোচ শব্দ তুলে বার চারেক কেশে নিয়ে বলল, ব্য
কি কমে, ভাই! শেষবেলার ব্যথা সব চিতায় শেষ হয়।

বৃন্দাবনের এই ব্যাঁকাতেড়া কথা মহেশ্বরের আদৌ ভাল লাগে না। সে সিগারেট ধরা
গেলে মমতা এসে বাধা দেয়।

—এখন খেও না, একেবারে জলখাবার খাওয়ার পরে খেও।

মমতা আড়চোখে বৃন্দাবনের শুকিয়ে যাওয়া মুখখানা দেখে নিয়ে বলল, ওকে আর অ
বলে বলে পারলাম না। এত দিনের স্বভাব যাবে কোথায়?

বৃন্দাবনের গলায় আক্ষেপ ঝরে পড়ল, মানুষকে কিছু না কিছু নিয়ে বাঁচতে হয়। অ
আর কী নিয়ে বাঁচব? তাই নেশা-ভাং নিয়ে বেঁচে আছি। কথাগুলো মর্মে গিয়ে বিঁ
মহেশ্বরের, ক'মুহূর্ত সে কোনো কথা না বললেও তার বুকের ভেতরটা তছনছ হয়ে
এই ক্ষুরধার কথার তোড়ে। মানুষের অভিশাপ আক্ষেপ মাথায় নিয়ে মানুষ কতদূর যে
পারে একা একা— এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর তার জানা নেই, সে শুধু জানে—তার এই নিঃ
জীবনে মমতা হঠাৎ করে না এসে যেত তাহলে শুকিয়ে চিমড়ে হয়ে যেত তার এই সাত
শবীর। শরীর মন যা চায় সেই পথ ধরেই হেঁটেছে মহেশ্বর। শুধু তাই নয় সে মমতার
দিগভ্রান্ত মেয়েমানুষকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছে জীবনের মূলস্রোতে, মমতার রাঙা ঠোঁ
হাসির দাম এখন পৃথিবীর সাতরঙা হীরের চেয়েও দামী। এত কিছুব পবেও টানাপোড়ে
কাহিল হয় মহেশ্বরের অন্তঃস্থল। মাস চারেক আগে সে বালুগাঁওয়ে গিয়েছিল। স্টেশ
নামতেই চিলকার চেনা-জানা মাছ ব্যাপারীরা তাকে ছেঁকে ধরেছিল পরম উৎসাহে, চাকু
বাবু এসেছে, আজ আমরা মিষ্টি না খেয়ে ছাড়ব না। মহেশ্বর তাদের আব্দারকে নস
করতে পারেনি। ছোটবেলার বন্ধুরা আজ মাছ ব্যবসা করে জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, পে
জন্য তাদের আর দেশ-গাঁ ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হয়নি। মিষ্টিতে কামড় দিয়ে আন
মহেশ্বর ভেবেছিল—তার মতন অসহায় দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষ আর কেউ নেই। তাদের গ্রা
কানাই মিষ্টির দোকান থেকে বেরিয়ে ফিসফিসিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ-রে মহেশ, তুই নাকি বি
বিয়ে করেছিস?

কানাইয়ের অপ্রীতিকর প্রশ্নে মহেশ্বর সেদিন গুটিয়ে এক তাল মাংসের মতন
গিয়েছিল। সহসা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেনি। কানাই বলেছিল, শোভা বৌ
মতন মানুষ আমাদের গাঁয়ে খুব কম আছে। তাছাড়া তোর মেয়ে টুনি, তারও কোনও তু
নেই। ওদের ঠকিয়ে তুই ভাল কাজ করিসনি।

ফুল ফুটলে সুগন্ধ যে ছড়াবে এতো জানা কথা। তবু মহেশ্বর তার ভেতরের অন্ত
প্রতিরোধের শক্তিটুকু হারিয়ে ফেলে প্রায়শ। সে জানে—আগুন খেলে মুখ পোড়ে।
গায়ে মাখলে মাছি ভনভনাবে। দশটা মানুষের মুখকে সে কীভাবে চাপা দেবে দু'হা
তার চোখ ফেটে জল আসে। জলভরা চোখে সে ঝাপসা দেখতে পায় তার বাবা পশুপ
মুখখানা। পশুপতির ছায়ায় মহেশ্বর যেন ঢেকে যায়।

## ।। তিন ।।

পশুপতির জীবন ছিল মহানদীর জলের মত ছড়ানো-ছিটানো যারজন্য ছবিরাণী আক্ষেপ করে বলত, টাকা পাই কিন্তু মানুষটার মন পাই না। মন পাবে কীভাবে? পশুপতির পায়েব তলায় ছিল ঘূর্ণায়মান সর্ষে, তার ছিল বদলির চাকরি ফলে বালুগাঁও থেকে তার চাকরি হল 'কে-কে' লাইনে। তখন সবে 'কে-কে' লাইনের কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, রেল কোম্পানীর ইঞ্জিনীয়াররা সার্ভে আর ট্যানেল নিয়ে ব্যস্ত। দুর্গম অরণ্য আর বুক চিতানো অসুর পাহাড়ের বুক চিরে রেললাইন পাতার কাজ গরম ভাতে ঘি মেখে খাওয়ার মত সহজ নয়। যারা ওয়ালটেয়ার থেকে কেরুন্ডুল সেকশানে যেতে আগ্রহী তাদের একটা অতিরিক্ত প্রমোশন দিয়ে পাঠানো হবে। প্রমোশনের লোভে নয়, শুধুমাত্র কাজ ভালবেসে পশুপতি গিয়েছিল কোরাপুট। কোরাপুটের টেবিল-পাহাড় তাকে ভীষণভাবে টানত, মাসান্তে ঘরে ফিরে এসে ছবিরাণীর কাছে সেই গল্প ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে করত, ছবিরাণী দু'চোখে মুগ্ধতা বিছিয়ে হা-করে শুনত সেই আশ্চর্য জগতের গল্প। আদিবাসী অধ্যুষিত কোরাপুট শহর তখন এত ফুলে ফেঁপে ওঠেনি। সারাদিনে সেখানে মাত্র একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন, এছাড়া ছিল দিনরাত অগুনতি গুডস্-ট্রেনের যাতায়াত। বত্রিশ বগির মাল ট্রেন ডবল-ট্রিপল ইঞ্জিন নিয়ে খোঁচা খাওয়া বাঘের গর্জন তুলে চলে যেত কেরুন্ডুল বা ওয়ালটেয়ার। ওয়ালটেয়ারগামী মাল ট্রেনে বোঝাই থাকত খনিজ লোহা। এখানকার পাহাড়গুলোয় ঠাসভর্তি এত আয়রন ওবস্ যা দেখে-শুনে পশুপতি নিজেই কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল। এত লোহার রসদ এদেশে আছে তাহলে কি এই দেশটা লোহার দেশ? তার এই প্রশ্ন ভুল প্রমাণ করে দিল জগদলপুরের আদিবাসী কন্যা গুরুবারি। গুরুবারি আগে ঠিকেদারের রেজা ছিল, দিন হিসাবে তার বেতন, যদিন কাজ নেই, সেদিন তার কোনো আয় নেই। রেলের কাজে আবার বদলি হয়ে পশুপতি চলে এসেছে কোরাপুট থেকে জগদলপুরে। প্রথম প্রথম নতুন জায়গায় মন বসাতে কষ্ট হচ্ছিল তার, বিশেষ করে কাজ শেষে সন্ধেবেলায় রেল কোয়ার্টারে তার কিছুতেই মন বসত না। শুধু বাড়ির কথা মনে পড়ত, ছবিরাণীর মধুমাখা কথাগুলো কানের পর্দায় বিরহের গান শোনাত। তখন চুপচাপ ঝিম মেরে খাটিয়ায় শুয়ে থাকত সে, একমাত্র ছেলে মহেশ্বরের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত চোখে ঘুম এসে যেত তার। তখন রেল কলোনীতে ভাতের হোটেল ছিল না, খেতে হলে যেতে হোত টাউনে। পশুপতি কোনদিন রাতে খেত, কোনদিন উপোসে ভোর হয়ে যেত রাত। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত এলাকায় বিনা মশারিতে ঘুমিয়ে পড়ত সে, যখন ঘুম ভাঙত তখন দেখত রক্ত খেয়ে মশাগুলো তাদের চেহারার বদল ঘটিয়ে নিয়েছে। সকালে উঠে আবার সেই কাজের তাড়া। শুধু জগদলপুর নয়, আশেপাশের স্টেশনগুলোতে প্রায়ই যেতে হোত তাকে। সারাদিন বাইরের স্টেশনে কাজকর্ম সেরে ফিরতে তার কোন কোন দিন রাত হোত। যেদিন ধস নামত পাহাড়ে সেদিন বন্ধ থাকত রেললাইন। পশুপতির সারারাত কেটে যেত গুডস্-ট্রেনের ইঞ্জিনে। এত কষ্ট ছিল তবু এ জীবনে বৈচিত্র্যের কোন অভাব ছিল না। কোয়ার্টারে ফিরে এলেই মন চলে যেত ছবিরাণীর কাছে। ছেলেটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, তার ভাবনায় কাতর হোত সে।

এরকমই চলছিল, হঠাৎ একদিন পয়েন্ট-মেসিনের কাজ করতে গিয়ে চোখাচোখি হল গুরুবারির সঙ্গে। পশুপতির শরীরে মুহূর্তে যেন বিদ্যুৎ-এর শিহরণ খেলে গেল, সেও মুগ্ধ চোখে গুরুবারির দিকে তাকিয়ে থাকল। এ এলাকায় পুরুষের তুলনায় মেয়েরাই বেশি কর্মঠ, গুরুবারি তাদের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। তবু গুরুবারির এমন কিছু ছিল যা খনিজ লোহার মত সহজলভ্য নয়। হাতের কাজ সেরে পশুপতি এগিয়ে গিয়েছিল গুরুবারির কাছে। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে শুধিয়েছিল, তুমি বুঝি রমালু ঠিকেদারের রেজা? তোমাকে এর আগেও দেখেছি। কোথায় থাক?

গুরুবারি এক চোখ লাজুক হেসে নিয়ে দেহাতী ভাষায় বলেছিল, মোর ঘর জগদলপুরে। মোর বাপ থাকে রেল কলোনীতে ঝুপড়ি বানিয়ে। সিথায় মোদের বসবাস দশ সাল হয়ে গেল।

—দশ বছর ধরে আছো? পশুপতির যেন বিশ্বাসই হয় না, সে হা-করে গিলতে থাকে বনফুলের রূপমাধুর্য। ভগবান যাকে দেয় বুঝি সব উজাড় করে দেয়। গুরুবারির গায়ের রঙ ছিল চকচকে কাচের মত, যে রঙ পাকা মহুয়াফুলের নয় আবার গন্ধরাজ ফুলেরও নয়। গুরুবারির ছিল সেগুনের সারযুক্ত শরীর অথচ কমনীয়তায় যেন মাখনের চেয়েও নরম। মানুষের চোখ যে এত গভীর, এত মায়া জড়ানো, এত হৃদয়গ্রাহী হয় সেদিনই প্রথম অনুভব করে পশুপতি। খোঁপাবাঁধা চুলে গুরুবারি অভ্যাসমত গুঁজে নিয়েছে কুরচিফুল, কুসুম তেলে জবজব করছে তার চুলের লাবণ্য। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে সেদিন গুরুবারির শরীরের সুঘ্রাণ বুক পেতে নিয়ে ছিল সে। এ এলাকার অন্য আদিবাসী মেয়েদের মত গুরুবারির গায়ে কোন জামা ছিল না, শুধু ডোরাকাটা খাটো বাসন্তী রঙের শাড়িটা বাহারী কোন লতাগুল্মের ঢঙে পেঁচিয়ে ছিল তার শরীরে। প্রতিটি পদক্ষেপে গুরুবারি যেন এই বনজ প্রকৃতির বুক চিরে উঠে আসা কোন দেবকন্যার মত বিজ্ঞাপিত করছিল নিজেকে নিজের অজান্তে। যুবক পশুপতি যেন এই লোহার দেশের লৌহচূর্ণ, তার পাশে অতি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কোন চুম্বক—ফলে বারংবার আকর্ষিত হচ্ছিল সে। বুকের গভীরে ঢেউ উঠছিল তছনছ হওয়ার কিংবা একটা বুনো ঝর্ণা গড়িয়ে নামছিল তার রক্তস্রোতে। সেদিন নিজেকে কোন দোষ দেয়নি পশুপতি কেন না রূপের সাগরের পাশে দাঁড়ালে দু'হাত তো আপসে চলে যায় জল ছুঁইছুঁই অবাধ্য ঢেউয়ের দিকে। সেও তো সব মানুষের মত ইচ্ছের দাস নিজেকে বাঁধন দিলেও আবেগের বন্যায় সংযমের বাঁধ ভাঙতে কতক্ষণ? পশুপতি হেরে গেল গুরুবারির কাছে যেদিন মেয়েটি এসে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল তার কোয়ার্টারে, বাবু মোর বুড়া বাপটা কাশরোগে মারা গেল কাল রাতে! মুই এই দুপুরতক এট্টা মানুষও পেলাম না তাকে কান্ধা দেবার। অখন মুই কী করব বাবু? মোর হাতে গুটে টঙ্কাও নেই।

সেদিন পশুপতি তার দায়িত্ব পালন করেছিল যোগ্য মানুষের মত। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পাথর দিয়েছিল বুড়া মানুষটাকে। সন্ধের সময় কবরস্থান থেকে ফেরার পথে গুরুবারি খুব অসহায় গলায় বলেছিল, বাবু, আজ থেকে মুই অনাথ হলাম। বাপ ছিল, সেও গেল। মোর অখন এই দুনিয়ায় কেউ নাই। ফাঁকা ঝুপড়িতে এই গতর লিয়ে একা শুতে মোর ডর লাগে ইখানে রাতের বেলায় হ্যাটা বাঘ ঘোরে।

—তোমার কোন ভয় নেই, তুমি আমার কোয়ার্টারে থেকো। মুখ ফসকে আবেগের ঘোরে কথাগুলো বলে ফেলেছিল পশুপতি। কথা ছুঁড়ে দেওয়া ঢিলের মত, আর ফেরে না। কথ

-রিয়ে নিলে মানুষ আর মানুষ থাকে না। তবু আকাশ থেকে পড়া গুরুবারি বলেছিল, বু, অমি যে তোমার ঘরে থাকব—এ নিয়ে হল্লা হবে সমাজে। লোকে তোমাকে দুষবে। ার আর কি, মোর তো কিছু লাই যে হারিয়ে যাবেক।

পশুপতি কপালের ভাঁজ স্বাভাবিক করে সেদিন হাত ধরেছিল গুরুবারির, আমার ঘর-সার সব আছে। সব থেকেও তোমাকে দেখার পর থেকে আমার শুধু মনে হয়েছে তোমাকে ড়া আমার এই জীবনের কোনো দাম নেই। আমি জানি — তোমাদের সমাজ তোমাকে ানদিন দাম দেবে না। তোমার যে কী দাম আর কেউ না জানুক আমি তো জেনেছি। ামার যদি কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আমার কথাটা মেনে নাও। তবে একটাই র্ত। তোমাকে আমি আর রেজার কাজ করতে দেব না। তুমি আমার ঘরে আমারই দ্বিতীয় হয়ে থাকবে। আমি যতদিন বাঁচব তোমার খাওয়া-পরা, মাথা গোঁজার জায়গার কোনো সুবিধা হবে না।

আকাশের তারা বুঝি ঠিকরে পড়েছে গুরুবারির শূন্য আঁচলে, সে দু'হাত বাড়িয়ে শুপতিকে ছুঁয়ে দিল গভীর ভালবাসায়, ঐ রাতেই সে ঝুপড়িতে টিপ-তালা লাগিয়ে উঠে ল রেলবাবুর ঘরে। দিনের পর দিন গিয়েছে, হাজার কথার তীর সহ্য করেও পশুপতি কদিনের জন্যও বিরক্ত হয়নি গুরুবারির উপর। গুরুবারিও বনভূমির কন্যার মত অকাতরে লিয়ে গিয়েছে সেবা আর প্রেম-ভালবাসা। কিন্তু দুর্ভাগ্য সে কোনদিনও মা হতে পারল শারীরিক কারণে। অনেক বড়-বড় ডাক্তার-কবিরাজ দেখিয়েও কোন সুফল পেল না শুপতি নিজেও। সন্তানহীনতার দুঃখে বড়ই কাতর ছিল গুরুবারি, সে প্রায়ই বলত, বাবু, মার খোকাটারে একদিন ইখানে এনো। আমি তার চান্‌দমুখ দেখে বুকের জ্বালাটুকু জুড়াব। রে মুই পেটে না ধরলেও সে তো মোরই ছেলে। বাবুগো, মাহিনা তুলে তুমি গুটেবার যাও, ছেলেটারে গুটেবার মোকে দেখাও। গুরুবারির এই আগ্রহ কোনো বানানো ফুলঝুরি া, তার সব কথাগুলোই ছিল রক্তনিঃসৃত হৃদয়সত্য। তাকে কথা দিয়েছিল পশুপতি কিন্তু ই কথা সে রাখতে পারেনি, তার আগেই গায়ে ধুমজ্বর নিয়ে সে ভর্তি হয়েছিল সপাতালে। ডাক্তাররা বারবার ওষুধ পাল্টেও সুস্থ করতে পারল না পশুপতিকে। ালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মাত্র পাঁচদিনের জ্বরে পৃথিবীর সব মায়া কাটিয়ে মৃতলোকে চলে গেল প্রেমিক পশুপতি। গুরুবারির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সপাতালের মর্গে রাখা হল পশুপতির নিষ্প্রাণ দেহ. বালুগাঁওয়ে খবর পাঠাল অফিসের াকে। মহেশ্বর একা এল তার বাবার সৎকাজ করার জন্য। শোককাতর, মূর্চ্ছিতা বিরাণীকে পাঠাল না গ্রামের লোকে। জগদলপুরের শ্মশানে বাবার মুখে আগুন দিল সদ্য বক হওয়া মহেশ্বর। সেদিনই সে প্রথম শুনল গুরুবারির কথা। গুরুবারি তার হাত ধরে ান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলল, বেটা, তু মোর কলিজার টুকরা। তুর বাপ হরসময় তুর কথা লে সুখ পেত। আমার নিজের কুনো ছানাপুনা নাই। তু আমার সব। তু আমার জীবন।

নতুন মায়ের বুকে মাথা রেখে সেদিনের যুবক মহেশ্বরের মনে জমা হয়েছিল প্রগাঢ় ভিমান। সে ভেবেছিল—এখানে না এলে বুঝি এই নতুন মায়ের খবর তার জানা হোত া। দু'দিন জগদলপুরে কাটিয়ে মহেশ্বর যখন বালুগাঁওয়ে ফিরে এল তখন স্টেশনে এসেছিল রুবারি। মহেশ্বরের ইচ্ছে ছিল তার নতুন মাকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামে ফেরার। কিন্তু গুরুবারিই াজি হল না। চোখের জল মুছে নিয়ে বলেছিল, বেটা, কুন মুখ নিয়ে আমি সেথায় যাব?

তোর বাপ আমাকে শাদী করেনি, আমি তার 'রাখনী' ছেলাম। তবে সেই মানুষটা আমাকে বড্ড ভালবাসত। কুনোদিন আমাকে লাল আঁখ দেখিয়ে কথা বলেনি। তার মতুন মানুষ দেশ-দুনিয়ায় বড্ড কম জন্মায়। মোর পোড়াকপাল তারে আমি ধরে রাখতে পারলাম নি। তবে সোয়ামী ক্ষুয়ালেও উপযুক্ত বেটা পেয়েছি মুই। তু মোরে দেখিস, বেটা। মোর তো এ দুনিয়ায় কেউ নেই। মোর গট্টে আশা—মরার পর মুই যেন তুর হাতের 'আগুন' পাই। তাহলে মোর মনে আর কুনো দুখ থাকবেনি।

গুরুবারিকে কথা দিয়ে এসেছিল মহেশ্বর। বালুগাঁওয়ে ফিরে সে তার মাকে বিস্তারিতভাবে বলেছিল নতুন মায়ের কথা। ছবিরাণী সব শুনে দু'দণ্ড নিঃশ্চুপ হয়ে গেলেও পরে ঘোর কাটিয়ে বলেছিল, যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে তবে সে বেচারি তো কোন দোষ করেনি। তুই আবার সেখানে যা বাবা, তোর নতুন মাকে গাঁয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আয়। তার টাকা পয়সা যা আছে সব দু'ভাগ হবে। আমি তার বউ ছিলাম ঠিকই কিন্তু তোর বাপের দেখাশোনা তোর ঐ নতুন মা-ই করেছে। খেয়াল রাখিস-তার প্রাপ্য অধিকার থেকে তাকে যেন ঠকানো না হয়।

গুরুবারিকে উসকে দিতে চেয়েছিল রেল-কলোনীর লোক। সব শুনে গুরুবারি তাদের বলেছে, মুই টাকার জন্যি মানুষটাকে ভালবাসিনি, বাবু। মানুষটার মনটাকে মুই ভালবেসেছি। সেও আমাকে তার প্রতিদান দিয়েছে। সে যদি মোকে ঠাঁই না দিত তাহলে কলোনীর হ্যাটা বাঘগুলান মোকে ছিঁড়ে খেত। সে মোরে বাঁচিয়েছে। তার পরিবারের উপর মুই কুনো অবিচার করলে তা ধর্মে সইবেনি।

—তাহলে তোমার চলবে কীভাবে? অফিসের লোকের প্রশ্নে মৃদু হেসেছিল গুরুবারি মোর দিন ঠিকই চলে যাবে, বাবু? দিন কি কারোর এটকে থাকে? ভগমান পেট যখন দিচে — দানাও দিবে।

—তাহলে পশুপতির চাকরিটা তুমি নেবে না?

—মুই কেনে লিবা? মোর ছেলে আছে, তাকে দাও। যুগ্যিমান ছেলে থাকতে কুন মা গোলামী করে বলো দেখি? গুরুবারির এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারেনি পশুপতির অফিসের বড়বাবু। তবু তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন, তোমার বয়স হচ্ছে, কিছু না নিলে চলবে কীভাবে? হাওয়া খেয়ে তো মানুষ বাঁচতে পারে না! কিছু না নাও, অন্তত পেনশনটার ভাগ নাও। আমাদের হাতে কলম আছে—তুমি চাইলে আমরা তোমাকে পেনশন পাইয়ে দেব।

গুরুবারি ডানে বাঁয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রতিবাদ করে বলেছিল, মুই আদিবাসী মায়াঝি মোর এক কথা। মুই কিছু লিবানি। কুথায় টিপছাপ দিতে হবে কও। মুই টিপছাপ দিয়ে দিচ্ছি।

দশ দিন পরে গুরুবারিকে নিতে গিয়েছিল মহেশ্বর তবু গুরুবারি এল না। তার অকাট্য যুক্তি, ইখানে, এই পাথুরে জমিনে তুর বাপ আছে, বেটা। সে তো লুহা নয়, সে ছিল মোর কাছে সোনার মতুন। এই সোনার জমিন ছেড়ে মুই কুথাও যাবনি, বাপ। তুই ঘর যা। মোর মরার খবর পেলে তু গটেবার আসবু। মোকে মাটি দিবু নি, তোর বাপের মত পোড়াবু মোর আর কিচু চাই না। টাকা-পয়সার মোর কুনো লুভ নাই। মোর শুধু শেষ ইচ্ছা- তোর হাতের যেন আগুন পাই।

পশুপতির প্রাপ্য টাকা-পয়সা পেতে মহেশ্বরের ছ'মাস লেগে গেল। সে যতবারই জগদলপুর, ওয়ালটিয়ার গিয়েছে তার সাথে গিয়েছে গুরুবারি। মহেশ্বর তাকে বারবার নিষেধ করেও পারেনি। গুরুবারি উল্টে তাকে বুঝিয়েছে, তু ফটায় ছুয়া (ছেলে)। কুথায় খাবু, কুথায় যাবু তার কুনো ঠিকলাই। তোকে একা ছেড়ে মোর জানটা কি শান্তিতে থাকবে? তুই তোর বাপের কাজে যেথায় যাবি মুইও তোর সাথে থাকব।

পশুপতির বকেয়া টাকাগুলো পেয়ে মায়ের নির্দেশে মহেশ্বর দু'ভাগ করে একভাগ তুলে দিয়েছিল গুরুবারির হাতে। গুরুবারি কিছুতেই সে টাকা ছুঁয়ে দেখল না। অর্দ্ধেক পেনশন তাও নিল না সে, অকপটে সবই লিখে দিল ছবিরাণীর নামে। তার এই ত্যাগ মহেশ্বরকে ভাবিয়েছিল প্রচণ্ড। সে জোর করে নতুন মায়ের নামে একটা পাশ বই খুলে মোটা অঙ্কের টাকা রেখে দিল। সেই টাকাও ভোগ করতে পারেনি গুরুবারি। মাত্র ছ'মাসের মাথায় সে বিছানা নিল কঠিন অসুখে। দিন ঘনিয়ে আসতেই লোককে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে সে ডেকে নেছিল মহেশ্বরকে। মহেশ্বর তখন পশুপতির চাকরিটা পেয়ে গেছে। খবর পেয়েই আবার গদলপুরে ছুটে এসেছিল মহেশ্বর। হাসপাতালের বেডে শুয়ে গুরুবারি ক্লান্ত গলায় লেছিল, মুই জানতি - মোর বেটা ঠিক আসবে? পেটে না ধরলে কি বেটা হয় না? তুর াপ তো মোকে শাদী করেনি, মুই কি তার বউ ছিলাম না?

তিনদিন পরে গুরুবারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। তার ইচ্ছানুযায়ী জগদলপুরের শানে মুখাগ্নি করল মহেশ্বর। অশৌচ পালন করল এগার দিন। শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটে যাওয়ার র হঠাৎ-ই মহেশ্বর একদিন তার মাকে বলল, জানো মা, নতুন মায়ের কথা খুব মনে ড়ে। সে যা বাবাকে ভালবাসত তার বুঝি কোন তল নেই।

## ।। চার ।।

বালাঙ্গীর জেলার নাম আগেই শুনেছিল মহেশ্বর, ভূগোল বইতে সে পড়েছে টিটলাগড়ের থাও। সেখানে যে চাকরি নিয়ে তাকে থাকতে হবে স্থায়ীভাবে এমনটা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। শুপতি মারা যাওয়ার পরেই শোভার সাথে তার বিয়ে হয়ে যায় ছবিরাণীর তাগিদে। বিয়ের পিঁড়িতে সাত তাড়াতাড়ি বসতে চায়নি মহেশ্বর কিন্তু তার অসুস্থ মা কিছুতেই কথা শুনল া। কেঁদে কেটে বলল, তোর নতুন মায়ের মতন আমি যদি সাত তাড়াতাড়ি চলে যাই তাকে কে দেখবে, বাবা! আমি যে মেয়েক পছন্দ করেছি তার মতন মেয়ে এ গাঁয়ে আর টি নেই। তার শুধু রূপ নেই, তার অনেক গুণও। সেই মেয়েই পারবে আমার এই ভাঙা ংসার নতুন করে জুড়ে দিতে।

ছবিরাণীকে হাজার বুঝিয়েও কোন কাজ হল না মহেশ্বরের, ঘটা করে তার বিয়ে হয়ে গেল শোভার সঙ্গে। শোভার যে কোন তুলনা নেই এটা সে প্রথম দিনেই টের পেয়ে গেল। ফুলশয্যার রাতে শোভা তাকে বলেছিল, তুমি পুরুষমানুষ, যেখানে খুশি যাও, আমার কোনো মানা নেই তবে আমাকে যেন কোনদিন অবহেলা করো না। যেদিন বুঝতে পারব তুমি আমাকে অবহেলা করছো, এড়িয়ে চলছো— সেদিন আমি চিলকার জলে নিজেকে ভাসিয়ে দেব।

আবেগে, ভয়ে সেদিন মহেশ্বরের ডান হাত উঠে এসেছিল শোভার পান পাতা গড়ন মুখের উপর, কোনমতে ভীতু গলায় সে বলেছিল, যার ঘরে সোনার খনি আছে—সে কি কোনদিন পেতলের কাছে যেতে পারে? বিয়ের আগে আমি তোমাকে দেখিনি, এখন বুঝতে পারছি আমার মা পাকা জহুরী। সে তোমাকে দেখে ঠিক চিনেছে। মা আমাকে ঠকায়নি। শুনে রাখো—এ জীবনে আমিও তোমাকে কোনদিন ঠকাব না। ভুল যদি কিছু করি তাহলে তোমার কাছে বলব। তুমি আমার ভুল সব শুধরে দিও।

সুখের দিনগুলো বুঝি ক্রমশ ছোট হয়ে আসে। হঠাৎ একদিন পুকুরঘাটে পা পিছলে পড়ে গেল ছবিরাণী। সেই যে সে বিছানা নিল আর উঠল না। ততদিন শোভার পেটে টুনি এসে গেছে। চাকরির চিঠিটা হাতে নিয়ে কাচুমাচু মুখে মহেশ্বর গিয়ে দাঁড়াল শোভার কাছে, কীভাবে কথাটা বলবে সে যখন ভাবছিল, তখনই শোভা তার হাত থেকে কেড়ে নিল সরকারী সিলমারা বাঁশপাতা রঙের খামটা, অতি উৎসাহে বলেছিল, আমি জানি—এই চিঠিটাতে কী লেখা আছে। পরক্ষণেই সে হাসতে হাসতে বলেছিল, এটা তোমার চাকরির কাগজ। যাক, ভাল হল। এবার নিশ্চয়ই তোমার চিন্তা কিছুটা কমবে। আর আমিও চাকুরিয়া লোকের বউ হয়ে গেলাম! রেলের চাকরি তো খারাপ নয়, লোকে মাথা ঠুকলেও পায় না। তুমি পেয়েছ। এবার তোমার রেলের পাশে জগন্নাথের দর্শনটা করে আসব। জান তো আমি মানত করেছি চোখাচোরার কাছে। তোমার চাকরি হলে আমি পায়েসভোগ চড়াব তাঁর পায়ে।

যার এত উৎসাহ সেই শোভাই ঝিমিয়ে গেল টিটলাগড়ের নাম শুনে। তার উজ্জ্বল চোখের তারায় বিষাদের ছায়া নেমে এল, আমার এই অবস্থায় তুমি চলে যাবে? হ্যাঁ গো, তুমি যাবে? আমি কী করে একা থাকব বলো তো? এক মাসে আমি যে এক মুহূর্ত তোমাকে ছাড়া থাকিনি।

শোভার দুঃখটা অন্তর ছুঁয়েছিল মহেশ্বরের, তাহলে আমি আর জয়েন করতে যাব না। কী হবে চাকরি করে যদি মনের না সুখ পাই। বাবা যা রেখে গেছে তাতে তোমার-আমার দিন চলে যাবে। আমি আবার মাছের ব্যবসায় নেমে যাব। চিলকায় যতদিন জল থাকবে ততদিন আমাদের পেটের ভাতের অভাব হবে না।

—তা বললে কী হয়? সহসা শোভা হাত ধরেছিল মহেশ্বরের, পেটের কাছে সেই পুরুষ হাত নিয়ে গিয়ে বলেছিল, এখন আর আমরা দু-জন নেই। তৃতীয়জনও আসছে। তার কথা তো ভাবতে হবে। নিজেদের ক্ষণিকের সুখের জন্য সন্তানের ভবিষ্যৎ তো নষ্ট করা উচিত হবে না। তাছাড়া যাচা লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে পাপ হয়। তুমি সব গোছগাছ করে নাও। আমার জন্য তুমি ভাববে না। আমি এদিকটা ঠিক সামলে নেব। মা আমাকে সেই শিক্ষাটাই দিয়ে গেছে। মায়ের মুখে আমি শুনেছি—বাবাও চাকরি করতে যাওয়ার সময় মাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি। মা একাই তোমাকে নিয়ে এখানে ছিল। সে যদি পারে আমি কেন পারব না। তার আশীর্বাদ সবসময় আমাদের উপর আছে। মন খারাপ করো না। দেখো সময়ই সব ঠিক করে দেবে।

আশ্চর্য মনের জোর শোভার। সে গর্ভবতী অবস্থায় দেশের বাড়িতে একাই থেকে গেল। হীরাখণ্ড এক্সপ্রেসে চড়ে ভোর পাঁচটায় টিটলাগড় পৌঁছে গেল মহেশ্বর। অফিসে জয়েন করল সেদিনই। স্টেশনের কাছেই একটা ভাড়া ঘর নিল থাকার জন্য। প্রতি সপ্তাহে শোভার

সে দুটো করে চিঠি লিখত বিরহ-বিচ্ছেদের কথা জানিয়ে। প্রত্যুত্তরে শোভা লিখত তার মনের কথা, রাতে একা শুতে খুব ভয় করে আমার। তোমার মেনিমাসী এখন আমাকে পাহারা দেয়। মাসী খুব ভাল। আমাকে চোখের আড়াল হতে দেয় না। তবু আমার ভীষণ ভয় করে। তুমি বেতন পেয়েই চলে এসো। তুমি না থাকলে এই ঘরটা বড় ফাঁকা লাগে। জানি না মা কেমন করে থাকত? আমি যে কিছুতেই থাকতে পারছি নে। এসো কিন্তু। তুমি এলে আমার চেহারা দেখে তোমার ভীষণ হাসি পাবে।

চিঠিতেই চলত মনের আদান-প্রদান। টুনি হবার সময় দশ দিনের ছুটি নিয়ে 'দেশ' গিয়েছিল মহেশ্বর, শোভা তাকে কিছুতেই নির্দিষ্ট দিনে আসতে দিল না ফলে ছুটি বেড়ে দাঁড়াল এক মাসে। মনের আশা তবু মেটে না। প্রতি মাসে ছুটি পাওয়ার ঝামেলা। ছুটি না পেলে শোভা কাউকে সঙ্গে নিযে চলে আসত টিটলাগড়ে। দিন পনের থেকে আবার ফিরে যেত বালুগাঁওয়ে। এই ভাবেই সাড়ে তিনবছর কেটে গেল। ধীরে ধীরে মহেশ্বরের মন বসে গেল পশ্চিম ওড়িশার টিটলাগড়ে। এখানকার বলবান চেহারার মানুষগুলোর সঙ্গে তার খুব ভাব জমে গেল, সে-ও এদেরই একজন হয়ে গেল ক্রমে ক্রমে। নিজের কাজের প্রতি তার ভালবাসা ছিল অসীম। ফলে পরবর্তী পদোন্নতি হতে তার কোন সমস্যাই হল না। অফিসের সবাই তাকে ভাইয়ের মত ভালবাসত, আর সেও অন্যের বিপদের দিনে সব কাজ ফেলে পাশে গিয়ে দাঁড়াত। একদিন ডিউটি সেরে ঘরে ফেরার পথে বৃন্দাবনের সাথে তার দেখা। বৃন্দাবনকে সে এর আগে চিনত না। ডিউটির ড্রেস পরা অবস্থায় মদ খেয়ে রাস্তার পাশের নালাতে পড়েছিল বৃন্দাবন। সবাই তাকে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেও মহেশ্বর তা পারল না। সে গিয়ে নালা থেকে টেনে তুলল বৃন্দাবনকে। রিক্সায় বসিয়ে তাকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিল। ফিরে আসতে যাবে তখনই ছলছলে চোখে মমতা তাকে বলেছিল, এক কাপ চা খেয়ে গেলে খুশি হতাম। আমাদের বাড়িতে কেউই আসে না, আপনিই সাহস করে প্রথম এলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে মহেশ্বর অবাক চোখে দেখছিল মমতাকে। নিখুঁত সুন্দরী মমতার চিবুকের নিচের তিলটা কালো জামের চেয়েও কুচকুচে এবং তা অতি মনোরম। মমতা যে বৃন্দাবনের কে হয় এ নিয়ে মনে কোন প্রশ্ন ছিল না মহেশ্বরের, সে তার কাঁচা বয়স অনুমান করে বলেছিল, আপনার 'বাবা' এত মদ খায়, আপনারা মানা করতে পারেন না? মমতা অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল, উনি আমার বাবা নন, আমার স্বামী। বেশিদিন আমাদের বিয়ে হয়নি, এ শহরে আমিও নতুন।

মমতার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাষা হারিয়ে ফেলেছিল মহেশ্বর, অবশেষে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিল, আমি ভুল বুঝেছি, কিছু মনে করবেন না।

মমতা কিছুতেই যেতে দিল না মহেশ্বরকে, একটু বসুন। আমি তাড়াতাড়ি চা করে আনছি। আমি আপনার বেশি সময় নষ্ট করব না।

যে বলেছিল বেশি সময় নষ্ট করবো না— এখন তার জন্যই ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কেটে যায় মহেশ্বরের। মমতা তার কোলে এলোচুল মাথা রেখে আরামের ঘুম ঘুমায়। বারান্দায় খাটিয়ায় মদের নেশায় চুর হয়ে শুয়ে থাকে বৃন্দাবন। মহেশ্বরের জায়গা হয়েছে মমতার শোবার ঘরে। কোয়ার্টার পেয়েছে মহেশ্বর, তার সেই কোয়ার্টারে বিরাট তালা ঝোলে সবসময়। মমতাই তাকে কোয়ার্টারে যেতে দেয় না, পথ আগলে বলে, তুমি যদি চলে যাও তাহলে আমিও তোমার সাথে চলে যাব। তখন লোক হাসাহাসি হলে আমাকে দোষ দেবে

না।

—লোক হাসাহাসির আর বাকি কি আছে? সবাই জেনে গেছে পরাগ আমার ছেলে। মহেশ্বরের চোখে ফুটে ওঠে শূন্যতা। মমতা সেই শূন্যতা ভরাট করে দিয়ে বলে, জানুক। সূর্য উঠলে সবাই তা দেখবে। এই দেখায় কোন পাপ নেই। তুমি একটা অসহায় মেয়েকে মা হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। সবাই পাপ বললেও তুমি যা করেছো তা তো আমার কাছে পুণ্যের। তবে আমার সামনে কেউ কিছু বললে আমি তাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেব। কোথায় ছিল এই সব মহাপুরুষরা যখন বাবা একটা বুড়োর সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দিল? কোথায় ছিল তখন এই সমাজ? আমি তোমাদের এই মেকি সমাজকে মানি না। আমি মানি তোমাকে, আমার ছেলে পরাগকে। ঐ বুড়োটাকেও মানি—কেন না সে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তার সিঁদুর এখনও আমার সিঁথিতে আছে। সে আমাকে তাড়িয়ে না দিলে আমি তার ঘর ছেড়ে কোনদিনও যাব না। সে যে আমার অক্ষম স্বামী, এটা আমার মাথায় আছে। তাই তুমি ডাকলেও আমি তোমার সাথে যাব না। যদি যাই আমার অন্যায় হবে। আমি জেনে শুনে যা করেছি তার জন্য আমার মনে কোনো আজ অনুশোচনা নেই।

মমতার জেদ টিটলাগড়ের 'গুমড়া' পাহাড়ের মত, সে ভাঙবে তবু মচকাবে না। মহেশ্বর তার চোখে দেবদূত তুল্য। সে যদি তার জীবনে না আসত তাহলে কালাহাণ্ডির অনুর্বর জমিগুলোর মত পতিত থাকত তার হৃদয়ের ভূমি। খরার দেশে সে নিজেও শুকিয়ে মরত পিপাসার জল না পেয়ে। গুমড়া পাহাড়ের চাতালের উপর গড়ে উঠেছে টিটলাগড়ের সভ্যতা, আর সেখানে মমতা ফোটা ফুলের মত নিজেকে বিকশিত করেছে মহেশ্বরের যাদু ছোঁয়ায়। গুমড়া পাহাড়ের শীর্ষদেশে যে পুরনো শিবমন্দিরটি আছে সেখানে বারবার যেত মমতা, প্রাচীন শিবলিঙ্গটিকে সে করজোড়ে প্রণাম করে বলত তার মনোবাসনা, হে বাবা বুড়োশিব, তোমার চরণে আমাকে ঠাঁই দাও। কেন আমাকে ঐ ঘাটের মড়ার হাতে সঁপে দিলে? দিয়েছ যখন তখন তুমিই পারো আমাকে উদ্ধার করতে। তা যদি না পারো তাহলে আমি তোমার চূড়ো থেকে ঝাঁপ দিয়ে এ জীবন শেষ করে দেব। বুড়ো শিবের দয়ায় মহেশ্বর যেন স্বয়ং ধরা দিয়েছে তার কাছে। সুপুরুষ মহেশ্বরের গায়ের রঙ শিবের চাইতে কম কিসের? তার ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা-চওড়া শরীরটা যে কোন নারীর কাছেই গর্বের সামগ্রী হতে পারে। মহেশ্বরের মনটা শিশুর চাইতেও সরল। এক তাল কাদাব মত সে যেন। তাকে যেমন খুশি গড়ে নেওয়া যায়। পরাগও ঠিক তার চেহারাটাই পেয়েছে। মাত্র পনের বছর বয়সে সে যেন কলাগাছকে ছাড়িয়ে যাবে উচ্চতায়। তার দিকে তাকিয়ে বড় অবাক হয় মমতা। ছেলেটা তার কোনো কিছুই পায়নি। মাথার চুলটা পর্যন্তও সে মহেশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছে। এ ছেলেকে মমতা কোনদিনও চোখের আড়াল হতে দেবে না। যে তাকে এত কিছু দিয়েছে সেই মানুষটার প্রতি মমতার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তার সুখে-দুঃখে পাশে না দাঁড়ালে বড় পাপ করা হয়। অথচ মহেশ্বর চায় না মমতা তার সবটুকু ভালবাসা তাকে দিক। বৃন্দাবনের সংসারে সে তো একটা আগাছা। গাছ মরে গেলে আগাছার কোনো মূল্য থাকে না। তাছাড়া সে নিজেও বৃন্দাবনকে ঠকাতে পারবে না। উপর দিকে থুতু ছুঁড়লে যে নিজের গায়ে লাগে—এই ভয় সর্বদা তাড়া করে বেড়ায় মহেশ্বরকে। টুনি চিঠি লিখে ঘনঘন। তার প্রতিটি চিঠিতে সেই একই কথা ঃ বাবা, তুমি কি আমাদের ভুলে গেলে? তাড়াতাড়ি চলে এসো। তোমার জন্য মন কেমন করে।

টুনি আঠারো বছরে পড়েছে, তার চেহারার এমন বাড়বাড়ন্ত দশা যা দেখে-শুনে মহেশ্বর টাকা জমাতে শুরু করেছে। মমতা বলেছে, ওর বিয়ে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে দিয়ে দেব। তুমি অত ভেবে না তো — সব ঠিক হয়ে যাবে। যতদিন গিয়েছে শোভা যেন গভীর নদীর মত, চিঠি লিখতে ভালবাসে না। টুনি জোর করলে এক ছত্রও লেখে না। কেন লিখবে? যার হাত ধরে সে এই সংসারে এল — সেই মানুষটার কি কোনো দায়িত্বজ্ঞান থাকতে নেই! শুধু মাসের প্রথমে কটা টাকা পাঠিয়ে দিলে কি স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্য শেষ হয়ে যায়? সে লোক মুখে সব খবর পেয়েছে। চিলকার জল তাকে টানলেও টুনির টানে সে কোথাও যেতে পারে না। তার পায়ে এখন স্নেহের শেকল বাঁধা। এ শেকল কাটার ক্ষমতা তার নেই। শুধু টুনির মুখ চেয়ে তার এই সংসার আঁকড়ে পড়ে থাকা। নাহলে কোনদিন বুনো পাখির মত খাঁচা ভেঙে উড়ে যেত সে চিলকার বুক ছুঁয়ে।

শোভার চিঠি পায় না বলেই মহেশ্বরের মনটা শুকিয়ে আছে। এখানকার এই গরম তার কাছে অসহ্য। অসহ্য মমতার বাড়াবাড়ি রকমের ভালবাসা। তার বাবাও নতুন মায়ের অনাবিল ভালবাসা পেয়েছিল। তার মা এসব কিছু জানত না, যখন জানল তখন মানুষটাই তো থাকল না! ফলে মায়ের অভিমান ভরা চোখ দেখতে পায়নি মহেশ্বর। তাকে দেখতে হয়নি ছবিরাণীর নীরব অশ্রুপাত। বাবা এবং ছেলের ভাগ্যও যে একই সুতোয় গাঁথা— এটা ভেবে ভীষণভাবে বিমর্ষ বোধ করে মহেশ্বর। তার মাথা গরম হয়ে ওঠে। অফিসে ছুটির দরখাস্ত লিখে সে চলে যায় বাঙালী বাবুদের নাম দেওয়া 'কুমড়ো' পাহাড়ের চূড়োয়। জাগ্রত প্রাচীন শিবলিঙ্গটি তার মনের কথা শোনে। মহেশ্বর হাতজোড় করে বিড়বিড়িয়ে বলে, হে বাবা বুড়োশিব, এ তুমি আমাকে কোন সমস্যায় ফেললে? আমি শোভাকে দুঃখী দেখতে চাই না। ঘরের লক্ষ্মী দুঃখ পেলে সে ঘরের সুখ যে উড়ে পালায়। আমি সুখ হারিয়ে বাঁচতে চাই না। আমি শোভা এবং মমতাকে সুখী দেখতে চাই। আমি আমার সর্বস্ব নিয়ে ওদের সুখ দাও। ওরা যে আমার দুটি চোখ।

## ।। পাঁচ ।।

খরায় জ্বলছিল কুমড়ো পাহাড়ের চাতাল, নেড়া পাহাড়গুলো থেকে ভাপ উঠছিল আগুনের। শিবমন্দিরের ওপাশ থেকে ছুটে আসছিল গরম হাওয়া। সেই তাতানো হাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য মহেশ্বর কানের দু'পাশটায় ভালো করে জড়িয়ে নিয়েছিল তোয়ালে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ডিউটি আসার এখন ঝামেলা অনেক। গনগনে রোদে বাইরে বেরলে মাথা তেতে যায়, সারাদিন কপালের কাছে চিনচিনে ব্যথা হয় মহেশ্বরের। আসার সময় মমতা তাকে বলল, কাঁচা পেঁয়াজ পকেটে রাখো তাহলে লু মারতে পারবে না। তার আন্তরিক কথায় মোটেও বিস্মিতবোধ করেনি মহেশ্বর, সে জানে মমতা না থাকলে এই বিদেশ বিভুঁইয়ে তার নানা ধরনের সমস্যা হোত। মমতার সব দিকে নজর, সে ফোল্ডিং ছাতাটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, ছাতাটা সঙ্গে নিয়ে যাও। যা রোদের তেজ ছাতা অনেকটাই সামাল দেবে। তবে মনে করে ছাতাটা এনো কিন্তু, তোমার যা ভুলো মন, ফেলে আসলে আর পাওয়া যাবে না।

গরম যত বাড়ছে ততই জলকষ্ট বাড়ছে শহরের মানুষের। চায়ের দোকানে কারা যেন বলাবলি করছিল, এক ফোঁটা জলের জন্য মেয়েরা কলসী নিয়ে বড় বাঁধের ধারে চলে যাচ্ছে। তেল নদীর ধারে-কাছের গ্রামগুলোয় জল নেই এক ফোঁটা। কুঁয়ো শুকিয়ে গেছে কবে, ডিপ-টিউবওয়েলের দশাও মরমর। এ সময় প্রতি বছর রেল কলোনীতেও জলের জন্য হাহাকার ওঠে। মমতা এবং পরাগ এখন রোজ মহেশ্বরের কোয়ার্টারে স্নানপর্বটা সেরে নেয়।

মহেশ্বরের ঘরের চাবি এখন পরাগের হাতে। সে রোজ সন্ধেবেলায় এসে কোয়ার্টারের আলোগুলো জ্বেলে দেয়। আলো না জ্বালালে ঘর চুরি হয়ে যাবার ঝুঁকি আছে। এর আগেও বার তিনেক ঘরের তালা ভেঙেছে চোরে, প্রতিবারই তারা মহেশ্বরের জামা-কাপড়. বিছানাপত্তর আর বাসনকোসন নিয়ে চম্পট দিয়েছে। তখন মমতার সঙ্গে রাগারাগি, কথা কাটাকাটি হয়েছে মহেশ্বরের। মমতা অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছে, তোমাকে তো কতদিন বলেছি — কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে, তুমি যখন কথা শুনবে না। তখন আমি আর কী বলব?

কোয়ার্টার ছাড়ার চিন্তা অনেকবারই মাথায় এসেছে মহেশ্বরের, কিন্তু প্রসাদবাবু রাজি নন; তিনি হুমকি দিয়েছেন, কোয়ার্টার ছাড়লে অন্যত্র বদলি করে দেবেন।

এছাড়া অন্য আর একটা কারণ মহেশ্বরকে ভীষণভাবে ভাবায়। মাঝেমধ্যে টুনি চলে আসে বিনা নোটিশে। কখনও বা শোভাও আসে তার সঙ্গে। কোয়ার্টার না থাকলে ওদের সে কোথায় রাখবে? যে ক'দিন ওরা এখানে থাকে, নিজেরাই রান্না করে খায়। মহেশ্বর বাজারহাট করে দেয়। ভাল ছেলের মতন তখন সে ডিউটি সেরে সোজা ঘরে চলে আসে কোয়ার্টারে। দেরি হলে শোভা রাগারাগি করে, টুনিও ভার মুখ নিয়ে তার সামনে আসে না। কথা না বলে সে তার বাবাকে বুঝিয়ে দিতে চায় যা হয়েছে আর নয় এবার ঘরমুখো তোমাকে হতেই হবে। ওরা এলে মমতার মাথায় বাজ পড়ে। দিনে অন্তত দু'বার মহেশ্বরকে না দেখলে তারও মাথার ঠিক থাকে না, কাজে ভুল হয়, বৃন্দাবন আর পরাগের উপর মিথ্যা রাগঝাল করে সে তার চাপা ক্ষোভজ্বালা জুড়াতে চায়।

আজ আকাশের যে অবস্থা সবখানে ঝিলমিল করে চিতার আগুন। শুধু খরা নয় অভাবের জ্বালাও কুরেকুরে খায় মানুষকে। জৌলুষ হারিয়ে মানুষের মুখ তখন পোড়া চামড়ার দলা। পশ্চিম ওড়িশার সব চাইতে দাবদাহের জায়গা হল টিটলাগড়। প্রসাদবাবু একদিন গল্পের ছলে বলেছিলেন, জানো মহেশ্বর, এই জায়গাটায় এত বেশি কেন গরম পড়ে? ইস্টার্ন-রিজিয়ানের এই টিটলাগড় একটা পাহাড়ের চাতালের উপর অবস্থিত। সেই পাহাড়টার নাম হল 'গুমড়া' পাহাড়। এখানকার স্থানীয় লোকেরা যাকে 'গুমড়া পাহাড়' বলে বাঙালীবাবুরা তাকে বলে 'কুমড়ো পাহাড়'। আসলে কি জান — এই গুমড়া পাহাড় অনেকটা চৈতালি কুমড়োর মত দেখতে। এর একদিকে সম্বলপুর, অন্যদিকে কালাহান্ডি জেলার মাথা দেখা যায়। তুমি যদি কোনদিন শিবমন্দিরের উপর থেকে কালাহান্ডির অনাবাদী জমিগুলোর দিকে তাকাও তাহলে বুঝতে পারবে একরের পর একর জমি পড়ে আছে উর্বরা শক্তি হারিয়ে। শুধু ছোট বড় বাবলাগাছ ছাড়া তুমি সেখানে আর কোন গাছ দেখতে পাবে না। সেদিন বাজারে গিয়ে দেখলাম কালাহান্ডি থেকে কাতারে কাতারে লোক এসেছে ভিক্ষার থালা হাতে নিয়ে। ওদের দেখলে আমার মনটা ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে। মনেই হয় না ওরা ভারতবর্ষের মানুষ। ওদের দেখে আমার শুধু মনে হয় দুর্ভিক্ষপীড়িত আফ্রিকার কোন অনুন্নত দেশ থেকে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছে আমাদের দেশে। ওদের হাড়জিরজিরে চেহারায় কোথাও

প্রতিবাদ লুকিয়ে নেই। দুটো মুঠো খাবার পেলেই ওরা যেন পৃথিবীর সব চাইতে সুখী মানুষ।

পেমেন্টের দিন এলেই শুধু মহেশ্বরের নয় অফিসের অনেকের মধ্যেই চাপা স্ফূর্তির স্রোতটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন কথাবার্তা, চলাফেরায় সব কিছুতেই আলাদা একটা মেজাজ নজরে পড়ে। কাবুলিওয়ালারা ভিড় করে থাকে স্টেশনের আশেপাশে, তাদের রাজদূত মোটর সাইকেল কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেয়। কাবুলিওয়ালাদের দালালগুলোর সর্বত্র যাতায়াত। তারা বলে, আসল না দিতে পারো তো সুদ দিয়ে যাও। আমার মহাজন সুদের কারবারী, আসল সে ঠিক সময় মত আদায় করে নেবে। শুধু কাবুলিওয়ালা নয় — বেতনের দিনে ঘুরঘুর করে অনেক আজেবাজে লোক। তাদের সবাই যে সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ঘোরাঘুরি করে এমনও নয়। কেউ কেউ আসে ধান্দায়। দেশি আর পোলট্রি মুরগির খাঁচা নিয়ে বসে বস্তির রামধন। পেমেন্টের দু-চারদিন তার দেখা পাওয়া যায় স্টেশন চত্বরে। মুরগি যেহেতু আসে তাই রসুন-পেঁয়াজ আর মাদ্রাজী লেবু নিয়ে বেচতে বসে বাজারের ব্যাপারী। শুধু খাবারের দোকান নয়। কাপড় আর জুতোর দোকান সাজিয়ে হাঁক-ডাক করে ছোকরা দোকানীরা। তাদের কেউ আবার 'বারমুন্ডা' প্যান্ট বেচে মাত্র ষাট টাকায় গলার রগ ফুলিয়ে। রোদ থেকে মাথা বাঁচাতে নীল পলিথিন টাঙ্গিয়ে দেয় তারা। এই দিনটা মহেশ্বরেরও ভাল লাগে কেননা উৎসবের মেজাজ ফিরে পায় রেল-স্টেশন। চা-মিষ্টি-পান-বিড়ির দোকানেও ভিড় বাড়ে। এ ছাড়াও আছে কাঁচা মদের দোকানদারদের উৎপাত। তারা তখন মদে জল পাইল করে পড়তা করে নেয় ব্যবসায়। পেমেন্টের দিনে বৃন্দাবনের এক বোতল মৌরি গন্ধযুক্ত চোলাই মদ দরকার। সাদা লম্বা বোতলটা তার হাতে ধরিয়ে দিলে সে আশীর্বাদ করার মত করে বলবে, আমার আয়ু তোমার লাগুক ভাই। এই দিনটা মাসে কেন চার-পাঁচবার হয় না? বৃন্দাবনের হালকা রসিকতা তখন মন্দ লাগে না মহেশ্বরের, সে তখন ভাবে তার যদি কোন পিছুটান না থাকত তাহলে সে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিত টিটলাগড়ের পাথুরে ভূমিতে। মমতাকে ভালবাসা তার এই ক্ষুদ্র জীবনে তেল নদীর জলের মত। মমতাকে সে কিভাবে অস্বীকার করবে? মমতার কথা তার রক্তে ডুবোজাহাজ হয়ে সর্বদা সাঁতার কাটে। এই সত্য সে শোভার কাছে মুখ ফুটিয়ে বলতে পারে না। অথচ শোভা কেমন নির্দ্বিধায় বলে দেয়, বাপ কা বেটা তুমি! মানুষের রক্ত মনে হয় কোনদিন বদল ঘটে না।

শোভা কি বোঝাতে চায় তার সবটাই বুঝতে পারে মহেশ্বর। সব বুঝেও তার মুখে কোন ভাষা নেই। যাওয়ার দিন এগিয়ে এলে বড় উতলা হয়ে ওঠে মহেশ্বর। মমতা কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, যাচ্ছো যাও তবে সাতদিনের বেশি থাকবে না। যদি সাত দিনের মধ্যে না আসো তাহলে আমি পরাগকে নিয়ে বালুরগাঁও চলে যাব। দিদির সাথে আমারও একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার। এভাবে লুকোচুরি খেলতে আমার আর ইচ্ছে করে না। যা সত্য তাকে প্রকাশ করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। আমার কিছু হয়ে গেলে পরাগের দায়িত্ব তো তাকেই নিতে হবে। আমি এই বুড়োটাকে আর বিশ্বাস করি না। দু-বোতল মদ পেলে সে আমার পরাগকে বেচে দিতে পারে। পুলিশের চাকরি করে ওই মানুষটা কত মানুষের সর্বনাশ করেছে তার মনে হয় কোনো হিসাব নেই। যদি হিসাব থাকত তাহলে পুরো টিটলাগড়ে এই মানুষটাকে নিয়ে গান বাঁধা হোত। সবাই ছি-ছিকার করত।

মমতা যা বলে তার সবটাই সত্যি। এই বৃন্দাবন মানুষটাকে মহেশ্বর প্রথম প্রথম চিনতে

পারেনি। এই মানুষটা এখনও পরের কথায় নাচে, তার রাগ ভালুকের ঘন ঘন আসা জ্বরের মত। পরাগের এক বছর বয়সে সে তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। মমতাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল জ্বলন্ত উনুনের উপর। খিস্তি দিয়ে বলেছিল, বল, এ সন্তান কার? আমি ভেসেকটমি করিয়েছি পঁচাত্তর সালে, তারপরে এ ছেলে কীভাবে হয়?

মমতা বৃন্দাবনের কাছে কিছু লুকায়নি, সে অকপটে বলেছিল, শিবমন্দিরে মানত করে আমি পরাগকে পেয়েছি। পরাগ হলো ভোলা মহেশ্বরের আশীর্বাদ। ওর যেন কোনদিন কোন ক্ষতি না হয়। তুমি যদি ওর ক্ষতি করার চেষ্টা করো কোনদিন তাহলে আমি তোমাকে গলা টিপে মেরে ফেলব। ভেবো না আমি মেয়েমানুষ বলে আমার কিছু করার নেই। শুনে রাখো তুমি যা আমাকে কোনদিন দিতে পারোনি তোমার বন্ধু মহেশ্বর আমাকে তা দিয়েছে। আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি কোনদিন তাকে অপমান করার চেষ্টা করো না। সে যদি জল হয়, আমি মাছ। জল থেকে মাছকে কোনদিন, কোনভাবে আলাদা করার চেষ্টা করো না। তাহলে ঠকবে।

এত কিছুর পরেও বৃন্দাবন মাঝে মাঝে আক্রোশে ফুঁসে ওঠে, তার পুলিশী মেজাজ বিদ্রোহ করে ওঠে মহেশ্বরের বিরুদ্ধে। অতি গোপনে সে ক্ষতি করার চেষ্টা করে মহেশ্বরের। কিন্তু তার প্রচেষ্টা বানচাল করে দেয় মমতা। ডানা ভাঙা বৃদ্ধ শকুনের মত ফুঁসতে থাকে ব্যর্থ বৃন্দাবন, সে তখন উপরওয়ালার হাতে বিচারের ভার ছেড়ে দিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকে। পরিবেশ পরিস্থিতি দূষিত হলে তাকে কীভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হয়—এসব কৌশল মহেশ্বর ভাল জানে।

সে দু-চারদিন আসা-যাওয়া বন্ধ করলেই টনক নড়ে বৃন্দবনের। পেনশনের টাকার আর কত জোর, তাতে মাসের দশদিনও চলে না । মমতা রাগারাগি করে খাওয়া বন্ধ করলে বৃন্দাবন বাধ্য হয় রেল কোয়ার্টার থেকে মহেশ্বরকে ডেকে আনতে। এরকম ঘটনা একবার নয় বহুবার ঘটেছে, এখন সবকিছুই গা সওয়া হয়ে গেছে বৃন্দাবনের, মমতা আর মহেশ্বরকে সে অবাধ অনুমতি দিয়ে দিয়েছে মেলামেশার। বৃন্দাবন বাইরে বারান্দায় ঘুমালে মহেশ্বর ঘুমায় ভেতরের ঘরে। গভীর রাতে প্রায়দিনই মমতা উঠে আসে তার খাটে, শরীরের জ্বালা মিটিয়ে ফিরে যায় ভোরবেলায়। এখন পরাগকে নিয়ে সমস্যা হয়েছে ওদের, সদ্য মাধ্যমিক দেওয়া পরাগ ঘরে থাকলে মমতা এবং মহেশ্বর দু-জনেই কেঁচোর মত গুটিয়ে থাকে। ওদের গলার স্বর তখন ওপরে ওঠে না, তখন কথা হয় চোখে-চোখে, ইশারায়।

আজ বেতনের দিন বলে মহেশ্বরের সঙ্গে এসেছে পরাগ, মমতাই কায়দা করে ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেয় সঙ্গে। যদিও মহেশ্বরের কোন বাজে নেশা নেই, বাজারে কোন ধার দেনা নেই তবু টাকার ব্যাপারে পুরুষমানুষের উপর ভরসা রাখতে পারে না মমতা। যে পুরুষমানুষের মন দু-ভাগে ভাগ করা সেখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের খেলা চলতেই থাকে সবসময়। মহেশ্বরের বেতনের টাকা না পেলে মমতার সংসার হাওয়া-বেরিয়ে যাওয়া সাইকেলের টায়ার। তাই বেতনের দিন এলেই মমতা সতর্ক হয়ে ওঠে নিজের ভেতর। পরাগকে ঠেলে পাঠায় মহেশ্বরের অফিসে। বেতন নিয়ে মহেশ্বর বাইরে এলেই পরাগের সঙ্গে চোখাচোখি হয়, মহেশ্বর হা-করে দেখতে থাকে তারই ঔরসজাত সন্তানকে। টুনি আর পরাগ যেন একই ছাঁচে গড়া একই শিল্পীর সৃষ্টি, শুধু মাটিটাই আলাদা।

প্রতিমাসেই বেতনের টাকা তিনভাগ করে মহেশ্বর, এক ভাগ তুলে দেয় পরাগের হাতে, কেমন মমতাভরা চোখে তাকিয়ে থাকে সে, ঘোর কেটে গেলে বলে, তুই কিছু খাবি?

পরাগ ঘাড় নাড়ে, এই তো টিফিন খেয়ে এলাম! আমি যাই।

পরাগ সাইকেল হাঁকিয়ে নিমেষে চলে যায় দৃষ্টির আড়ালে, তার মত ব্যস্তবাগীশ ছেলে বুঝি আর কেউ নেই এই কলোনীতে। ছেলেটা টো - টো করে ঘুরতে ভালবাসে সবসময়। সে ক্রিকেটের ভক্ত। কালার টিভিতে খেলা দেখবে বলে সে সাইকেল নিয়ে চলে আসে রেল-কলোনীতে। ঠিক মহেশ্বরের পাশের কোয়ার্টারে বাসুদের ঘরে তার নিত্য আড্ডা। বাসু এ বছর পরাগের সাথে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। ওরা দুটিতে গলায় গলায় ভাব। মহেশ্বর বলে, মাণিকজোড়।

বেতন হলে নানা ধরনের চিন্তা মহেশ্বরকে আক্রান্ত করে। তখন বেশি করে মনে পড়ে বাড়ির কথা। কখনও তার মনে হয় সে বুঝি অবিচার করছে শোভার উপর। মমতার একতরফা ভালবাসা শোভাকে অন্ধকারে সরিয়ে দিয়েছে। গ্রহণের চাঁদের মত শোভার মুখ কাতর এখন। সে সব জেনে বুঝে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে পুরোমাত্রায়। শত অনুরোধ - আব্দার সত্ত্বেও মহেশ্বর তাকে টিটলাগড়ে নিয়ে এল না। আগে কোয়ার্টার না পাওয়ার অজুহাত দেখাত, এখন আর সেই অজুহাত খাটে না। এখন সে অন্য পথ নিয়েছে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে, টুনিটার বিয়ে হয়ে যাক, তারপর বুড়ো-বুড়ি মিলে থাকব। ঘাড়ে বোঝা নিয়ে কতদূর যাবো বলো তো? শোভা এর পরে আর কথা বাড়ায়নি। মুখ আমচুর করে সে উঠে গিয়েছে সম্মুখ থেকে। যার অজুহাতের শেষ নেই, তাকে সে কী ভাবে বোঝাবে মনের ভাষা? শুধু টুনির জন্য তার সব দরজা বন্ধ নাহলে সে মহেশ্বরকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিত।

মহেশ্বরের কপালের দু'পাশ দপদপিয়ে উঠতেই পুরো শরীর জুড়ে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করল। চোখ মেলে তাকাতেই সে বিলাকে দেখতে পেল সামনে। বিলা আগ্রহ সহকারে বলল, বাবু, এরা আপনার খোঁজ করছে। বিলার পিছনে ছিল শোভা আর টুনি। ওরা হীরাখণ্ড এক্সপ্রেসে নেমেছে দশ মিনিট আগে। গাড়িটা আজ ঘণ্টা তিনেক লেটে গেল। বিলা ওদের পৌঁছে দিয়ে চলে যেতেই শোভার দিকে তাকিয়ে শুকনো হাসার চেষ্টা করল মহেশ্বর। হাসি সবসময় মনের কথা বলে না। হাসি দিয়ে মহেশ্বর তার বুকের ক্ষত লুকাতে পারল না। সে হাবুডুবু খাওয়া চোখে তাকাল। টুনিই প্রথম কথা বলল, বাবা, আমরা সেই কখন থেকে তোমাকে খুঁজছি! যাক, দেখা হয়ে ভাল হল। ঘরে চলো তো। কাল সারারাত একটুও ঘুমাইনি। গা-হাত-পা আর চলছে না। মহেশ্বর চলতে চলতে শোভার হাতটা কাঁপা হাতে ছুঁয়ে দিল, অস্ফুটে বলল, ভাল আছো তো?

শোভা কোনো জবাব না দিয়ে পথশ্রান্ত মুখটা ঘুরিয়ে নিল বিপরীতে।

## ।। ছয় ।।

কুমড়ো পাহাড়ের চূড়া থেকে সূর্যাস্ত দেখা রীতিমত ভাগ্যের ব্যাপার, টুনি এসে থেকেই জেদ ধরেছিল মাকে নিয়ে শিবমন্দিরে যাবে। ওখানকার জাগ্রত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিবলিঙ্গ স্থানীয়

মানুষের প্রত্যাশা পূরণের স্বপ্নযাদুকাঠি। টুনির শিব ঠাকুরের কাছে চাওয়ার মতো কিছু নেই, সে শুধু যাবে চোখের দেখা দেখতে, সূর্যাস্তের পর সে ফিরে আসবে ঘরে। নিমরাজি মহেশ্বর মেয়ের আব্দারকে অমান্য করতে পারল না যদিও বিকেলে তার একবার মমতার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। দুপুরের পরে পরাগ এসেছিল তার অফিসে, চুপিচুপি বলে গেল, কাকু, মা তোমাকে দেখা করতে বলেছে। আজ মুরগির মাংস হয়েছে। মা তোমার জন্য মাংস তুলে রেখেছে। তুমি বিকালে গিয়ে খেয়ে এসো।

পরাগ কথাগুলো বলে আর দাঁড়ায়নি। মহেশ্বর ইচ্ছে করেই পরাগর কাছে টুনিদের আসার সংবাদ দিল না। সে জানে—মমতা এই সংবাদে আদৌ খুশি হবে না বরং তার সুন্দর কপালে জলকেঁচোর মত নড়ে উঠবে রেখাগুলো যা তাকে আরো বয়স্ক করে তুলবে।

কুমড়ো পাহাড়ে না গেলেই নয়। তাই ডিউটির পোষাক বদলে ভাল জামা-প্যান্ট পরে নিল মহেশ্বর। এমন ফিটফাট থাকলে তার বয়স অন্তত দশ বছর কমে যায়। শোভা হা-করে দেখছিল তার ঘরের মানুষটাকে। কত কথা মনে পড়ছিল তার। একবার চিলকার তীরে বেড়াতে গিয়ে শেয়াল দেখে স্বামীর বুকে অবুঝ ভীতু বালিকার মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শোভা। মহেশ্বর তার বলিষ্ঠ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল শোভার কম্পামান মৌরিফুলের চেয়েও নরম সুডোল দেহটা। মহেশ্বরের চওড়া বুকে মাথা রেখে গ্রাম্য শোভার সেদিন মনে হয়েছিল তার নারীজীবন স্বার্থক। না চাইতেই সে শিবের মত বর পেয়েছে, একে চোখে চোখে না রাখলে যে সমূহ বিপদ সেদিন ঢেউ ওঠা চিলকার জলের দিকে তাকিয়ে মর্মে মর্মে টের পেয়েছিল সে। যাকে চোখে চোখে রাখার কথা, সেই মানুষটাই জীবিকার জন্য পাঁকাল মাছের মত নাগালের বাইরে চলে গেল। এর জন্য শোভা নিজে কতটা দায়ী সেই চুলচেরা হিসাব তার কোনদিনও করা হয়ে উঠল না। টুনি জন্মাবার পর থেকেই ধীরে ধীরে কেমন বদলে গেল মানুষটা। ঘরে আসলে সে খুব কম কথা বলত, প্রায় শুয়েই কাটিয়ে দিত, শোভা খুনসুটি করলে বিরক্তবোধ করত সে। এত ঘুম যার শরীরে সেই মানুষটা কি ওখানে ঘুমায় না? শোভা বিচলিত হোত, আশঙ্কায় দুলে উঠত বুক, মনে মনে ভয় পেত সে। টুনি চার বছরে পা দিতেই শোভা জেদ ধরেছিল টিটলাগড়ে আসার জন্যে, কাপড়চোপড়ও সে গুছিয়ে ফেলেছিল, তার ব্যস্ততা দেখে উদভ্রান্ত মহেশ্বর বুঝিয়ে বলেছিল, পরে যেও, এখন আমার অনেক ধার-দেনা। তাছাড়া প্রায় দিন আমি টিটলাগড়ে থাকি না। সিগন্যাল গ্যাংয়ের সাথে আমাকে নানা স্টেশনে ঘুরে বেড়াতে হয়। সোমবারে গেলে আমি ঘরে ফিরি শনিবারে। এই অতটা সময় তুমি বিদেশ-বিভুঁইয়ে একা থাকবে কী করে? আমার আগে একটা প্রমোশন হোক তখন কাজের এত ঝামেলা থাকবে না। আমিও তোমাকে সময় দিতে পারব। তখন হাসিমুখে যেও। আমি নিজে এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।

সেই সুখের দিনটি কোনদিনও আসেনি আজ পর্যন্ত। শোভার জেঠতুতো দাদা তপন বলেছিল, জামাইকে একা ছেড়ে দিয়ে তুই ভাল কাজ করিসনি। আজকাল যা সময় পড়েছে স্বামীকে নজরে রাখতে হয়, একটু আড়াল হলে পুরুষ মানুষের মতিগতি সব বদলে যায়। তাছাড়া আমার এখন মনে হচ্ছে—জামাইয়ের চালচলন মোটেও সুবিধের নয়। ঘরে সোমত্ত মেয়ে রেখে যে বাপ নাকে সর্ষের তেল দিয়ে ঘুমোয়, তাকে নিয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। আর দেরী না করে একবার টুনিকে নিয়ে ঘুরে আয় টিটলাগড় থেকে। টুনি তো বারকতক গিয়েছে, সে রাস্তাঘাট চেনে। তোর কোন অসুবিধে হবে না।

শুধু তপনই নয়, শোভাকে আরো কয়েকজন শুনিয়েছে মাথা পাগল করা কথাবার্তা। সন্দেহের পোকাটা শোভার অলস মনে ডিম পেড়ে বংশবিস্তার করেছে ক্রমশ। সে হেরে গেছে নিজের কাছে! টুনি তাই এখানে আসার প্রস্তাব দিতেই সে এক কথায় রাজি হয়ে গেল। এখানে এসে সে ভাল করেছে না মন্দ করেছে তা মহেশ্বরের চোখ-মুখ দেখে বিন্দুমাত্র বুঝতে পারে না। তবে সে এটুকু বুঝেছে আগের সেই স্নিগ্ধ সরলতা মহেশ্বর কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে। শোভার মনে হয় শুধু সরলতা নয়, তার ঘরের মানুষটি বিগত বছরগুলোতে তিল তিল করে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। সে যে কিছু লুকাতে চায় তার সারা শরীর বলে দেয়।

রেল-ব্রিজের কাছে মহেশ্বর টুনিদের দাঁড় করিয়ে পান খাওয়ার নাম করে সোজা চলে যায় মমতার ঘরে। তাকে দেখে মমতার যেন ধড়ে প্রাণ সঞ্চার হয়। সে আবেগমথিত স্বরে বলে, দুপুরে খেতে এলে না যে? কি হয়েছে? তোমাকে এমন উসকো খুসকো দেখাচ্ছে কেন?

মহেশ্বর সংক্ষেপে জবাব দিল, টুনিরা এসেছে। ওরা ক'দিন থাকবে জানি না। তবে ওরা যতদিন থাকবে আমাদের একটু সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। তুমি পরাগকে আর আমার কোয়ার্টারে পাঠাবে না। শোভা ভীষণ চালাক। ও একবার পরাগকে দেখলেই অনুমান করে নেবে। আমি যাই, ওরা রেল-ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দেরী হলে চিন্তা করবে।

— কোথায় যাচ্ছো তুমি? মমতা তার পথ আগলে দাঁড়াল, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো। এই লুকোচুরি আমার আর ভাল লাগছে না। এর একটা সমাধান হওয়া দরকার। আমি দিদিকে ব বলব। বুঝিয়ে বললে সে নিশ্চয়ই আমার কথাকে গুরুত্ব দেবে। আর যদি গুরুত্ব না দয় তাহলে আমিও তাকে দশ কথা শুনিয়ে আসব। আমি আর কাউকে ভয় পাই না।

—তুমি কি পাগল হলে? কুঁয়োয় হারিয়ে যাওয়া মানুষের মত গলা মহেশ্বরের। মমতা াকে কোনো পাত্তাই দেয় না; জোর করে বলে, আজ পনের বছর আমি তোমার সুখে-ুখে আছি। তুমি আমাকে শাঁখা-সিঁদুর না দিলেও একটা পুত্র সন্তান তো দিয়েছো। এর কি কানো দাম নেই? বলো, আজ তোমাকে বলতেই হবে?

বিরক্ত, বিপর্যস্ত মহেশ্বর মমতাকে দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দিল দূরে, তারপর মাথা নীচু রে বেরিয়ে এল বাইরে।

বৃন্দাবন খাটিয়ায় বসে ওদের কথোপকথন সব শুনেছে, সে আর থাকতে না পেরে বলল, দল তো তোমার সুন্দর মুখে কালি ছিটিয়ে? আমি জানতাম এরকম একদিন হবেই হবে। াসলে কি জান — তোমার প্রতি ভালবাসাটা শরীরের, মনের নয়। যদি মনের হোত তাহলে স কোনদিন তোমার মনে দুঃখ দিয়ে কথা বলত না। যাকে ভালবাসা যায় তাকে কোনদিন আঘাত দেওয়া যায় না।

—তুমি চুপ করবে? ঘেমে-নেয়ে ধমকে উঠল মমতা, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলো না। দেশী মদ খেয়ে-খেয়ে তোমার বিচার-বুদ্ধি দেশী ছাগলগুলোর মত হয়ে গেছে। তোমার মুখ দেখতেও ঘেন্না হয়।

—তা ঠিক, এই ছাগলই তোমাকে বাঘের সাথে আলাপ করিয়ে দিয়েছে। সেই বাঘের পটে তুমি যদি স্বেচ্ছায় ঢুকে পড়তে চাও সেটা হবে তোমার বোকামি। বৃন্দাবন খুক খুক রে কাশল। একটা বিড়ি ধরিয়ে গন্ধে ভরিয়ে দিল ঘর।

মমতার মুখে কোনো কথা নেই, সে মাথা নীচু করে জগন্নাথের ফটোর সামনে গিয়ে াড়াল। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে কী ভাবে ঝটপট বদলে নিল পরনের শাড়ি। তারপর

দিগভ্রান্ত মানুষের মত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সে কোথায় যাবে, কী করতে যাবে—এসব কোন কিছুই তার মাথায় এল না। শুধু এলোমেলো পায়ে সে হেঁটে গেল কুমড়ো পাহাড়ের দিকে।

শিবমন্দিরের চারপাশের পরিবেশ বড় মনোরম। এখানে পাপীরা এলেও তাদের মনের কিঞ্চিত পরিবর্তন হতে বাধ্য। ঘোড়ানিম আর শিমুলগাছের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেছে শহর কমা আলোয় পাহাড়ের চূড়ো থেকে নীচের পৃথিবীটাকে মনে হয় স্বপ্নলোক। টুনি পশ্চিমের সূর্য ডুবে যাওয়া দেখছিল। আকাশের বিরাট লাল টিপটা ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছিল কালাহান্ডির ধূ-ধূ প্রান্তরে। রক্তিম আভায় ভরে উঠেছে বিস্তীর্ণ পথঘাট। ছোটবড় টিলার ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বিচ্ছিন্ন ভাবে বেড়ে ওঠা গোটা কতক বাবলাগাছ। মাঠের পর মাঠ ছড়িয়ে শুধু নিষ্ফলা আর অভিশপ্ত সৃষ্টি। ওখানে কেউ কোনদিন লাঙলের ফাল স্পর্শ করেনি অনাবাদী জমির উপর ছড়িয়ে পড়েছে ক্লান্ত সূর্যের আভা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়বে ধরিত্রীর বুকে। টুনির চোখে আঁকা হয়ে যায় অপার্থিব দৃশ্যের অতি মনোরম এক ছবি। সে পিছন ঘুরে তাকিয়ে দেখল তার মা যেন কার সাথে কথা বলছে অত্যন্ত নীচু গলায়। কে ঐ মহিলা? টুনি স্বপ্নভঙ্গ বালিকার মতো ছুটে গেল সেই দিকে। নিশ্চিন্ত হলে সে। শোভা কথা বলছিল তারই বয়েসী বা তার চেয়ে বয়সে ছোট একজন মহিলার সঙ্গে পাশে দাঁড়িয়েছিল মহেশ্বর, সে দু'জনের কথা শুনছিল ভীতু বুকে। এক সময় কথা শেষ করে মমতা নেমে যায় নীচে। পকেটের রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছে নেয় মহেশ্বর। বারুদের কাছে আগুন এলে জ্বলে উঠারই কথা। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে শোভা শুধোল, গায়ে পড়ে যে বউটি আমার সাথে ভাব জমাল তাকে তুমি চেনো নাকি?

মহেশ্বর অনাবশ্যক ঢোক গিলে বলল, চিনব না কেন? এক জায়গায় আঠার বছর থাকলে সবাই সবার চেনা হয়ে যায়।

—আমি যা ভাবছি— এই বউটা কি সেই? শোভার প্রশ্নে এবার হোঁচট খেল মহেশ্বর আমতা আমতা করে বলল, তুমি কি ভেবেছ তা আমাকে খুলে বলো। আমি তো অন্তর্যামী নই!

শোভা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, এর নাম কি মমতা?

মহেশ্বর বিচলিত হলো, তুমি কি করে চিনলে?

— চেনা যায়। শোভা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, ওর কথাবার্তায় অধিকার হারিয়ে যাওয়া দুঃখ। তুমি ওকে বুঝিয়ে বলো—আমরা কালই চলে যাব।

—তা কেন? তুমি থাকো।

—এক আকাশে দুটো চাঁদ ভাল দেখায় না। তাছাড়া আমার বয়স হচ্ছে। এখন লোক হাসাহাসি করে লাভ নেই। শোভা শাড়ির খুঁটে চোখের কোণ মুছে নিল, বুড়ো শিবের কাছে বলেছি—টুনিটার বিয়ে হয়ে গেলে যেদিকে মন চায় চলে যাবো।

—আমার কাছে আসবে না?

—যখন আসার কথা তখনই যখন সুযোগ হলো না, এখন এই শেষ বেলায় এসে তোমাকে অসুখী করতে চাই না। শোভার কণ্ঠস্বর বুজে এল তরল কান্নায়, নিজেকে কোনমতে সামলে নিয়ে বলল, কালই আমাদের ট্রেনে তুলে দিও। এখানে থেকে কারোর দীর্ঘশ্বাসের কারণ হবো

আমি পারব না।

পায়ে পায়ে পথ ফুরোয়। রেল স্টেশনের বাতিগুলো জ্বলে ওঠে। সিকিরের ওপাশ থেকে ছুটে আসে ঠাণ্ডা হাওয়া। সেই আর্দ্র হাওয়া যেন আগাম বৃষ্টির সংকেত বয়ে আনে। ভেজা কাঠের গন্ধ ভাসে হাওয়ায়। সেই গন্ধভরা বাতাসে মহুয়ার মাদকতা। এই অপার্থিব গন্ধ নিয়েই বুঝি থাকে মানবজীবন।

কোয়ার্টারে ফিরে এসে বড় চুপচাপ হয়ে গেল শোভা। টুনি শাড়ি বদলে তার মায়ের পাশে গিয়ে বসল, মা, তোমার কি মাথা ধরেছে? আমার কাছে মাথা ধরার ট্যাবলেট আছে — খাবে?

শোভা কেমন ঘুম জড়ানো চোখে তাকাল, সব মাথা ধরা কি ট্যাবলেট খেয়ে সারে রে? আমাকে একটু একা থাকতে দে। অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে থাকলে মাথা ধরা আমার আপসেই কমে যাবে। আজ খুব ধকল গেল। এর আগে পাহাড়ে তো কোনদিন চড়িনি। পাহাড়ে না চড়লে নীচের জগতকে চেনা যায় না।

দু'কামরার কোয়ার্টারে আলোর অভাব নেই, মাথার উপর পাখা ঘোরে বনবনিয়ে, তবু চেয়ারে বসে এক নাগাড়ে ঘামছিল মহেশ্বর। তার মুখে কোন কথা নেই। চা করে আনল টুনি। বাবার পাশে বসে বলল, তোমারও কি মাথা ধরল নাকি? যদি মাথা ধরে থাকে তাহলে গরম গরম চা খেয়ে নাও। আমি মা'র জন্য চা বানিয়েছি। মায়েরও ভীষণ মাথা ধরেছে।

মহেশ্বরের কিছু ভাল লাগছিল না। মমতার উপর বেজায় ক্ষেপে আছে সে। মমতার কি মাথাটা বিগড়ে গিয়েছে? এত সাহস না দেখালেই ভাল করত সব সম্পর্ক যে লতানো ফুলগাছের মত হবে এটা সে কী করে ভেবে নিল। শোভার কাছে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেছে মহেশ্বরের। সে এখন কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবে শোভার সামনে। পৃথিবীর সব কালি যেন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মহেশ্বরের বলিরেখা ফুটে ওঠা মুখমণ্ডলে। টুনির এসবে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। সে কারোর পায়ের শব্দ শুনে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। একশ' ওয়াটের বাল্‌ব-এর আলোয় সে এই প্রথম দেখল পরাগকে। পরাগ ইতস্ততঃ গলায় শুধোল, কাকু আছে?

টুনির মুখে কোন ভাষা নেই, সে যতই পরাগকে দেখছে ততই যেন বিস্ময়ের সাগরে তলিয়ে যাচ্ছে। এ সে কাকে দেখছে? সাইকেলের স্ট্যান্ড দিয়ে যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে তার মুখখানা যেন তার বাবার মুখের জলছবি? এ কি করে সম্ভব? টুনি আর ভাবতে পারছিল না। সে কিছু বলার আগে পরাগ আবার বলল, তুমি বুঝি কাকুর মেয়ে? মা তোমাদের জন্য মাংস রেঁধে পাঠিয়ে দিয়েছে। এটা ধরো। আমি আর দাঁড়াবো না। আমাকে যে অনেকটা পথ যেতে হবে। পরাগ জোর করে বড় টিফিন কৌটোটা ধরিয়ে দিল টুনির হাতে, আমি আবার কাল আসব। আজ যাই। মা আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছে। সন্ধেবেলায় আমি কোথাও বেরই না, মা খুব চিন্তা করে। পরাগ চলে যেতে চাইলে টুনি তার পথ আগলে দেয়, বারান্দার নীচে নেমে এসে সে সাইকেলের হ্যান্ডেলে হাত রাখে; চিৎকার করে ডাকে, মা, মাগো দেখে যাও কে এসেছে!

শোভা যন্ত্রণা ভুলে ছুটে এল বাইরে, পরাগের মুখের দিকে তাকিয়ে সে যেন কৈশোর পেরনো মহেশ্বরকে খুঁজে পেল। তার বুকের বাগানে স্বস্তির বাতাস বয়ে গেল ধীরে ধীরে। স্নেহ-ভরা হাত দিয়ে সে ছুঁয়ে দিল পরাগের হাত। পরাগ টিপ করে প্রণাম করতেই শোভা

তাকে জড়িয়ে ধরল বুকে । গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, বাবা, তোমাকে দেখে আজ আমার প্রাণটা জুড়িয়ে গেল। তুমি আমার সাথে বালুগাঁও যাবে? ওখানে তোমার দিদির সঙ্গে থাকার কেউ নেই। আমি একা মেয়েমানুষ কত দিক আর সামলাব। তোমার কাকু তো এখন ন'মাসে ছ'মাসে ঘরে যায়। তুমি গেলে আমাদের সাহস বাড়ে।

অপ্রস্তুত পরাগ বলল, আমি কেন বালুগাঁও যাবো? সেখানে তো আমার কেউ থাবে না! তাছাড়া মা আমাকে কোনদিনও চোখের আড়াল হতে দেয়নি। আমি চলে গেলে মায়ের ভীষণ কষ্ট হবে।

— তোমার মায়ের চেয়েও যে আরেকজন আরো ভীষণ কষ্টে আছে। তুমি কি সেই মায়ের কথা ভাববো না? শোভার গলার স্বর কেঁপে উঠল।

মহেশ্বর পরিস্থিতিকে সামাল দেবার জন্য এগিয়ে এলে শোভা বলল, আমি হেরে গেছি জিৎ তোমার আর মমতার হলো। এবার ঘরে গিয়ে শান্তিতে মরতে পারব। মরলেও আমার আর কোনো দুঃখ নেই। এত দিন যে দুঃখ ছিল পরাগ সেই দুঃখ আমার দূর করে দিয়েছে আমি মরলে ও আমার চিতায় আগুন দেবে।

তারায় ভরা আকাশের নীচে আবেগের নদীটা বয়ে যায় সন্তর্পণে। বাতাস বয়ে নিয়ে যায় আত্মজ'র সুগন্ধ। গুমড়া পাহাড়ের শিবমন্দির সত্যিই ভীষণ জাগ্রত। বুড়ো শিব কাউকে খালি হাতে ফেরায় না। পরাগকে বুকে জড়িয়ে ধরে শোভার মনে হয়—তার আর কোনো দুঃখ নেই। এত বছর ধরে হারতে হারতে সে জিতে গেছে শেষ সময়।

---

# ছায়াপথ

হাসপাতালের মাঠ ছাড়িয়ে টেম্পুটা ধীরে ধীরে বড় আমগাছটার ছায়ায় এসে দাঁড়াল। গুরুপদ গা ঝাড়া দিয়ে আড়মোড়া ভেঙে কাননকে বলল, এবার নেমে পড়। আমরা এসে গেছি। ঐ যে বকফুল গাছওলা ঘরটা দেখছ ওটাই আমাদের ঘর।

কানন শাড়ি গুছিয়ে চুল ঠিক করে ভাঙাচোরা ঘরখানার দিকে তাকাল। বুক ভেঙে গেল তার, হুড়মুড়িয়ে কষ্ট এসে জড়ো হল মুখের উপর। এই প্রথম শূন্যতার সাপ ছোবল মারল স্নায়ুতন্ত্রে, শিথিল হয়ে এল তার গা-হাত-পা। করিমপুর ছেড়ে এখানে আসতে হবে স্বপ্নেও সে ভাবেনি। মানুষ যা ভাবে তা অনেক সময় ঘটে যায়। দেরী দেখে গুরুপদর কপালে ভাঁজ পড়ল, কই গো নামো। তাড়াতাড়ি করো। মালপত্র যে নামাতে হবে।

সামনের সীটে ড্রাইভার ছাড়াও গাদাগাদি করে বসেছিল ওরা তিনজন। ইরা একেবারে মাঝখানে। গুরুপদ বসেছে দরজার সামনে। বাবার বোকামি প্রত্যক্ষ করে ইরা ঠোঁট টিপে হাসল, তুমি বসে থাকলে মা নামবে কী ভাবে? আগে তুমি নামো, তারপর তো আমরা নামব।

নিজের বোকামি গায়ে মেখে গুরুপদ হা-হা করে হাসল, হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস তুই। আমি আগে না নামলে তোরা নামবি কীভাবে। কথা শেষ হল না টেম্পুর ডালা খুলে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল গুরুপদ। তার দেখাদেখি ড্রাইভার সীটে বসে থাকা জয়দেব নেমে পড়ল তড়িঘড়ি করে। গা-হাত-পায়ের গিঁট ফুটিয়ে চিৎকার করে সে বলল, এ কানাই, হা করে দেখছিস কী, নেমে পড়! মালপত্তর হেভি আছে। লট-ঘট করলে বেলা বাড়াব।

কানাই টেম্পুর খালাসি, জয়দেবের চিৎকার শুনে এতটুকু হয়ে গেল তার মুখ। রোগা লিকলিকে শরীর নিয়ে সেও নেমে পড়ল নীচে। বিড়ি খাওয়া কালচে দাঁত বের করে বলল, জয়দেবদা, ঘাবড়াও মাৎ। আমি যখন আছি তখন তোমার অত চিন্তা কিসের? এক টেম্পু মাল খালাস করতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগবে না।

আড়ষ্টতা কাটিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল জয়দেব, ভকভক ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কথা কম কাজ বেশি। যা আর লেকচারবাজি না করে কাজে লেগে যা। সময় কম। আমাদের আবার অতটা পথ ফিরতে হবে।

কানন টেম্পু থেকে নেমেই হা করে চেয়েছিল ঘরের দিকে, ইরা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, মা, অমন করে কী দেখছ গো?

চমক ভাঙল কাননের, পানসে হেসে বলল, ঘরখানার যা ছিরি হয়েছে, ওখানে কীভাবে থাকব বল তো? দেখে তো মনে হচ্ছে পোড়াবাড়ি।

পছন্দ না হলেও আমাদের ওখানে থাকতে হবে।

ইরার কথায় সুখী হল না কানন, মুখ ঘুরিয়ে নিল বিরক্তিতে। ইরার ওসবে ভ্রুক্ষেপ নেই, দামাল কিশোরীর মতো সবার আগে সে ছুটে গেল বকফুল গাছটার কাছে। তারজালিতে ঘেরা সামনের বারান্দা। কমা কাঠের দরজা হাটখোলা। বুনো আগাছা জড়িয়ে আছে ঘরের চারপাশ। সবখানে শুকনো পাতার বিছানা পাতা। লতানে গাছও কম নেই।

হাওয়ায় দুলছে লিকলিকে সাপের মতো। ইরা হা করে দেখছিল সব। বুক ভরে শ্বাস টেনে নিল বুনো গন্ধের। বুকের ধড়ফড়ানীকে চাপা দিয়ে সে ক' পা এগিয়ে যেতে চাইলে তার জামফল চোখের তারায় হিসহিসিয়ে উঠল ফণাধারী সাপটা। ভয়ে ক' হাত পিছিয়ে এল ইরা। গলা দিয়ে স্বর বেরল না। থরথরিয়ে কেঁপে উঠল সারা শরীর। কাঠগলা ফাড়িয়ে চিৎকার করে উঠল সে, এ পল্টু, দেখে যা কত বড় একটা খরিশ সাপ!

'সাপ' শব্দটায় বুঝি যাদু আছে। শব্দটা কানে যেতেই পড়িমড়ি করে ছুটে এল পল্টু তার হাতে ঢোলকলমীর ভাঙা ডাল। ইরার পাশে দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছিল সে, কই রে, দিদি সাপ কোথায়?

কথা বলার মতো অবস্থায় ছিল না ইরা, সে শুধু তর্জনী উঁচিয়ে পাল্লা ভেঙে পড় রান্নাঘরটা দেখিয়ে দিল। তারপর ভিতু পায়ে সরে দাঁড়াল দূরে।

সব দেখে-শুনে পল্টু বলল, জাত সাপ! হেভি জিনিস! ওর কাছে ঘেঁষতে গেলে বড় লাঠির দরকার। মাথা নয়, মাজায় মারলে তবে যদি কাবু হয় সাপটা।

কানাই এই ফাঁকে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে, পল্টুকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিয়ে বলল জাত সাপ মারা যার তার দ্বারা হবে না। দাঁড়াও ওস্তাদকে ডাকি। ওস্তাদ ওর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে।

জয়দেব এল লোহার রড হাতে। তার স্টিয়ারিং ধরা কড়া পড়া হাত। ঘামে ভিজে গেছে বুক-পিঠ। হাত নেড়ে সে বলল, তোমরা সব সরে দাড়াঁও। আমি দেখছি এ ব্যাটাকে কীভাবে জব্দ করা যায়।

ছানাকাটা দুধের মতো এদিক ওদিক ছড়িয়ে গেল সবাই। জান বাজি রেখে জানালার দিকে এগিয়ে গেল জয়দেব। ফণা তোলা সাপটার তবু যাওয়ার কোনো নামগন্ধ নেই সেও প্রস্তুত লড়াইয়ের জন্য। জং ধরা জানালার শিক পেঁচিয়ে সে বার কতক ফণা তুলল শূন্যে। ক্রোধগর্জন ভাসিয়ে দিল বাতাসে। ইরার বুক ঢিসঢিসিয়ে উঠল।

কানাই দূরে দাঁড়িয়ে সতর্ক করে বলল, ওস্তাদ, সাবধান। মাজা লক্ষ্য করে মারো মাজা ভেঙে গেলে সাপ কেন রাক্ষস চুঁ-চাঁ করতে পারবে না।

জয়দেব হারবে না, হারার জন্য সে এতদূর থেকে ছুটে আসে নি। ইরার চোখে চোখ ফেলে সে এক ঝলক বীরের কায়দায় হাসল। তারপর হাতের রড বাগিয়ে তাক করে মারল পিচ্ছিল সাপের কোমরে। ধাতব শব্দ হল জানালার শিকে। ভয়ে চোখ বন্ধ করে ইরা। মাজা ভাঙা সাপটা বার দুই ফোঁস ফোঁসানী করে পাকা ফলের মত ছিটকে পড়ে মাটিতে। জয়দেবের রড তাকে আর ক্ষমা করল না, বার কতক ওঠানামা করল ঘনঘন

কানাই ছুটে গেল জয়দেবের কাছে, ওস্তাদ, আর মেরো না, ওর দফারফা। হাতের রডটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে জয়দেব বলল, যা এবার এর সদ্‌গতি করে ফেল। পাতা জড়ো করে পুড়িয়ে ফেল সাপটাকে। রডে রক্ত লেগেছে। ওটাও ভালভাবে পোড়াস। কাজের জিনিস, ফেলে দিতে তো পারি নে।

ইরা হাঁ-করে চেয়ে চেয়ে দেখছিল জয়দেবকে। চাহনিতে ভরা আছে সংকোচ। জড়তা মাখামাখি শরীর। জয়দেব না থাকলে যে কী হোত আজ! শুধু আজ কেন, এর আগে তো জয়দেব তাদের বাঁচিয়েছে। বদলির অর্ডারটা আসার পর ভেঙে পড়েছিল গুরুপদ পাওনাদাররা ছেঁকে ধরেছিল তাকে। জয়দেব না থাকলে গায়ে হাত তুলতে পিছপা হোত

না ওরা। সবার টাকা চাই সাতদিনের মধ্যে। নাহলে গুরুপদর ঠ্যাং ভেঙে দেবে ওরা। কথাগুলো শুনে অপমানে কানের লতি, কচি মুখ লাল হয়ে ওঠেছিল ইরার। এর টাকা গুরুপদ কোথায় পাবে? পুরো সংসার বিক্রি করে দিলেও ধার শোধ হবে না। সেই দুর্দিনে অভয় দিল জয়দেব, ভয় নেই, আমি থাকতে কারোর সাহস হবে না চোখ তুলে তাকাবার। আমি তাহলে চোখ উপড়ে নেব ওদের। আমাকে তো চেনে না, আমি ভালোর ভালো, আর মন্দের যম।

জয়দেব গায়ের জোর খাটায় নি, সে টাকা শোধ করে দিয়েছে সবার। সেই থেকে গুরুপদর সংসারে তার অবাধ যাতায়াত। কাননও চায় জয়দেব আসুক। ঝাঁকের কইমাছের মতো মিশে যাক। এতে তার সুবিধে। ঘাড়ের উপর সোমত্ত মেয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। ঘাড় থেকে নামিয়ে হাত হলুদ করে দেবে এ ক্ষমতা গুরুপদর নেই। সব দেখেশুনে সেও বোবা। অথচ ইরার মুখ ধার দেওয়া তরোয়াল। সে কাউকে ভয় করে না। সে তো বাজারের পচা মাছ নয়। সে হল জিয়লমাছ। তাকে ঘাঁটতে এলে বিষকাঁটা ঢুকিয়ে দেবে গায়ে। বিষে জ্বলবে শরীর। তখন?

সাপের সদ্‌গতি হল ধূমাধাম সহকারে। কানাই লাঠির ডগায় সাপটা তুলে নিয়ে চলে গেল ভাঙা পাঁচিলের গোড়ায়। শুকনো পাতায় জ্বলে পড়পড় করে পুড়ল সাপের চর্বি মাখানো শরীর। বিষ ছিটিয়ে এল আগুনের উত্তাপে। জয়দেব দূর থেকে দেখল সব। সে ভেবেছিল ইরা এসে বাহবা দেবে। মুখ ভরিয়ে কথা বলবে। ইরা এল না, উন্মনা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল দূরে।

গুরুপদ বিষণ্ণ কাননকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, মানুষ যেখানে, সাপও সেখানে। সাপকে এত ভয় পেলে চলে! তুমি এখানে থাকো। আমি যাই চাবিটা নিয়ে আসি।

গুরুপদ চলে যেতেই ইরা হেঁটে এল কলতলায়। চার পাঁচ ঘণ্টায় তার চেহারার যা হাল হয়েছে তা আর চোখে দেখার মতো নয়। ঘাম চ্যাটচ্যাট করছে মুখে। কুঁচো চুল জড়িয়ে গেছে আঠালো কপালে। হাতের তালুতে চ্যাটচেটে ময়লা। আঁচলে মুখ ঘসলে কালো হয়ে যায়। রাস্তায় ধূলো বালি শরীর ছেড়ে যেতে চায় না। ওদের দূর দূর করে তাড়ান দরকার। রাস্তার ধূলো রাস্তাতে মানায়। শরীরের দখল চাইলে সহসা সে-ই বা মেনে নেবে কেন?

কলতলায় দাঁড়িয়ে বেলা কত হল পড়বার চেষ্টা করল ইরা। মেয়েদের বয়সের মতো অনেক সময় বেলার বয়স আন্দাজ করা যায় না। তবে মাথার উপর ঘোলাটে সূর্য আছে। গাছের পাতায় ঝলমলে রোদ না থাকলেও কনে দেখা আলো আছে। ঠাস বুনোট ঘাসের উপর ছড়িয়ে পড়েছে আলো। আমগাছতলায় আলোর ডিম। ছায়ার ভেতর গর্ভের সন্তানের মতো স্পষ্ট হয়েছে আলো। এদিকের হাওয়া ঘাম চেটে নেবার ক্ষমতা রাখে। বিলটু ইরাকে দেখে কলতলায় এল। ঢোক গিলে বলল, দিদি, জায়গাটা তোর কেমন লাগছে রে?

একবেলা দেখে কি কিছু বলা যায়। ইরার পাতলা ঠোঁটে সেজে উঠল হাসি।

বিল্টু দূরের দিকে তাকাল, দেখ কত বড় বাঁশঝাড়! করিমপুরে এত বড় বাঁশঝাড় নেই। তুই কী বলিস দিদি?

ইরা কথা না বলে বিল্টুর মুখের দিকে তাকাল। বয়স আন্দাজে ভাইটার বুদ্ধি কম। ওর চাইতে পল্টু আরও চৌকশ। কথা বলে বুড়োদের মত। পাকা মাথা। তবে সে মাথায়

লেখাপাড়া ছাড়া আর সব কিছু পোরা। বদ বুদ্ধিতে তার জুড়ি কেউ নেই। সেই তুলনায় বিল্টু গোবর গণেশ। তবু সে মন দিয়ে পড়া লেখার চেষ্টা করে। নিয়মিত ইস্কুলে যায়। মাস্টার মশাইদের কথার অবাধ্য হয় না। গুরুপদর অনেক ভরসা এই ছেলেটার উপর। বড় হয়ে বিল্টু দশজনার একজনা হবে। তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবে। অভাবের সংসারে হাসি ফোটাবে। এরকম অনেক স্বপ্নই গুরুপদর মনে স্তরে স্তরে সাজানো।

চাবি নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এল গুরুপদ। ততক্ষণে আমকাঠের ভারী তক্তপোশটা ধরাধরি করে নামিয়ে ফেলেছে কানাই আর পল্টু। জয়দেবও হাত লগিয়েছে ওদের সাথে। কলতলা থেকে সব কিছু দেখতে পাচ্ছিল ইরা। সে মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে এসময় ওদের পাশে থাকতে পারত। বিল্টুকে হা-করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইরার রাগ হল, ঝ্যানঝেনে স্বরে বলল, যা না তক্তপোশটায় হাত লাগা। এখানে কি ঠাকুর উঠেছে যে দাঁড়িয়ে আছিস? বিল্টু লজ্জা পেয়ে চলে গেল। ও চলে যাবার পর ইরা চোখে-মুখে জল দিল কল দাবিয়ে। ভেজা হাতটা বুকের কাছে রাখল। আঃ, কী শান্তি!

বকফুল গাছের গোড়ায় খাটটাকে খাড়া করে দাঁড় করাল ওরা। গুরুপদ তালা খুলতেই পুরো দরজাটা হা-হয়ে খুলে গেল। বন্দী বাতাস হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। কানন দূর থেকে বলল, বদ বাতাস বেরিয়ে যেতে দাও, তারপর ঘরে ঢুকবে। বলা তো যায় না কোথায় কী লুকিয়ে আছে।

গুরুপদর অত ভয় নেই। সে সাত ঘাটের জল খাওয়া মানুষ। কাননকে শুনিয়ে বলল, তিথি নক্ষত্র দেখে ঘরে ঢোকার ভাগ্য সবার হয় না। যা পেয়েছি তাতেই আমার আনন্দ। কে তোমাকে আনন্দে ভাসতে নিষেধ করেছে। গা জ্বালা-পোড়া করে উঠল কাননের। সে আরও কিছু বলত। কিন্তু ইরাকে আসতে দেখে চুপ করে গেল। এ সংসারে গুরুপদকে সে যত না ভয় পায় তার সহস্র গুণ বেশি ভয় পায় ইরাকে। ইরার বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় আবেগের চেয়ে যুক্তি বেশি। লোভ লালসার ছিটে ফোঁটা ওর চোখে বুঝি থাকতে নেই। গুরুপদও মেয়ের কাছে নুন দেওয়া জোঁক। সারা দিনে ওদের মধ্যে খুব কম কথা হয়। ইরাও পছন্দ করে না মাত্রাতিরিক্ত কথা বলে সবার কাছে নিজেকে হেয় করে দিতে।

গুরুপদর বদলীর খবরটা পল্টুই সবার আগে ঘরে শোনাল। পল্টু হাত নেড়ে, চোখের মণি নাচিয়ে বলল, বাবা, তোমার পাতা কেটে গেল! যা খাওয়ার তৃপ্তি ভরে আজ খেয়ে নাও। সদর থেকে বদলীর অর্ডার এসেছে তোমার। এবার আমাদের বিছানাপত্তর বাঁধতে হবে।

গলার ভাত আটকে যাবার দশা হল গুরুপদর। মনে মনে ভাবল, ঝগড়া-কাজিয়া স্টাফেদের সঙ্গে না করলেই ভাল করত। সেদিন মাথাটা যে এমনভাবে বিগড়ে যাবে কে জানত। একটা থাপ্পড় মেরেছিল প্রভাতকে। প্রভাত কিচেন স্টাফ। লোহার বালতিতে ভরে সে মুসুরির ডাল নিয়ে যাচ্ছিল। পথে দেখা হল গুরুপদর সঙ্গে। লোহার বালতিতে ঠোঙা দেখে সে আর রাগ চেপে রাখেত পারল না। সব পাখি মাছ খায় তাহলে শুধু বদনাম কেন হবে মাছরাঙার? কিচেন ডিউটি তো সে একা করে না। প্রভাতও করে। কিচেন থেকে মাল যা চুরি হয় তার বদনামের ভাগীদার গুরুপদ কেন একা হতে যাবে? প্রভাতকেও সে হাতেনাতে ধরিয়ে দেবে। তাতে যা হয় হোক।

প্রভাত ধরা পড়েও ফাঁস কেটে বেরিয়ে এল। আধা সের মুসুরির ডাল সে কিচেন

থেকে আনে নি, এনেছে মুদি দোকান থেকে কিনে। দু-জন সাক্ষী আছে। তারা প্রভাতের হয়ে বলল। ফেঁসে গেল গুরুপদ। অপমানের বদলা নিল প্রভাত। জয়েন্ট পিটিশান লেখাল গুরুপদর নামে। হাসপাতালের ডাক্তারও তাকে সাপোর্ট করল না। গোপনে রিপোর্ট পাঠাল। হাসপাতালের শান্তিরক্ষায় গুরুপদর স্থিতু জীবনে ঢেউ উঠল। ডাক্তারবাবু তার হাতে বদলীর কাগজটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, তোমাকে যেতেই হবে, আমার কিছু করার নেই। হাতের ঢিল ছুঁড়ে দিলে তা আর ফেরানো যায় না।

ঢিল যে গুরুপদর বুকে লেগেছে এটা ভাঙাচোরা রঙ ওঠা ঘরে ঢুকে বুঝতে পরল সে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সে কাননকে বলল, আর দাঁড়িয়ে থেকো না, যা করার তাড়াতাড়ি করো। ক্ষিদেয় আমার নাড়িভুঁড়ি চটকাচ্ছে। সেই কখন দুটো খেয়েছি, তা কি আর পেটে আছে?

কানন ব্যস্ত হল না, ধীরস্থিরভাবে বলল, অতো অস্থির হলে চলবে না। নতুন জায়গায় সব কিছু গুছিয়ে উঠতে সময় লাগবে। সাপ দেখার পরে রান্নাঘরে ঢুকতে আমার ভয় লাগছে। তুমি একটু দাঁড়াবে চলো।

ঘর গোছাতেই বেলা গড়িয়ে গেল। ভয় ভাঙতেই আঁধার নামল। জয়দেব গুরুপদকে বলল, এবার আমরা ফিরব।

—সে কি হয় বাবা? আজ রাতটা তোমাদের থাকতেই হবে। গুরুপদ জোর করল।

—থাকলে আমাকে অনেক উল্টো মিছে কথা শুনতে হবে। জয়দেব বোঝাতে চাইল।

—তা হোক। আমাদের জন্য তুমি না হয় একদিন কথা শুনলে।

জয়দেব নিমরাজী। কানাইয়ের এখানে থেকে যাওয়ার ইচ্ছা পুরো মাত্রায়। এখন করিমপুর ফিরলে গভীর রাতে তারা ঘরে পৌঁছাবে। দিনভর ক্লান্তির শেষ নেই। শরীরও হাল ছেড়ে দিয়েছে অবসাদে। কানাই বড় করে শ্বাস ছেড়ে তাকাল, থেকে যাও ওস্তাদ। লঘু-গুরুর কথা শুনতে হয়। আব একবেলা না গেলে মালিকের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে না।

সন্ধ্যার পর হাসপাতালের মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্ধকার। হাওয়া হামাগুড়ি দিয়ে উঠে এল ডোবা থেকে। মুহূর্তে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল ঠাণ্ডা হাওযার অনু-কণিকা। এদিকটায় এখনও ইলেকট্রিক আসে নি। হ্যারিকেন জ্বেলেছে ইরা। সাফ-সুতরো কাচের দেওয়াল ভেদ করে ঠিকরে বেরচ্ছে আলো। জয়দেব জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে আছে দূরের দিকে। অন্ধকারের চাদর সরিয়ে চোখের দৃষ্টি আর কতদূর যেতে পারে? তবু সে তাকিয়ে আছে। কেন আছে ইরা তা জানে না। তবে ওদের উপস্থিতি, এত গায়ে মাখামাখি কথাবার্তা তার মনঃপূত নয়। একটা টেম্পুর ড্রাইভারের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা করার কোন মানে হয় না। জয়দেবকে পাশ কাটিয়ে ইরা চলে এল নিঃশব্দে। সাঁঝের আকাশে তারা গুনতে তার ভাল লাগে। সন্ধে লাগার মুখে নারকেল তেল দিয়ে টাইট করে চুল বেঁধে দিয়েছে কানন। সাপ বিনুনী চুল এখন পিঠের উপর শুয়ে আছে চুপচাপ। হ্যারিকেনের ঝিমানো আলোয় ইরার দিকে চোরা চোখে তাকাল জয়দেব। মন আকুলি বিকুলি করে উঠল কথা বলার জন্য। ইরা প্রতিক্রিয়াহীন। চোখে চোখ পড়তেই কঠিন হয়ে এল তার দৃষ্টি। হাসল না, যেন শামুকের শক্ত খোলোর ভেতরে লুকিয়ে রাখল নিজেকে।

বিল্টু আর পল্টুকে সঙ্গে নিয়ে কানাই গিয়েছে গ্রামের ভেতর মুরগির খোঁজ করতে।

টাকাটা ইরার সামনে জয়দেবই দিল। গুরুপদর টাকা ফিরিয়ে দিল সে। গলায় দাবী প্রক করে বলেছিল, আজ রাতটা থাকব যদি আমার কথা শোনা হয়।

কানন গায়ে পড়া হাসি হেসে বলল, দিচ্ছে যখন নিয়ে নাও। জয়দেব তো এখ আমাদের ঘরের ছেলের মতো।

তিন চাকার টেম্পুটা দাঁড়িয়ে আছে আমতলায়। বিকেলে স্টাফ কোয়ার্টারে ছেলেমেয়েরা টেম্পুটাকে দেখছিল হা-করা চোখ দিয়ে। কানাই তাদের ধারে কাছে ঘেঁষ দিল না। কানন পাশের কোয়ার্টারের বউটার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। বেড়ার পাশে গিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে। গুরুপদ গিয়েছে দোকানে। ঘর ফাঁকা। ইরা ই করলেই জয়দেবের সঙ্গে কথা বলতে পারত। কিন্তু কথা বলার কোনওরকম আগ্রহ প্রক পেল না তার মধ্যে। নিজেকে গুটিয়ে রাখল সে।

জয়দেব জানালার শিক ছেড়ে দিয়ে ইরার দিকে তাকাল, ঢোক গিলে বলল, জায় ভাল মনে হচ্ছে। বেশ শান্ত। ঝুটঝামেলা নেই।

কথাগুলো ইরাকে বলা। অথচ ইরা তাকাল না।

জয়দেব বলল, আমরা কাল চলে যাব, আবার কবে দেখা হবে কে জানে!

ইরা এবার মনে মনে হাসল, কোনও উত্তর না দিয়ে তাকাল।

জয়দেব অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, তুমি কথা বলছ না, আমি কি কোন দোষ করেছি?

ইরার ঠোঁটে স্বতঃস্ফূর্ত হাসি নেই, ঘাড নেড়ে খুব আস্তে বলল, না-না তা কেন আসলে আমি কম কথা বলি।

—তা বলে এত কম কথা?

ইরা দূরের দিকে তাকাল। অন্ধকারে খসে পড়ল তারা। হারিয়ে গেল অন্ধকারের গ জয়দেব সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল তারপর। বোবা মানুষের কাছে এসে সেও বোবা হয়ে গেল। লতার মতো কথার ডালপালা বিস্তার করে সে ইরাকে ছুঁতে চেয়েছি ব্যর্থ হতেই হতাশার মেঘ জমল মুখের উপর। রাতের অন্ধকারের চেয়েও হতাশার অন্ধক আরও গাঢ়।

## ।। দুই ।।

রান্নাঘরটা ছোট হলেও চারটে সিমেন্টের তাক আছে। ভেঙে পড়া জানালাটার দিকে তাকি ইরার মন কেমন করে উঠল। দিনের আলোয় দেখা সাপটা যেন জানলার শিক পেঁচি ঝুলছে। কানন গল্প সেরে ফিরে এসে বলল চা করার জন্য। মায়ের কথার অবাধ্য হ পারে না ইরা। পুরনো স্টোভ নিয়ে সে বসেছে মেরামতির জন্য। জয়দেব তার নাজেহ অবস্থা দেখে বলল, তুমি সরে বসো। স্টোভটা আমি ঠিক করে দিই।

ইরা বিরক্ত হল। ছেলেদের এত গায়ে পড়া স্বভাব তার ভাল লাগে না।

কী বুঝে জয়দেবই চলে গেল রান্নাঘরের সামনে থেকে।

ইরা তেল ঢালল স্টোভে। কেরোসিন হাত মুছল পুরনো ন্যাকড়ায়। ফিতেগুলো ঠিকঠাক
্র দেশলাই জ্বালল সে। বদলী মানেই সংসারের অনেক কিছুই বদলে যাওয়া। এত
বধানে গাড়ি চালিয়েছে জয়দেব তবু আলনার মাথাটা ভেঙে গিয়েছে ধাক্কায়। কাচের
স ভেঙেছে দু-খানা। অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িটা তুবড়ে গিয়েছে নামানোর সময়।

গুরুপদ হাসপাতাল থেকে ফিরে এল অন্ধকার পথ মাড়িয়ে। ইরাকে স্টোভ ধরাতে
খে বলল, আমার জন্য এক কাপ জল বেশি দিস। মাথাটা ভার হয়ে আছে ক'দিন
কে যা চলছে মাথাটা না খারাপ হয়ে যায়।

ইরা মুখ উঁচু করে দেখল, কষ্ট হল তার। সংসারের বোঝা কারোর ঘাড়ে একবার
পে বসলে উঠতে চায় না। সংসারের ভার সব ভারকে ছাপিয়ে যায়। জয়দেব অসময়ে
দের পাশে না দাঁড়ালে তারা কি আজ টেম্পুতে চেপে এখানে আসতে পারত? মহাজনরা
কে ধরেছিল। কটূ কথায় কানের বাতাস গরম করে দিয়েছিল তারা। সবার মুখে কাদা
পে দিয়েছে জয়দেব। তার প্রতি ইরার যতটুকু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কথা তা সে
বছে না। কোথায় যেন বাধো বাধো ঠেকে।

টেম্পু ঠিক করতে গিয়ে গুরুপদর সঙ্গে জয়দেবের প্রথম আলাপ হয় করিমপুর
সস্ট্যাণ্ডে। সেদিন ইরাও সঙ্গে ছিল। কাননই তাকে ঠেলে পাঠাল যাতে গুরুপদকে কেউ
কয়ে নিতে না পারে। ইরা পড়াশুনা শিখেছে। তাছাড়া চালাক চতুর। বেতন পেয়েই
রুপদ ইরার হাতে টাকা তুলে দেয়। গর্ব করে বলে, তুই আমার ছেলের মতো। এ
সার তোর। সব কিছু হিসাব করে চালা।

ইরার হাতে টাকা তুলে দিলেও কাননের কোনও রাগঝাল নেই। সংসারের মারপ্যাঁচ
বোঝে না। তার মোটা বুদ্ধি। সে শুধু লাল মাড়ি বের করে হাসতে জানে। দিনভব
ব পাঁচ ছয় খিলি দোক্তা দেওয়া পান চাই। ভাল-মন্দ খেতে পেলে তার আর কোনও
ভিযোগ নেই। সংসারের কাজকর্মে তার কোনও আলিস্যি নেই। সে চায় দিন কেটে
লেই হলো। কোন কিছুকে খুঁচিয়ে ঘা করার স্বভাব নেই তার। চা ছেঁকে ইরা কাননকে
লল, মা তুমি কাপগুলো ঘরে দিয়ে এসো। আমি ভাতের জল চড়িয়ে দিচ্ছি। রাত বাড়ছে।
র দেরী করা ঠিক হবে না।

কানাই ফিরে এসেছে মোরগের পায়ে দড়ি বেঁধে নিয়ে। বিল্টু আব পল্টুর উৎসাহী
খ লাল মোরগটাকে দেখছিল। আর কিছুক্ষণ পরেই ওটা খালপোশ হয়ে ওদের পেটে
কে যাবে।

কানাই ইরাকে দেখে হাসল, ব্যস্ত হয়ে বলল, একটু দেরী হয়ে গেল ফিরতে। কী
বব, নতুন জায়গা। জিজ্ঞেস করে-করে আসল জায়গায় পৌঁছাতে হল। ইরা তার
াহাদুরিকে খাটো করে দেখল না বরং হাসি মুখ করে বলল, বাস লাইনের লোকগুলো
তা বোকা হয় না। ওরা আর দশ-পাঁচটা লোকের থেকে চালাক বেশি।

কথাটা কানে যেতেই জয়দেব আহত চোখে তাকাল। তাকে উদ্দেশ্য করে এমন কথা
বললেই পারত ইরা। কানাই ভ্রুক্ষেপহীন। কলাপাতা কেটে নিয়ে সে চলে গেল পাঁচিলের
রে। বিল্টু-পল্টু অনুসরণ করল তাকে। জয়দেব গেল না। তক্তাপোষে গা এলিয়ে চোখ
জে পড়ে থাকল। তার এমন মনমরা দশা দেখে হাসি পেল ইরার। কাছে গিয়ে শুধোল,
বীব খারাপ করছে বুঝি?

অভিমানে ছলছলিয়ে উঠল জয়দেবের চোখ, না তেমন কিছু নয়। সারা দিন স্টিয়ারি ধরে শরীরটা আর চলছে না। একটু আরাম চাইছে।

ইরা চলে গেল রান্নাঘরে। গাদাগুচ্ছের কাজ পড়ে আছে। এক হাতে সব কিছু গুছিয়ে উঠতে না পারলে খেতে দেরী হয়ে যাবে। কানন তাকে সাহায্য করার জন্য এল। ইরার পাশে দাঁড়িয়ে বলল, তুই ঘরে যা। ছেলেটা একা আছে। ওর সাথে কথা বল। ভোরে তো চলে যাবে ওরা।

ইরা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল, আমি যাব না।

কেন গেলে কী হয়? জয়দেব তো খারাপ ছেলে নয়।

সে আমি জানি।

জানিস যখন তখন তোর তাকে এড়িয়ে চলা ঠিক হচ্ছে না। ও যদি না থাকত আজ আমাদের কী হোত বলত?

যা হবার তা হতোই। ইরা উঠে গেল উনুনের দিকে।

কানন সহজে ছাড়বে না তাকে, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, ছেলেটার এদেশে কেউ নেই সে একা। কোনমতে বর্ডার পেরিয়ে চলে এসেছে।

তাতে আমার কী? এরকম অনেকেরই কেউ থাকে না পৃথিবীতে। ইরার কণ্ঠস্বর গা হয়ে এল, মা, তুমি যাও। তুমি বরং ওর সঙ্গে গল্প করো। আমার সময় নেই।

মেয়ে হয় জন্মেছিস, এত কড়া কথা তোর মুখে মানায় না। কানন গজগজ করতে করতে চলে গেল।

কানাই ফিরে এল খালপোশ করা মোরগটার মাংস বানিয়ে। ফিনকি দেওয়া রক্ত মুখে লেগে শুকিয়ে গিয়েছে। ইরা তার ছন্নছাড়া চেহারা দেখে বলল, কী দরকার ছিল এ কষ্ট করার।

কষ্ট না করলে যে কেষ্ট মেলে না। কানাই দাঁত বের করে হাসল, আর কতক্ষণ বা আছি। কাল ভোরেই তো চলে যাবো। আর হয়ত কোন দিনও দেখা হবে না। তবে এখানে এসে যা আনন্দ করলাম, এমনটা আর কোথাও করিনি। জায়গাটা আমার খু মনে ধরেছে। সময় পেলে চলে আসব।

হ্যাঁ হ্যাঁ আসতে তো কোনও মানা নেই। ঘর তো চেনা হয়ে গেল।

বালতি নিয়ে কলতলায় চলে গেল ইরা। বড় আমগাছটার কিছু দূরেই শানবাঁধানো কলতলা। আশেপাশের কোয়ার্টারগুলো থেকে আলো এসে পড়েছে পথে। সরু প প্রতিফলিত আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়। হাওয়া থাকলেও গুমোট গরম সর্বত্র আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছে। দুরন্ত হাওয়া ছিঁড়ে দিচ্ছিল কলাগাছের কচি পাতা। পাতা ফেঁটে যাওয়ার শব্দে শিহরিত হল ইরা। এ সময় আম গাছের মাথায় হাওয়া আটকে শনশনা শব্দ ওঠে। ভৌতিক সেই শব্দ। মাত্র হাত পাঁচেক দূরে কাঁটাভরা শরীর নিয়ে রাত জাগে কুলগাছ। আসার সময় ইরা দেখেছিল মাঠ জুড়ে খেজুর গাছের মিছিল। এখন জোনাকি দল খেজুরগাছের মাথায় আটকে গিয়েছে অসহায়ভাবে। ইরা মুগ্ধ চোখে দেখছিল সব এদিককার মাটির রঙ সোনার চেয়েও উজ্জ্বল। জলের রঙ তুঁতে গোলা। আকাশটা দূরে নয়, মনে হয় খুব কাছের। টেম্পুর কাচের ভেতর দিয়ে চলমান দুনিয়াটা চেনা। নির্জ কলপাড়ে দাঁড়িয়ে ইরার একটুও ভয় করল না। মৃত্তিকাস্পর্শী হাওয়া এসে ইরাকে ছুঁ

দিয়ে পালিয়ে গেল বাঁধের দিকে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা অনুচিত ভেবে ইরা বুকের স্পর্শ দিয়ে চাপ দিল কলের হ্যাণ্ডেলে। কিশোরী বয়সের অভ্যাসটা মনে পড়ে গেল তার। ধাতব স্পর্শে হিম হয়ে গেল বুকের ঢালু নদী। দুপুরে সে বার দুয়েক কলপাড়ে এসেছে। এত নরম কল, চাপ দিলেই জল পড়ে ভকভকিয়ে। বুকের চাপে হ্যাণ্ডেল নেমে যায় ধীরে ধীরে, জল পড়ার শব্দে মন ভরে ওঠে খুশিতে। ঠাণ্ডা জল চোখে-মুখে ছিটিয়ে ইরা আকাশের দিকে তাকাল। তারা-নক্ষত্র'র সংসার নজর কেড়ে নিলে তার। প্রতি রাতেই হাসি মুখ করে ওরা পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকে। আজও কি ইরাকে দেখছে ওরা? মেঘ শূন্য নীলাকাশ সোডায় কাচা কাপড়ের চেয়ে কলঙ্কহীন। অন্ধকারের ফাটল থেকে বেরিয়ে এসেছে চাঁদ। লুকিয়ে-চুরিয়ে দেখছে পৃথিবীর সৌন্দর্য। ইরার জয়দেবের কথা মনে পড়ল। জয়দেব কি তাকে এখন চোরা চোখে দেখছে? কেন দেখে সে? ভাবতে গিয়ে রোমাঞ্চিত হল ইরার সর্বসত্তা। লোমকূপে ছড়িয়ে পড়ল অচেনা শিহরণ। বুক ভাসান নিঃশ্বাস নেমে এল অজান্তে। জলের বালতিটা তুলে নিয়ে সে ফিরে এল ঘরে। গুরুপদ গল্পে মেতেছে জয়দেবের সঙ্গে। নিজের ড্রাইভারী লাইন নিয়ে কথা বলছে জয়দেব। ওপার বাংলায় তার ঘর ছিল। বাবা মা মারা গেল কঠিন অসুখে। তারপর থেকে সে একা। ও দেশ ছেড়ে চলে এল এদেশে। শিকড় বাড়ল এ দেশের মাটিতে। তবু ওপারের জন্য মন কেঁদে ওঠে। সব শুনে গুরুপদ বলল, যেখানে মাটি আছ সেখানেই মানুষের দাপট। তুমি মন খারাপ করো না। মাটি কাউকে ফাঁকি দেয় না। মাটি কাউকে ঠকায় না।

মাঝে মধ্যেই দার্শনিক কথাবার্তা বলে গুরুপদ। তখন বোঝা যায় এই অভাবী মানুষটার মধ্যেও একটা সুন্দর মন লুকিয়ে আছে। পাথর চাপা ঘাসের মতো তার অবস্থা।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতেই রাত গড়াল।

ঝাল পেঁয়াজ আর গরমমশলা দিয়ে কানন মাংস রেঁধেছে জুত করে। খাওয়ার সময় গুরুপদ আক্ষেপ করে বলল, শেষ কবে যে মাংস খেয়েছিলাম মনে পড়ে না।

পল্টু সঙ্গে সঙ্গেই বলল, তুমি তো মাংসই আনো না, হাড় কৃপণ!

মাংসের যা দাম বেড়েছে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য গুরুপদ বলল।

কানন ঝাঁঝিয়ে উঠে, কোন জিনিসটার না দাম বেড়েছে, তা বলে মানুষ কি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে? তোমার যত কথা!

গুরুপদ ঝাল কামড়ে 'উঃ-আঃ' করছিল। তার দিকে জলভরা গ্লাসটা এগিয়ে দিল কানন, চাপা গলায় বলল, দেখে-শুনে খাও। অমন রাক্ষসের মতো খেলে গলায় হাড় বিঁধে যাবে।

হাড় বিঁধলেই মনে হয় ভাল হোত। চোখের কোণে জল নিয়ে রসিকতা করল গুরুপদ।

জ্বলে উঠল কানন, কেন?

তাহলে আর রোজ রোজ খেতে হোত না।

দূরে মুখ ঝুঁকিয়ে বসে ছিল ইরা। সে কাননের সঙ্গে খাবে। গুরুপদর কথাগুলো কানে যেতেই পেট গুলিয়ে বমি উঠল গলায়। মুখে হাত চেপে বাইরে ছুটে এল সে। বমির গন্ধে কারোর যাতে ব্যাঘাত না হয় সেইজন্য সে চলে যায় কলপাড়ে। হড়হড়িয়ে বমি করল। একটু সুস্থবোধ হতেই ইরা উঠে দাঁড়াল। তখনই টর্চের আলো এসে জড়িয়ে গেল তার গায়ে। অপ্রস্তুত ইরা বিরক্তি ভরে তাকাল। জয়দেব ছাড়া এভাবে কেউ তার গায়ে

টর্চ মারার সাহস পাবে না। ভাল করে তাকাতেই ইরা দেখতে পেল শাড়িপরা তার বয়সী একটা মেয়েকে। বালতি হাতে ছিপছিপে গড়নের মেয়েটা এগিয়ে এল কলপাড়ে। তার ফর্সা নাকের লতিতে চিকচিক করছে পাথরের নাকছাবি। কানে সোনার রিং। ফর্সা ধবধবে পায়ে শোভা পায় হাওয়াই চপ্পল। মেয়েটাকে এক ঝলক দেখেই ইরা বুঝতে পারল কোনদিন অভাবের কাদা লাগেনি এর গায়ে। মেয়েটার ঝর্ণা স্বভাব চেহারায় সম্পন্নতার ছাপ সুপষ্ট। ইরা হাতের ইশারায় টর্চটা নিভাতে বলল। টর্চ না নিভিয়ে মেয়েটা পায়ে পায়ে এগিয়ে এল ইরার কাছে, পাতলা ঠোঁটে হাসি ভরিয়ে মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করল, তোমরা বুঝি আজ দুপুরে এলে?

হ্যাঁ। ইরা আর কথা বাড়াল না।

মেয়েটা ধরানো তুবড়ির চেয়েও উজ্জ্বল, আজ বুঝি তোমাদের রান্নাঘরে সাপ ঢুকেছিল?

ইরা ঘাড় নাড়তেই মেয়েটি স্বতঃস্ফূর্ত বলল, জান তো এখানে অনেক মারাত্মক ধরনের সাপ আছে। আমরা যখন প্রথম আসি, ভয়ে রাতের বেলায় বেরতাম না। বাবা ঘরের চারিদিকে কার্বলিক অ্যাসিড রেখে দিয়েছিল। জানতো সাপকে আমার ভীষণ ভয় করে।

সাপকে কার না ভয় করে? ইরা বিরক্তি চেপে রাখল, আমরা ঐ বকফুলওলা কোয়ার্টারটায় এসেছি।

সে আমি জানি। তোমাকেও দেখেছি কিন্তু আসতে সাহস হয়নি। বড় বড় দুটো ছেলেকে দেখলাম তোমাদের ঘরে। ওরা কারা?

ওরা টেম্পু নিয়ে এসেছে। আমাদের জানা শোনা। ইরা ঢোক গিলল।

মেয়েটি শুধোল, তোমার বাবা কী কাজ করে?

—জি. ডি. এ।

—আমার বাবা হেলথ অ্যাসিসট্যান্ট। টীকা দেয়। গ্রামের লোকে বলে, টীকাদার। মেয়েটি সুন্দর করে হাসল, ইরা তার সঙ্গে ঠোঁট মেলাতে পারল না। যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

আর একটু দাঁড়াও। তোমাকে তো আমার নামই বলা হয়নি। মেয়েটি হাসল, আমার নাম মাধবী। আমি এ বছর বাংলায় অনার্স নিয়ে কৃষ্ণনগরে ভর্তি হয়েছি।

ইরা চুপ করে শুনল। নিজের পরিচয় দেওয়ার মতো তার কাছে আর কীই বা আছে! শুধু নীচু স্বরে বলল, আমার নাম ইরা। আমি এখন আর পড়ি না। ঘরের কাজ করি। মাধবী ঠোঁট ভরিয়ে বলল, পড় না কেন? তোমাকে দেখে তো মনে হয় তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি আছে।

বুদ্ধি আছে কী না জানি না, তবে পড়তে আমার আর ভাল লাগে না।

মাধবী ইরার হাত ধরল, তুমি আমাদের কলেজে ভর্তি হয়ে যাও। দুজনে মিলে হোস্টেলে থাকব।

আমার আর সে উপায় নেই। ইরা বিষণ্ণ গলায় বলল। মাধবীর বিশ্বাস হচ্ছিল না কথাগুলো, ইরার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সে বলল, তোমাকে আমি দূর থেকে দেখেছি। দেখেই ভেবেছি তোমার সঙ্গে আলাপ করব। জান তো এই হাসপাতালে আমার কোনও বন্ধু ছিল না। তোমাকে পেয়ে আমার সেই অভাব মিটে গেল। আমি কাল আসব। তোমাকে আমাদের কোয়ার্টারে নিয়ে যাব। আমার মায়ের সঙ্গে আলাপ হলে তোমার ভাল লাগবে।

কে যাবে তো?

মাধবী আর ইরা এক সঙ্গে ফিরল। আমতলার কাছে এসে মাধবী বলল, আজ যাই। পরে আবার দেখা হবে।

মাধবী চলে যাওয়ার পরেও ইরা একা একা দাঁড়িয়ে থাকল অন্ধকারে। আকাশ ভর্তি তারা-নক্ষত্রদের ভিড়ে সে বুঝি পথহারা এক তারা। বুক ঠেলে উঠে আসল হাজার দুঃখকথা। চোখ ছাপিয়ে জল এল হঠাৎ। দু হাতে বালতি, চোখ মুছে নেবার উপায়ও নেই। আবার চোখ ভর্তি জল নিয়ে আলোর দিকে যাওয়া যায় না। সবাই দেখলে কী ভাববে? চোখের জলকে ভয় পায় অনেকেই। অনেকে উপেক্ষা করে চোখের জল। জয়দেব কীভাবে নেবে এসব? ইরা কী ভেবে বালতি দুটো নামাল মাটিতে, হাত উঠিয়ে মুছতে চাইল চোখের জল। হাতের উল্টো পিঠে জড়িয়ে গেল চোখের কষ। মসৃণ গালে লেপটে গেল শরীরের নির্যাস। অন্ধকারে সে তাকিয়ে থাকল দূরের দিকে। মাঝ আকাশ থেকে খসে পড়ল তারা। পৃথিবী কোথায় লুকাল সেই কক্ষচ্যুত তারাকে। ইরা ভাবল পৃথিবীর এত বড় কোলে খসে পড়া তারার মতো কি অশ্রুকণাও লুকিয়ে ফেলে নিজের জলজ অস্তিত্ব?

ইরা বকফুল গাছটার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াতেই জয়দেবকে দেখতে পেল। সিগারেট হাতে জয়দেব দাঁড়িয়ে আছে আঁধারের দিকে মুখ করে। ইরা বুঝতে পারল জয়দেব এখানে কেন এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে যে রঙ এসে লেগেছে সে ভাষা পড়তে পারে ইরা। মন চাইলে ঐ রঙ গায়ে মাখতে পারে সে। কিন্তু ইরার ইচ্ছে হল না। নিজেকে দূরে রাখতেই সে পছন্দ করে।

জয়দেব আগ্রহ সহকারে শুধাল, তোমার কী শরীর খারাপ? ওভাবে উঠে এলে যে আমার ভাল লাগছিল না। ইরা কষ্ট করে তাকাল। কথা বলার ইচ্ছে হল না তার। দূরের দিকে তাকিয়ে থাকল আনমনে।

কানন ডাকল ঘর থেকে, ইরা, খেয়ে নিবি আয়। রাত অনেক হল।

ধীর পায়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল ইরা। আজ যে তার কী হচ্ছে তা সে নিজেও বুঝতে পারে না। অস্বস্তি ঠেলে উঠছে বুকের ভেতর। শুকিয়ে যাচ্ছে গলা। ভাঙনের আগে নদীর পাড়ের যে অবস্থা হয়, ইরার মনের অবস্থা সেরকম। এসব কিছুকে কাটিয়ে ওঠার জন্য বড় করে শ্বাস নিল ইরা।

## ।। তিন ।।

ভোরের দিকে ঘাস মাটির বুক নরম হয়ে আসে রাত্রিজলের ভালবাসায়। চাঁদ তারা নক্ষত্রদের সংসার যখন বিলীন হতে থাকে তখন ঝাঁকড়া আমগাছের ডালে বসে পালক দুলিয়ে গলা সাধে কাকের দল। আমগাছের ডালে লুকিয়ে আছে ওদের এলোমেলো বাসা। ভোর হয়েছে এ কথা সবার আগে জানান দেয় মোরগ। হাসপাতালের পাঁচিল যেখানে শেষ, সেখান থেকে শুরু হয়েছে ছায়া ঢাকা গ্রাম।

অনিদ্রায় কষ্ট পাবার মতো বয়স নয় গুরুপদর। তবু ভোরের প্রথম মোরগের ডাকে ঘুম চটকে গেল তার। চোখ ডলে বিছানায় বসে অভ্যাস মত বিড়ি ধরাল সে। ভোরের ক্ষীণ আলোয় সে দেখল এতটুকু ঘরে এতগুলো লোক কীভাবে শুয়ে আছে। আশ্চর্য হয় সে। তার বাবা রামপদ বলত একটা দামী কথা। যদি হয় সুজন তাহলে তেঁতুলপাতার বিছানায় বিশজন। বাবার কথাগুলো মিথ্যা নয়। সকালবেলায় বাবার কথা মনে পড়তেই বেশ দুর্বল হয়ে গেল সে। শেষ বয়সে রামপদ তার আশ্রয়ে এসে মাথা গুঁজল। তিন ভাইয়ের কেউ তার খোঁজ খবর নিত না। এ সংসারে বুড়ো মানুষ আর বুড়ো ঘোড়ার কদর খুব কম।

রামপদ গত হয়েছে দশ বছর। দশ বছরে দশ রকম অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে গুরুপদ। সব কিছুর মূলে এই অর্থ। এত বড় সংসার তার একার আয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। হাসপাতালের চাকরিটা পাওয়ার পর থেকে সে যেন আরও কুঁড়ে হয়ে গিয়েছে। সরকারী কাজটুকু ছাড়া সে আর কোন কিছু করতে চায় না। মন সায় দেয় না। আগে কানন ঠোঙা বানাত। এখন সে আর ওই কাজের ধারে কাছে থাকে না। পল্টুর পড়াশোনায় মন নেই। ইরার উপর অনেক আশা ছিল ওদের। ইবাও শেষ রক্ষা করতে পারল না। আশাবৃক্ষের গোড়া কুপিয়ে কেটে দিল। একটা 'পাশ' না থাকলে সেই পড়াশোনার আর কী দাম। ইরা এখন ডাগর হয়ে ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ছাড়ছে। খুব শীঘ্র ওকে বিয়ের পিঁড়িতে না বসালে চিটে ধানের মতো বিশ্রী হয়ে যাবে মুখশ্রী। দু-একজন যে এর মধ্যে তাকে দেখে যায় নি তা নয়। পছন্দ হয়েছে অনেকের। কিন্তু সাধ্যাতীত দাবী-দাওয়ার কথা শুনে চোখে সর্ষের ফুল দেখেছে গুরুপদ। সে নিজেও জানে খালি হাতে আজকাল আর কোন কাজ হয় না। যুগটা ফেল কড়ি মাখ তেলের। তেল কোথায় যে মাখবে! ইরা ছোট থেকে মুখচোরা। গায়ে পড়া স্বভাব তার কোন কালেই ছিল না। পরিমল গুরুপদর সঙ্গে কাজ করত। ওর মেয়ে সুনন্দা মাস্টারের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করল। বিয়েতে একটা টাকা খরচ হল না পরিমলের।

বিছানার এক পাশে জ্বলন্ত বিড়িটাকে ঠুসে ধরে নিভিয়ে ফেলল গুরুপদ। কানন জেগে থাকলে বকাসকা করত। মুখ ভার করে বলত, এত বিড়ি খাও কেন? তোমার কিছু হলে এ পোড়ার সংসার কে টানবে?

কাননের মাথার ঠিক নেই তাই পাগলের মতো বকে। এই সংসার তার জন্য কি দায়ী। বকাসকা করলেও বউটার মন কাশফুল সাদা। মানুষকে খাওয়াতে পরাতে ভালবাসে। একটু বেশি কথা বলার ধাৎ। রোগ জ্বালায় ওর শরীরটা এখন হাড় খাঁচা। একটু অনিয়ম হলে হাঁপানীর টান বাড়ে। এখন ওর চোখ-মুখের অবস্থা দেখে ভয় হয়। মনে হয় বুঝি শ্বাস চলাচল বন্ধ হয়ে গেল।

খোলা জানলার ও পিঠে পড়ে আছে ঘাসভর্তি মাঠ। বকফুল গাছের পাতা নড়ে না এখন। চারদিক থম মেরে আছে ভোরের স্নিগ্ধ আলোয়। আর দেরী করা উচিত নয় ভেবে গুরুপদ কাননকে ঠেলা মেরে জাগিয়ে তুলল, ওঠো, ভোর হয়ে গিয়েছে। ওরা তো চলে যাবে।

ধড়মড়িয়ে চোখ ডলে উঠে বসল কানন। ঘুম শরীর ছাড়তে চাচ্ছিল না তবু সে উঠে পড়ল জোর করে। চা খেয়ে ওরা চলে যাবে। টেম্পুটা রাতভর হিম খেল। ইঞ্জিনে ট

বসে গেলে স্টার্ট নিতে দেরী হবে। রাতে কানাই টেম্পুতে শুতে চেয়েছিল। গুরুপদ মানা করল। পরের ছেলেকে বিদেশ-বিভুঁইয়ে বাইরে শুতে দেওয়া উচিত নয়। সে নিজে গিয়ে দেখে এসেছে টেম্পু। নিশ্চিত হয়েছে।

জয়দেবের ঘুম পাতলা, কানাই তাকে ঠেলা মারতেই সে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। কাল রাতে দেরীতে ঘুম এসেছে তার, ইরার মুখখানা শোওয়ার আগে বিব্রত করেছে তাকে। যে আশা নিয়ে তার এখানে আসা, তার সিকি ভাগও ফল পেল না সে। ইরার মন বোঝা দায়, ভালবাসার কথা তো দূরে থাক, ভাল মতো সে কথাও বলে নি। মেয়েদের মন পেতে গেলে আর কী কী সাধ্য-সাধনা করতে হয় জয়দেবের তা জানা নেই। কানাই তার মন বেজার দেখে বলেছিল, অত সহজে চাঁদ ধরবে তা কি হয়? অপেক্ষার ফল মিষ্টি।

কানাইকে জয়দেব কিছু বলে নি তবু সে জেনে গিয়েছে কী ভাবে। দিনের প্রথম আলোয় জয়দেব চাইছিল ইরার মুখ দেখতে। ইরা বিছানা ছেড়ে চলে গিয়েছে রান্নাঘরে। চায়ের জল চাপিয়ে গালে হাত দিয়ে বসে আছে সে। তার যে এত কিসের চিন্তা কাননও বুঝতে পারে না। নরম আদুরে আলোয় ভরে উঠছে চারপাশ। অন্ধকারের চাদর সরে গেছে বহু দূরে। এ অঞ্চলে কত যে পাখি আছে যাদের সমবেত ডাক শুনে বোঝা যাবে না নির্দিষ্ট পাখির নামগোত্র। সাত রঙা আলোর চাইতে পাখির ডাক আরও বিচিত্র। কোয়ার্টারের পিছনে ক্যাচকোচ পাখির দল থপথপ লাফাতে লাফাতে আতাগাছের চিকন ডালে গিয়ে বসেছে, দু-একটা পাখি শুকনো পাতায় লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। ওদের ঘুম কি মানুষের মত সাত তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়? ছেলেমানুষের মতো প্রশ্নটা জয়দেবের মনে উদয় হয়ে জলের দাগের মতো মুছে যায়। ওদেশে তার বাল্য-শৈশব কেটেছে, নদীমাতৃক দেশে গাছপালার যেমন অভাব নেই তেমনি অভাব নেই পক্ষীকূলের। কত যে নাম না জানা পাখি চোখের তারায় ঝিলিক মেরে ওঠে। জয়দেবের সব চাইতে প্রিয় পাখি মাছরাঙা। কেন না সব পাখি মাছ খায়, শুধু দোষ হয় মাছারাঙার। তার নিজের জীবনেও এই জলজ পাখিটার প্রভাব আছে যথেষ্ট। কাজ করেও প্রায় সময় বদনামের ভাগীদার হতে হয় তাকে। কানাই তার জীবনের অনেক খবর জানে। সব কথা কানাইকে সে বলতে পারে নি, কানাইয়ের কাছে সে খোলা আকাশের মত স্বচ্ছ নয়।

চা নিয়ে এল কানন, চোখে-মুখে বিচ্ছেদ বেদনার চিহ্ন। চায়ের কাপটা জয়দেবের হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্থানুবৎ দাঁড়াল, আমাদের অভাবের সংসারে তুমি যে এক বেলা কাটিয়ে গেলে এটা আমাদের কাছে বড় পাওয়া। সময় পেলেই চলে এসো বাবা। এ দেশে তোমার তো তেমন কেউ নেই। ভেবো আমরা তোমার আত্মীয়।

কাননের আন্তরিকতায় ভরা কথাগুলো মন ভরিয়ে দিল জয়দেবের, সাতপাঁচ না ভেবেই সে বলল, আবার আমাকে আসতে হবে। আমি যাদের সঙ্গে মিশি সর্বস্ব দিয়ে মিশি। আমার মেলামেশায় কোনও ফাঁকি নেই।

আমি তা জানি বাবা।

জয়দেব নেশায়-বুঁদ পাখির চোখে তাকাল। ইরার চোখে চোখ না ফেলে সে বেশিদিন থাকতে পারবে না। সময়ের খাঁচা ভেঙে তাকে উড়ে আসতেই হবে। দূরত্ব কোনও বাধা নয়। ইরার সঙ্গে দেখা না হলে তার জীবন এলোমেলো বয়ে যেত। সে বুঝতে পেরেছে

একমাত্র ইরাই পারে তার মরুভূমি জীবনে শীতল ঝর্ণার স্রোত বইয়ে দিতে। বয়সের আগুন যখন মনকে পোড়ায়, যৌবন যখন বেগবান নদীর চেয়েও উচ্ছল তখন কে তাকে ঠেকিয়ে রাখবে সংযমের অনুশাসনে।

টেম্পুটা সারারাত হিম খেয়েছে, ওর ধাতব শরীরে হাত দিতেই চমকে উঠল জয়দেব, শীতল স্পর্শানুভূতিতে রোমাঞ্চিত হল সে। আমগাছের হলুদ পাতা ঝরে পড়েছে টেম্পুর উপর। কানাই ওগুলো সাফ-সুতরো করে জয়দেবকে বলল, ওস্তাদ, এবার যাওয়া যাক।

জয়দেব স্টিয়ারিং-এ হাত ছোঁয়ানোর আগে গুচ্ছ খানিক ধূপ জ্বেলে কালীঠাকুরের ফোটোর নিচে রাখল। কপালে ভক্তি ভরে হাত ঠেকিয়ে চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দিতে চাইল গাড়িটা। রাতের ঠাণ্ডায় পুরনো ইঞ্জিন বার তিনেক শব্দ করল শুধু, তারপর আবার চুপ মেরে গেল। কানাই টেম্পুর সামনে এসে জিরাফের মত গলা বাড়িয়ে বলল, বুড়ো ঘোড়ার রাগ হয়েছে। ওর মান ভাঙাতে হবে ওস্তাদ। পেছনে ঠেলা না মারলে ছুটবে না।

বিল্টু পল্টু আর গুরুপদর হাত লাগল টেম্পুর পেছনের ডালায়। কানাই গেল সামনে। আমপাতার উপর দিয়ে কিছুটা গড়িয়ে গাড়িটা স্টার্ট নিল গরগরিয়ে। কেঁপে উঠল টেম্পুর লজঝড় বডি। যান্ত্রিক শব্দে কাঁপন উঠল বাতাসে। স্টিয়ারিং-এ হাত বিছিয়ে উদাস হয়ে গেল জয়দেব। বকফুল গাছটার গোড়ায় সে কাউকে দেখতে পেল না। এত সকালে ইরা আবার কোথায় গেল? যাওয়ার সময় তাহলে কি দেখা হবে না? ইচ্ছে করেই হর্ণ বাজাল জয়দেব। একবার নয়, অনেকবার। ইরা তবু এল না। গুরুপদ কী ভেবে ঘরের দিকে তাকাল। কাননও পলকহীন চোখে তাকিয়ে ছিল। পল্টু কী বুঝে ঘরের দিকে ছুটে গেল ইরাকে আশেপাশে দেখতে না পেয়ে ফিরে এল সে।

জয়দেবের মুখে কেউ যেন কালি ঢেলে দিয়েছে এমন করুণ মুখ করে সে কাননের দিকে তাকাল, মাসীমা, আসি।

আবার এসো বাবা। কানন বোকার মত দাঁড়িয়ে থাকল।

শেষ বারের মতো হর্ণ বাজিয়ে হাসপাতালের মাঠ পেরিয়ে টেম্পুটা সোজা উঠে এল পাকা রাস্তায়। কিছুক্ষণ পরেই টেম্পুটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

গুরুপদর কপালের শিরা দপদপিয়ে উঠল রাগে, তার চোখ ইরাকেই খুঁজছিল। কপালের দপদপানী থেকে রেহাই পাবার জন্য গুরুপদ বিড়ি ধরাল শূন্য চোখে তাকিয়ে। কানন পাশে দাঁড়িয়ে কোন কথা বলল না। পল্টু দুমদাম করে বলল, দিদিটার কোনও আক্কেল নেই। জয়দেবদা কী মনে করল বল তো? অমন মুখ করে থাকলে আর কোনদিন আসবে না।

কানন কথা বলার সূত্র খুঁজছিল, পল্টুর কথায় ফেটে পড়ল সে, পাগলও নিজের ভালো বুঝতে পারে। লেখাপড়া জানা মেয়ে যদি চালকুমড়ো হয়ে যায় ছেলে দেখে, তাহলে আমি আর কী করতে পারি! আমার ইচ্ছে করছে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ওকে ঘর থেকে বের করে দিতে।

—গলা চড়িও না, ঘরে চলো। গুরুপদর ধমক খেয়ে কানন পিন ফুটান বেলুন, মুখ নীচু করে ঘরে ফিরে গেল সে।

দিন যত গেল রোদের তীব্রতা বাড়ল চরম। গরম হাওয়া ছুটে এসে দখল নেয় সবুজের ঘামে চ্যাটচ্যাট করে শরীর। গুরুপদর মনে কোন সুখ নেই। মাসের পাঁচ তারিখে তা

হাত বল খেলার ফাঁকা মাঠ। অভাব শিকড় ছড়ায় সংসারে। ডিউটি যাওয়ার সময় প্রায় দিন খিটিমিটি লাগায় কানন। ইরা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সব শোনে। এ সংসারে ঝগড়াঝাঁটি চালের কাঁকরের চেয়ে সহজলভ্য। পল্টুর তো পড়াশোনায় কোন মন নেই। সকাল হলেই ঘর ছেড়ে চলে যায়, খাওয়ার সময় ফেরে। পল্টু ডাংগুলি খেলতে ওস্তাদ। কাচের গুলি তার পকেটে থাকে সবসময়। গুরুপদকে সে কেয়ারই করে না। বকলে-ঝকলে পল্টু বলে, চুপ করো। আমাকে পড়ার কথা বলো না। পড়তে বসলে আমার খুব খিদে পায়।

পল্টুর কথা শুনে চোখে জল এসে যায় ইরার। ভাইয়ের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, চুপ কর ভাই। অমন কথা বলতে নেই।

পল্টু ফিচেল চোরের মত হাসে, জয়দেবদা আসলে আর একদিন মাংস ভাত খাওয়া যেত। তোর জন্য কেস সব গুবলেট হয়ে গেল।

আমার জন্য? ইরা আকাশ থেকে পড়ল।

পল্টু বলল, আলবাৎ তোর জন্য! জয়দেবদা আসলে তোর মুখে হাসি ফুরিয়ে যায়। তোর মুখ হরিতকীর মতন দেখায়।

অভাবের উইপোকা ছ্যাঁদা করে দিয়েছে পল্টুর মন। এত অল্প বয়সে সে বুড়োদের ঢঙে কথা বলে। কোথায় কি বলতে হবে ঐ বোধ তার হয়নি। কথা বলতে হয় বলেই বলে দেয় সে।

গুরুপদ অনেক বলে কয়ে 'কিচেন ডিউটি' পেয়েছে। কিচেন ডিউটিতে খাটুনি থাকলেও পুষিয়ে যায়। অন্তত একটা পেট নিয়ে ভাবতে হয় না। এই বাজারে এটাই বা কম কিসে? খুব ছোটবেলা থেকে স্বপাক খাওয়ার স্বভাব গুরুপদর, রান্নার উপর তার সহজাত টান। রোগীদের রাঁধাবাড়া করতে গেলে তার হাতটা আরও ছোট হয়ে আসে, সে তখন হাড় কৃপণ। রোগীদের বরাদ্দ তেল-তরকারি, চাল-ডাল সব কিছুই সরিয়ে রাখে গোপনে। প্রথম প্রথম এসবে মন সায় দিত না। এখন সব গা সওয়া। কুড়ি বেডের হাসপাতালে রুগীর সংখ্যা ত্রিশের বেশি। ইউনিসেফ এর ছাপ লাগানো একটা অ্যাম্বুলেন্স আছে হাসপাতালে। মর মর রোগী এলে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সদরে।

বড় ডাক্তার মাটির মানুষ। আট বছর তার এই গ্রামে কাটল। গুরুপদর দুঃখ দুর্দশার কথা শুনে তিনি বললেন, ঠিক আছে 'কিচেন ডিউটি' তোমাকে দেওয়া হল। পেটে খিদে মুখে লাজ রেখে কাজ করো না। বিশ জনের জায়গায় একজন যদি বেড়ে যায় আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই। তবে বুঝে শুনে খেও।

মুখ শুকিয়ে আমআঁটি হয়ে গিয়েছিল গুরুপদর। বড় ডাক্তার তার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, তুমি যেমন বাড়তি খাটবে পেটে খেয়ে তা পুষিয়ে নেবে। তবে দেখো নিজের পেট ভরাতে গিয়ে অন্যের পেটে যেন টান না ধরে।

খুব সকালে চা খেয়ে গুরুপদ চলে আসে হাসপাতালের কিচেনে। ওখানে সাত-সতের ঝামেলা। কয়লা ভেঙে আঁচ ধরাতে হয় তাকে, মাছের আঁশও ছাড়াতে হয় যত্ন নিয়ে। কিচেন কন্ট্রাক্টরের লোক এসে রোজ সকালে সেন্টার রুম থেকে বের করে দেয় চাল ডাল আটা। রুগী পিছু মাপ আলাদা। সকালে চা দুধ রুটি বিস্কুট। দুপুরে ভাত তরকারি ডাল মাছের ঝোল। কোনদিন ডিম বা মাংস। রাতে বেশির ভাগ রুগীর বরাদ্দ দুধ-পাউরুটি। যারা হাসপাতালের ডায়েট খায় না তাদের কথা আলাদা। যারা খায় তারা তো গোগ্রাসে

কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে। স্বপ্ন দেখতে কে না ভলবাসে? ইরার চোখ দুটোয় জোনাকি জ্বলা আলো সর্বদা। মঙ্গল ওর হাত ধরে বলল, তোমাকে যেদিন দেখলাম সেদিন থেকে আমার আর পড়াশুনাতে মন নেই। তুমি আমার মন চুরি করেছ, আমি তোমাকে শাস্তি দেব।

যা খুশি করো। ইরার চোখ আধো বোজা।

মঙ্গল হাতের যাদুটানে ইরাকে বুকের কাছে টেনে আনে, ঠোঁট ছুঁয়ে দেয় ঠোঁট। সেই থেকে পাগল হয়ে যায় ইরা। স্বপ্নে ঘুরে ফিরে আসে চুম্বনের দৃশ্য। বুকের হাওয়া গরম হয়ে ওঠে। জয়দেবের কথা তার মনে পড়ে না।

দুপুরের বাসে মঙ্গল চলে গেল এক রাশ শূন্যতা ছুঁড়ে দিয়ে। ইরা ভাবছিল তার নিজের কথা। এভাবে সে হেরে যাবে ভাবে নি। মঙ্গল তাকে হারিয়ে দিয়েছে কথার মায়ায়। ছেলেটি যাদু জানে বুঝি। ইরা ঠোঁট কামড়ে ধরল আনমনে। আবেগের ঘোরে এ কী করেছে সে? প্রেমের সমুদ্রে ভেলা ভাসালে তা অনেক সময় ডুবে যায়। কটা প্রেম আর কিনারা খুঁজে পায়? মাধবী আশাবাদী। ঠোঁটে হাসনুহানার হাসি ছড়িয়ে বলে, তোমার ভাগ্যটা ভাল। তুমি আমার দাদাকে পাগল করে দিতে পেরেছ। সে যে কী ভাবে কলকাতায় থাকবে কে জানে!

সময় ঠিক চলে যাবে। ইরার ছোট্ট জবাব।

মাধবী গায়ে টোকা মেরে হাসে, তোমাকে কি বেশি কথা বলতে নেই? আমি তো শুনেছি মেয়েরা প্রেমে পড়লে বাচাল হয়ে যায়। তোমার বেলায় সব দেখছি উল্টো!

তুমি যাকে প্রেম বলছ, সেটা কি প্রেম?

প্রেম নয়তো কি? মাধবী শরীর দুলিয়ে হাসল, লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট—কথাটা কি ভুল হবে?

ইরা চুপ করে থাকতেই মাধবী তার হাত ধরে টানল। হাসপাতালের গেট থেকে ওরা হেঁটে এল বকফুল গাছটার গোড়ায়। জাফরি কাটা অলোয় পৃথিবীর কোনও অসুখ নেই। ইরা তবু মুখ ভার করে বলল, শরীরে দাগ লেগে গেলে সহজে মোছে না।

চমকে উঠল মাধবী, বিয়ের আগে কারোরই দাগ লাগান উচিত নয়।

তুমি যা ভাবছ আমি সেই দাগের কথা বলিনি।

তাহলে কী বলছো তুমি?

ইরার ঠোঁট কেঁপে উঠল, তুমি রাগ না করলে একটা কথা বলি। তোমার দাদা পড়াশোনায় ভাল কিন্তু ওর প্রেমটা তত ভাল নয়। জানো সে আমাকে....। ইরা থেমে গেল। ঠোঁটে ছোঁয়াল তর্জনী। চোখে ফোঁটা ফোঁটা জল। চোখের জলে সে ধুয়ে ফেলতে চাইল ঠোঁটের কষ। দাগ, চিহ্ন।

॥ ৪ ॥

অভাবের দাঁড়িপাল্লা এক দিকে ঝুঁকে থাকে।

জগতখালি বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে ইরার চোখ আটকে গেল দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের দিকে। শস্য ভরা খেত যেন হাতছানি দিয়ে ডাকল। ইরার মন চাইল পালিয়ে যেতে কিন্তু পায়ে তার শাসনের বেড়ি। এত মাঠ তবু মানুষের কেন অভাব ঘোচে না! মাঠগুলো যদি তার হোত তাহলে সে অকাতরে বিলিয়ে দিত সবার মাঝে। এই রকম ছেলেমানুষী ভাবনা মাঝে মধ্যেই চাড়া দিয়ে ওঠে ইরার। তখন সে হাত কামড়ায়। নিজের অক্ষমতাকে দোষ দেয় তার যে কিছু করার নেই বুঝতে পারে।

বড় বাঁধের উপর উঠে এসে পুরো পৃথিবী দু-চোখের ফ্রেমে ধরা দেয়। যত দূর চোখ যায় জমি সবুজ হয়ে আছে ফসলে। সমতল ভূমির উপর বাবলা খেজুরগাছ ঝাঁকড়া দেহ নিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অতন্দ্র প্রহরীর ঢঙে। এদিকে মাঠ-পালান হাওয়ার চলাচল খুব বেশি। অনেক বছর আগে বাঁধের গোড়া ছুঁয়ে বয়ে যেত বুড়ি গাঙ, সময়ের ধাক্কায় গাঙ্গ সরে গিয়েছে মাইল দেড়েক দূরে, এখন পলিপড়া জমিগুলোতে বীজ বুনলেই ফসল চাষ-আবাদ ভাল হয়।

এই পথেই ইরার এখন যাতায়াত। টিউশানিটা দেখে দিয়েছে মাধবী, জানাশোনার মধ্যে রবিবার বাদে সব দিন পড়াতে হয়। মাস ফুরোলে টাকা। সংসারে তার মন ফিরেছে বলে গুরুপদ বেজায় খুশি। কানন স্টাফের লোকেদের কাছে গর্ব করে বলে, আমার মেয়ের মত মেয়ে হয় না।

ওরা যা আশা করে ইরা তার কতটুকুই বা দিতে পারে? টিউশানির সামান্য কটা টাকা ছাড়া তার আর কিছু দেওয়ার নেই। গুরুপদ তার কষ্ট দেখে বলল, না পোষায় ছেড়ে দে। সোমত্ত মেয়ে ঘরের বাইরে বেরলে চিন্তা বাড়ে। দিনকাল খারাপ। কার মনে কী আছে বোঝা দায়।

অভাবে স্বভাব নষ্ট কথাটা গুরুপদর বেলায় খাটে। এ মাসে যা বেতন পেল ধার শোধ দিতে তা ফুরিয়ে গেল। পল্টু হাত-পা নেড়ে বলল, বাবাকে দিয়ে আর কোনো কাজ হবে না। কানন পান চিবিয়ে বলল, ধার করা যার স্বভাব, মরলেও তার স্বভাব বদলাবে না। আমি আর কত বলব। বোঝালেও যে বোঝে না তার কাছে মুখ খোলা অন্যায়।

অভিজিৎ ক্লাস ফোরের ছাত্র। বুদ্ধিশুদ্ধি ভাল হলেও সে বড্ড ফাঁকিবাজ। একটু চোখের আড়াল হলেই সে খেলা নিয়ে মেতে ওঠে। পড়তে বসলে চোখ চলে যায় সামনের মাঠে বইয়ের পড়া থেকে বাইরের দৃশ্য দেখতে তার ভাল লাগে।

ইরা তাকে শাসনে আনতে চায় কিন্তু পারছে না। বড় লোকের ছেলের শতেক ঝামেলা কান মুলে দিলে চোখ ভাসিয়ে কাঁদে। অভিজিৎ-এর মা তখন কেমন করুণ চোখে তাকায় ইরা সেই চাহনির অর্থ বোঝে। তার হাত শাসন করতে ভুলে যায়। তবু পড়াতে বসলে ইরা পুরোদস্তুর দিদিমণি। হাসে না, কম কথা বলে।

বাঁধের ধারে এলে ইরার প্রতিদিন মনে হয় এই মাটির ঢিবিটার সঙ্গে তার বহুদিনের জানা-শোনা। মাধবী তার মনের কথা শুনে হাসে। বাঁধ নিয়ে তার ব্যাখ্যা অন্যরকম। মাধবী বলে, বাঁধের দরকার আছে বই কি! বাঁধ না থাকলে সব কিছু ভেসে যেত। গঙ্গার জল অনায়াসে উঠে আসত উঠোনে।

বাঁধ শুধু গঙ্গার জল নয় মানুষের আবেগকে বাধা দিতে দরকার। বুনো আবেগে অনেক কিছু ভেসে যায়। মাধবী বলে, বাঁধের যে কী প্রয়োজন তা খরার মরশুমে বোঝা যাবে না। বর্ষা আসলেই রূপ বদলে যায় বাঁধের। দূরে সরে যাওয়া বুড়ি গাঙ বাঁধের গোড়ায় বিষ ঢালে। মাটি সরে যায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে। তখন বিপদের কড়া নাড়া শুনতে পাওয়া যায়।

দূরের গ্রামগুলো বাঁধের উপর থেকে কালো ফুটকির মতো দেখায়। ইরার ইচ্ছে করে ঐ অচেনা, অদেখা গ্রামগুলোয় চলে যেতে। একা একা পথ চললে সুখের মুহূর্তগুলো মনের দরজায় টোকা মারে। ঘরের কথাও মনে পড়ে। গুরুপদ পয়সার চিন্তায় ঘুমোতে পারে না। কিচেনের ডিউটি সেরে সে প্রায় দিন চলে যায় ভ্যাসেক্‌টমির কেস ধরতে। কেস পেলে নগদ কিছু আয় হয়। কানন খবরের কাগজ কিনে ঠোঙ্গা বানায়। গুরুপদ ঘরে থাকলে তাকে সাহায্য করে। বিল্টু-পল্টুর পা ঘরের মেঝেতে দাঁড়ায় না। খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকলে গুলতি হাতে ওরা চলে যায় ডাহুক মারতে। বনবাদাড়, খামারঘর, বাঁধের ধার কোনকিছুই ওদের বাদ যায় না। পালডোবা থেকে এঁটেল মাটির কাদা এনে ভেঁটুল বানায় পল্টু। ছাদের উপর শুকোতে দেয়। শুকনো খটখটে ভেঁটুল কাঠকয়লার আগুনে পোড়ায় তারপর পকেটে পুরে দে ছুট! ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবে ইরার অত দম নেই। টিউশানি সেরে ফেরার সময় সন্ধ্যে লাগে বাঁধের গোড়ায়। পশ্চিমের সূর্যটা লাল কম্বল গায়ে জড়িয়ে ডুব দেয় বুড়ি গাঙের তুঁতে গোলা জলে। মাঠচরা পাখিগুলো ডানা ভাসায় আকাশে, ক্লান্ত বকের দল তড়িঘড়ি পেরিয়ে যেতে চায় আকাশের সীমানা। ঘরে ফেরা গোরুর ক্ষুরে ধূলো ওড়ে অহরহ। ইরার শাড়ির আঁচলও মাঠ পালান হাওয়ায় বুকের বাগান থেকে উড়ে যেতে চায় প্রজাপতি হয়ে।

অশ্বত্থ গাছের কাছে পথ ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে গ্রামের ভেতর। পথ নয় তো যেন একটা চ্যাপ্টা সাপ গ্রামের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। বাঁধের উপর সন্ধ্যা নামলে লোক চলাচল কমে আসে। আকাশ সাক্ষী রেখে জগতখালির বাঁধ তখন ঘুমের বিছানা পাতে। ফেরার সময় ইরার পা চলে দ্রুত। আশেপাশে শব্দ হলেই ভয়ে তার বুক শুকিয়ে যায়। নির্জন বাঁধের উপর ইরার বড্ড ভয় করে। রোজই ভাবে—তাড়াতাড়ি ফিরবে তা আর হয়ে ওঠে না।

ইরা ভয় দুরু দরু বুকে ফিরছিল। গাঙ পালান হাওয়া লকলকে জিভ দিয়ে চেটে দিচ্ছিল শরীরের ঘাম। আরাম বোধ হওয়ার কথা তবু তার স্বস্তি হল না। হেঁটে এল পাকুড়গাছের কাছে। আবছা আঁধারে ফিসফিসিয়ে কথা বলছিল কারা। বিপদরে গন্ধ পেয়ে ইরা সতর্ক চোখে তাকাল। যত দূর নজর গেল কাউকে দেখতে পেল না সে। ঢালু পথ দিয়ে নামতে যাবে তখনই একটা ঢিল উড়ে এসে পড়ল তার বুকের উপর। মুখ শুকিয়ে ইরা চারপাশে তাকাল। ভেসে এল বিশ্রী হাসির ঢেউ। কিছু পরে রোগা লম্বা খিটখিটে একজন যুবক এগিয়ে এল তার সামনে। হাসতে হাসতে বলল, এ পথে হাঁটো, ভয় করে

বাঁধের ধারে এলে ইরার প্রতিদিন মনে হয় এই মাটির ঢিবিটার সঙ্গে তার বহুদিনের জানা-শোনা। মাধবী তার মনের কথা শুনে হাসে। বাঁধ নিয়ে তার ব্যাখ্যা অন্যরকম। মাধবী বলে, বাঁধের দরকার আছে বই কি! বাঁধ না থাকলে সব কিছু ভেসে যেত। গঙ্গার জল অনায়াসে উঠে আসত উঠোনে।

বাঁধ শুধু গঙ্গার জল নয় মানুষের আবেগকে বাধা দিতে দরকার। বুনো আবেগে অনেক কিছু ভেসে যায়। মাধবী বলে, বাঁধের যে কী প্রয়োজন তা খরার মরশুমে বোঝা যাবে না। বর্ষা আসলেই রূপ বদলে যায় বাঁধের। দূরে সরে যাওয়া বুড়ি গাঙ বাঁধের গোড়ায় বিষ ঢালে। মাটি সরে যায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে। তখন বিপদের কড়া নাড়া শুনতে পাওয়া যায়।

দূরের গ্রামগুলো বাঁধের উপর থেকে কালো ফুটকির মতো দেখায়। ইরার ইচ্ছে করে ঐ অচেনা, অদেখা গ্রামগুলোয় চলে যেতে। একা একা পথ চললে সুখের মুহূর্তগুলো মনের দরজায় টোকা মারে। ঘরের কথাও মনে পড়ে। গুরুপদ পয়সার চিন্তায় ঘুমোতে পারে না। কিচেনের ডিউটি সেরে সে প্রায় দিন চলে যায় ভ্যাসেক্টমির কেস ধরতে। কেস পেলে নগদ কিছু আয় হয়। কানন খবরের কাগজ কিনে ঠোঙ্গা বানায়। গুরুপদ ঘরে থাকলে তাকে সাহায্য করে। বিল্টু-পল্টুর পা ঘরের মেঝেতে দাঁড়ায় না। খাওয়া-দাওয়ার পাঠ চুকলে গুলতি হাতে ওরা চলে যায় ডাহুক মারতে। বনবাদাড়, খামারঘর, বাঁধের ধার কোনকিছুই ওদের বাদ যায় না। পালডোবা থেকে এঁটেল মাটির কাদা এনে ভেঁটুল বানায় পল্টু। ছাদের উপর শুকোতে দেয়। শুকনো খটখটে ভেঁটুল কাঠকয়লার আগুনে পোড়ায় তারপর পকেটে পুরে দে ছুট! ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবে ইরার অত দম নেই। টিউশানি সেরে ফেরার সময় সন্ধ্যে লাগে বাঁধের গোড়ায়। পশ্চিমের সূর্যটা লাল কম্বল গায়ে জড়িয়ে ডুব দেয় বুড়ি গাঙের তুঁতে গোলা জলে। মাঠচরা পাখিগুলো ডানা ভাসায় আকাশে, ক্লান্ত বকেব দল তড়িঘড়ি পেরিয়ে যেতে চায় আকাশের সীমানা। ঘরে ফেরা গোরুর ক্ষুরে ধূলো ওড়ে অহরহ। ইরার শাড়ির আঁচলও মাঠ পালান হাওয়ায় বুকের বাগান থেকে উড়ে যেতে চায় প্রজাপতি হয়ে।

অশ্বত্থ গাছের কাছে পথ ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে গ্রামের ভেতর। পথ নয় তো যেন একটা চ্যাপ্টা সাপ গ্রামের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে। বাঁধের উপর সন্ধ্যা নামলে লোক চলাচল কমে আসে। আকাশ সাক্ষী রেখে জগতখালির বাঁধ তখন ঘুমের বিছানা পাতে। ফেরার সময় ইরার পা চলে দ্রুত। আশেপাশে শব্দ হলেই ভয়ে তার বুক শুকিয়ে যায়। নির্জন বাঁধের উপর ইরার বড্ড ভয় করে। রোজই ভাবে—তাড়াতাড়ি ফিরবে তা আর হয়ে ওঠে না।

ইরা ভয় দুরু দরু বুকে ফিরছিল। গাঙ পালান হাওয়া লকলকে জিভ দিয়ে চেটে দিচ্ছিল শরীরের ঘাম। আরাম বোধ হওয়ার কথা তবু তার স্বস্তি হল না। হেঁটে এল পাকুড়গাছের কাছে। আবছা আঁধারে ফিসফিসিয়ে কথা বলছিল কারা। বিপদরে গন্ধ পেয়ে ইরা সতর্ক চোখে তাকাল। যত দূর নজর গেল কাউকে দেখতে পেল না সে। ঢালু পথ দিয়ে নামতে যাবে তখনই একটা ঢিল উড়ে এসে পড়ল তার বুকের উপর। মুখ শুকিয়ে ইরা চারপাশে তাকাল। ভেসে এল বিশ্রী হাসির ঢেউ। কিছু পরে রোগা লম্বা খিটখিটে একজন যুবক এগিয়ে এল তার সামনে। হাসতে হাসতে বলল, এ পথে হাঁটো, ভয় করে

না?

ইরা মুখ নীচু করে দাঁড়াল।

রোগা ছেলেটা বলল, পথে হাঁটলে খাজনা দিতে হয়। তোমার কাছে বেশি চাইব না, শুধু একবার বাঁধের নীচে দেখা করো।

ইরার কান দিয়ে গরম হাওয়া বেরিয়ে এল, এ জাতীয় কু' প্রস্তাব তার জীবনে প্রথম। টান টান শরীর ঝুঁকে পড়তে চাইল মাটিতে। মুখের স্বাভাবিক রঙ হারিয়ে গিয়ে সিঁদুরে আমের দশা হল। আঁচলে তর্জনী জড়িয়ে জড়তা কাটাতে চাইল সে। ছেলেটা রেগে উঠল, দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, কথাটা বুঝি মনে ধরে নি? মনে না ধরলেও আমার কিছু করার নেই। আমার মন যা চায়, আমি তা বলি। আমার ভেতরে কোনও লুকাছাপা নেই। খাপখোলা তরবারি দেখেছো? আমি সেই খাপ খোলা তরবারি! আমার কথা না শুনলে তুমি ফতুর হয়ে যাবে।

আমাকে ফতুর করার আপনি কে? ইরার ঠোঁট শক্ত হল।

আমি কে, তুমি জান না বুঝি? তা জানবে কী করে? নতুন এসেছ। পুরনো হলে সব জেনে যাবে। রোগা ছেলেটার চোখ দুটো হয়ে উঠল ইটভাটা।

ইরা কঠিন চোখে তাকাল, আমাকে যেতে দিন।

যদি না যেতে দিই।

আমি তাহলে চিৎকার করব।

ব্যস, এতটুকু জোর তোমার! চিল্লাও দেখি তোমার গলায় কত জোর। ছেলেটা খ্যা খ্যা করে হাসল, চিল্লালেও কেউ আসবে না। ঐ গাছগুলো দেখছো? আমাকে দেখলে এ গ্রামের মানুষ ভয়ে গাছ হয়ে যায়।

আপনি কী চান? ভয়ে ভয়ে বলল ইরা।

বললাম তো একবার। একই কথা বারবার বলা কি ভাল শোনায়? ছেলেটা ইরার হাত ধরল, ঈষৎ মুচড়ে দিয়ে বলল, আজ যাও। তবে তৈরী থেকো। খাজনা আমি নেবই। ইরার পা কেঁপে উঠল। ছাড়া পেয়েও সে ছুটতে পারছে না। রোগা ছেলেটা সিগারেট ধরিয়ে তার দিকে চেয়ে আছে। ব্যাঙ লাফান বুকের উপর হাত চেপে ইরা চাইল প্রাণপনে ছুটে আসতে। পিছন ফিরে তাকাবার সাহস নেই তার। আগুন উগরান চোখে ছেলেটা চেয়ে আছে। তাকে খাজনা দিতে হবে। কী সাহস ছেলেটার! যেন জোর যার মুলুক তার। ইরার গলার ভেতরটা চ্যাটচেটে হয়ে উঠল। ভীষণ কান্না পেল তার।

সিমেন্টের খুঁটির উপর তারের বেড়া। উচ্চতায় পাঁচ ফুটের কম হবে না। গ্রামের মানুষ যাতায়াতের সুবিধার জন্য পাঁচিল ভেঙে দিয়েছে একটু একটু করে। ইটগুলো লেগে গিয়েছে তাদেরই প্রয়োজনে। এখন হাসপাতালের মাঠের মধ্যে দিয়ে পাকা রাস্তায় যাওয়ার শর্টকাট পথ। এই পথ দিয়ে বিকালে নির্ভাবনায় হেঁটে গিয়েছিল ইরা। এখন তাড়াহুড়োতে হাঁটতে গেলে বুক কাঁপে। বুকের চারপাশে শুরু হয় উদ্বেগজনিত ভয়ের মিশ্র প্রতিক্রিয়া। লম্বা রোগা ছেলেটার চোখ দুটোয় কাঁচা চিবিয়ে খাওয়ার নেশা ছিল। এত ভয়ঙ্কর হিংস্র চতুর চোখ ইরা এর আগে দেখে নি। এত দিনের যাতায়াতে ওই ছেলেটাকে ইরা কোনদিন দেখে নি। জঙ্গল খেদান বাঘের মতো সে বুঝি সহসা গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়েছে। ইরার শ্বাস আটকে যাওয়ার উপক্রম হয়। ঘন ঘন ঢোক গেলে সে। তবু কিছুতেই সে ঐ হিংস্র

রাক্ষস মুখখানা বিস্মৃত হতে পারছে না।

ঘরে না গিয়ে তরাস বুকে ইরা মাধবীর মুখোমুখি দাঁড়াল। অন্ধকারে তার চোখের জল চিকচিকিয়ে উঠল। মাধবীর হাত ধরে ভেঙে পড়া গলায় বলল, আজ আমার সর্বনাশ হয়ে যেত। এইমাত্র একটা রোগা চিতাবাঘ আমাকে খেতে এসেছিল বাঁধের গোড়ায়। আকাশ থেকে পড়ল মাধবী, কী বলছ এসব?

ইরা আঁচলে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল, হ্যাঁ যা বলছি তা সত্যি। আমি আর টিউশনি পড়াতে যাব না। ভয়ে নীল হয়ে গেল ইরার মুখের চেহারা, কাঁপা গলায় বলল, জানো আজ অশ্বত্থতলায় একটা রোগা মতন ছেলে জোর করে আমার হাত ধরল। কী ভয়ঙ্কর ওর চোখ দুটো, যেন আগুন ঠিকরাচ্ছিল। আমাকে কত খারাপ খারাপ কথা বলল।

এত ভয় পেলে চলে? মাধবী সাহসী হবার চেষ্টা করল, ছেলেটা তোমাকে আর কী বলেছে শুনি?

ও আমাকে বাঁধের নীচে দেখা করতে বলেছে। ইরার ফোঁপানী বেড়ে গেল, এর আগে আমাকে কেউ এত বাজে কথা বলে নি। কথাটা শোনার পর থেকে আমার মরে যেতে মন করছে।

ভেঙে পড়ো না, নিজেকে শক্ত রাখো। মাধবী অন্ধকারে হাতড়াতে লাগল সম্ভাব্য দাগী মুখগুলো। কূল কিনারা খুঁজে না পেয়ে অসহায় চোখে তাকাল, ছেলেটা কেমন দেখতে বলতো?

রোগা লম্বা। গায়ে এক ফোঁটা মাংস নেই মনে হল। তবে চোখ দুটোয় রাজ্যের খিদে। যেন কাঁচাই গিলে খেয়ে নেবে। ইরার গলার স্বর ভারী হয়ে এল, মুখ নীচু করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সে।

ঘাড়-পিঠ বেয়ে ঘাম চুয়াল মাধবীর, হাতের তালুতে ঘাম মুছে সে শুধোল, ছেলেটার কপালের কাছে কি একটা কাটা দাগ আছে? মনে করো তো। ভয়ে আমার চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছিল, আমি ভাল করে তাকাতে পারি নি।

মাধবী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমাকে যে ধরেছিল আমি তাকে চিনি। ওর নাম পাইলট। দারুণ ডেঞ্জারাস্ ছেলে। এতদিন জেলে ছিল। মনে হয় ছাড়া পেয়েছে।

আমার তাহলে কী হবে? ইরার মুখ শুকিয়ে গেল।

আপাতত টিউশনির টাইমটা বদলে দাও। কপালে ভাঁজ পড়ল মাধবীর, পাইলটকে আমি ভাল মতন চিনি। ওর বাবার টালির কারখানা আছে। অবস্থা ভালই। তবু গ্রামের লোক ওদের এড়িয়ে চলে, তার একমাত্র কারণ হলো পাইলট। তবে তোমার এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এবার থেকে তুমি বাঁধ দিয়ে না গিয়ে বাজার দিয়ে ঘুরে যেও।

মাধবীর কথাগুলো গায়ে মেখে ফিরে আসছিল ইরা। অন্ধকারে ডুবে যাওয়া গাছের মতো ঝাপসা হয়ে আসছিল তার দেহ। দৌড়ে এল মাধবী, তোমার সঙ্গে বাঁধের ধারে যা যা হয়েছে একথা তুমি কাউকে বলবে না। বললে তোমার কোনও সমস্যার সমাধান হবে না বরং দশ কান হলে ঝামেলা বাড়বে।

মাধবী ফিরে গেল।

আমতলায় এসে উদ্বিগ্ন বিল্টুকে দেখতে পেল ইরা। বিল্টু গলায় ঝাঁঝ নিয়ে শুধোল, এ্যায় দিদি, এতক্ষণ কোথায় গেছিলিস রে?

আজ একটু দেরী হয়ে গেল।

একটু নয়, অনেকটা। মা তোর জন্য খুব চিন্তা করছে। পল্টুকে বাঁধের ধারে পাঠাল।

সে কি রে!

হ্যাঁ, পল্টু একা চলে গেল।

তুই ওর সঙ্গে গেলি না কেন? দু-আঙুলে কপাল টিপে ধরল ইরা, কী বোকা ছেলে বল তো তুই।

আমার ভয় করে সেইজন্য যাই নি। বিল্টুর মুখে কথাটা আটকাল না।

ইরার ঠোঁটে অনেকক্ষণ পরে হাসি ফুটল, তুই বড়, না পল্টু বড়?

পল্টু আমার চাইতে ছোট। তবে ওর সাহস আমার চাইতে বেশি। পল্টুর যে সাহস বেশি এটা শুধু ইরা নয় অনেকেই জানে। হেলে সাপের লেজ ধরে সে চরকির মতো ঘুরায় মাথার উপর। কালী পূজোর রাতে হাতে নিয়ে 'দোদমা' ফাটায়। গুরুপদ যখন নাইট ডিউটিতে যেত তখন পল্টুই যেত তাকে হাসপাতাল অব্দি এগিয়ে দিতে।

কানন গর্ব করে বলে, পল্টুর সাহস ঠিক আমার বাবার মতো। তোরা তো জানিস না, তোদের দাদু ছিল নাম করা পালোয়ান। দু'হাতে দুটো ডাকাত চেপে ধরেছিল নিশি রাতে। তার সাহস দেখে থানার দারোগাবাবু তাকে মেডেল দিল। মেডেলটা বহু দিন ছিল ঘরে। একদিন ঐ মেডেল বেচে চাল কিনে আনল বাবা। অত বড় রুপোর মেডেলটা আমাদের পেটের ভেতরে হারিয়ে গেল!

আমতলা থেকে সরাসরি ঘরে না গিয়ে কলতলায় গেল ইরা। ঘামে চ্যাটচ্যাট করছিল গা-গতর। হাত মুখ ধুয়ে ঘরে না গেলে স্বস্তি পাবে না। অন্ধকারে সাপের ভয় মনে এলেও পাইলটের ভয় সব কিছুকে ছাপিয়ে গেল। ঘরে ফিরতেই এক চোট বকাসকা করল কানন। ইরা চুপ করে শুনল। রক্তের ভেতরে ভয়ের বালিহাঁস ডুব সাঁতার কাটছে। কানন তার শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে স্নেহভরা স্বরে বলল, কী হয়েছে রে তোর?

যা গরম পড়েছে, ক'দিন থেকে আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। কানন বলল একটু গরম দুধ খেলেও তো পারিস।

দুধ কোথায় পাব?

কেন তোর বাবাকে বললেই তো এনে দেবে।

বাবার অত টাকা কোথায়? এক রাশ বিষণ্ণতায় মুখ ঘুরিয়ে নিল ইরা।

বিল্টু পাশে দাঁড়িয়ে হাসল, কিচেনে কত দুধ! আমি আর পল্টু গিয়ে তো রোজ খেয়ে আসি।

তোদের বমি পায় না?

বিল্টু সেয়ানা চোখে তাকাল, বমি পাবে কেন? মাকে শুধো। হাসপাতালের দুধে কত টেস্ট!

ইরার সারা শরীর জুড়ে অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হল, এই যন্ত্রণার যে কোথায় শেষ তা সে জানে না। সে শুধু হাঁ-করে বিল্টুর মুখের দিকে তাকায়, না খেয়ে শুকিয়ে মরব তবু ও সব আমি ছোঁব না। সৎভাবে বেঁচে থাকার আনন্দটাই আলাদা।

বসবাসের পর যে কোন ঘরেরই রূপ বদলে যায় প্লাস্টিক সার্জারি করা মেয়ের মুখের মতো। মানুষের হাতের ছোঁয়ায় ঘর যখন বিগত যৌবন ভুলে হেসে ওঠে তখনই স্বর্গ

বুঝি নেমে আসে মাটির পৃথিবীতে। গুরুপদ ঘরে বসে বিড়ি টানছিল, ইরার কথায় স্ফূর্তি বাড়ল তার, মনের খেদ চেপে রেখে বলল, আমি তোর দুঃখটা বুঝি মা, কিন্তু কী করব বল? এত বড় সংসার যে আমাব একার আয়ে চলতে চায় না।

কোনঠাসা কাননের মুখে কোন কথা নেই। এত উঁচু দরের চিন্তা ভাবনা তার মগজে ঢোকে না। কাজের অজুহাতে সে উঠে যায় রান্নাঘরে। মেয়েটার এত বড় নাক উঁচু কথা তার পছন্দ নয়। কাঁটা বাঁশঝাড়ে কীভাবে তরলা বাঁশ জন্মাল এটাই তার চিন্তা।

রাত বাড়ছিল তবু পল্টু ফিরে এল না। ইরার মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল, বাবা, পল্টু যে এখনও এল না?

গুরুপদর ঠোঁট বেঁকে উঠল, দুঃশ্চিন্তাহীন গলায় বলল, পল্টুর জন্য তোর চিন্তা না করলেও চলবে। ও এ যুগের ফিট ছেলে। নদীর এপাড়ে পুঁতে দিলে ওপাড়ে ট্যাক গজাবে।

কানন রান্নাঘর থেকে ফুঁসে উঠল, বাপ হয়ে ছেলেকে পুঁতে দেবে, তুমি কেমন বাপ গো? ছিঃ-ছিঃ, আমার ঘেন্না লাগে এসব কথা শুনলে।

মা-বাবার ঝগড়া শুনে ইরার চুলের গোড়া পর্যন্ত কেঁপে উঠল। কানে হাত দিয়ে চুপচাপ বসে থাকার চেষ্টা করল সে। অধৈর্য গুরুপদ চিৎকার করে বলল, চুপ করো। আমাকে একটু শান্তিতে থাকতে দাও।

রাতে রুটি করল না কানন। কিচেন থেকে আনা পাউরুটিগুলো ভাগ করে দিল সবাইকে। ইরা পাউরুটিতে হাত দিল না, পাত ছেড়ে উঠে গিয়ে বলল, এসব না দিয়ে আমাকে এক শিশি বিষ এন দাও। খেয়ে একেবারে শেষ হয়ে যাই।

খাওয়া থামিয়ে গুরুপদ অসন্তোষ ভরা চোখে তাকাল, চুপ কর। তোর জ্বালায় কি আমরা শান্তিতে বাঁচতে পারব না? গরীবের ঘরে যখন জন্মেছিস তখন অত সাধুগিরি ভাল দেখায় না।

ইরা কোন জবাব দিল না। চোখ ছাপিয়ে জল এল। অনর্গল চোখের ধারায় ভিজে গেল তার মুখমণ্ডল।

গুরুপদ অনুশোচনায় পুড়ছে। মুখ ফাঁক বোয়াল মাছের কায়দায় শ্বাস নিয়ে সে বলল, কংসের কারাগারে কৃষ্ণ জন্মেছে দেখছি। এ তো ভাল কথা। আমি কি শালা চুরি চামারি করতে চাই। অভাবে স্বভাব নষ্ট। খ্যা-খ্যা করে হাসল সে, তারপর ইবার দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যভরা গলায় বলল, রত্নাকর কাদের জন্য চুরি করত? একটা পেটের জন্য কোন মানুষকেই চুরি করতে হয় না।

এত যখন জান তখন ওসব কাজ করো কেন? ইরার ঠোঁট শক্ত হয়ে উঠল।

গুরুপদ ঘায়েল হল না, চুরি না করলে তোরা যে বাঁচবি নে! কটা টাকা আর মাইনে পাই। যা পাই তাতে আমার চলে না।

তোমার চেয়েও কম টাকা মাইনে পেয়ে অনেকেই সুখে আছে। ইরা বুঝিয়ে বলল, বাবা, অভাবের জ্বালা সহ্য করা যায় কিন্তু পাপজ্বালা সহ্য করা যায় না।

অনেক রাতে ঘরে এল পল্টু, এই অল্প বয়সে ওর মুখশ্রীতে বয়স্কতার ছাপ ফুটে উঠেছে। ইরাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলো সে।

রাত বাড়ছিল। হাসপাতালের মাঠে রাতচরা গোরুর দল হামলে পড়েছে ঘাসে মুখ লাগাবার জন্য। ওরা সারাদিন চরে তবু পেট ভরে না। ওদের প্রচণ্ড ক্ষিদে। গোরুগুলোর

মতো মানুষ কি চরিত্র বদলাচ্ছে দিনে দিনে? এই অসম লড়াইয়ে ইরা নিজেকে কোথায় লুকাবে ভেবে পেল না। পল্টু বুড়োদের মত বলল, দিদি, ঘুমিয়ে পড়। রাত জাগলে চোখের নীচে কালি বসবে।

॥ ৫॥

ভূষিমালের দোকানটা ঠিক করে দিল বিশ্বনাথ। গুরুপদর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। চাপড়া থেকে ফেরার সময় পাশাপাশি হাঁটছিল ওরা। এদিকটায় গাছপালার শেষ নেই। ঘন আমবাগান রোদের বিষদাঁত ভেঙে দিয়েছে অনায়াসে। জমাট বাঁধা বাঁশঝাড়ও রোদকে ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখে নি। পঞ্চায়েতী পথ ধরে না গিয়ে মাঠে মাঠে হাঁটছিল ওরা। গুরুপদর মুখে বিড়ি, বিশ্বনাথও ফুঁক ফুঁক করে টানছে। বেশ স্ফূর্তি ভরা মন। হাঁটতে হাঁটতে বলল, দায়ে অদায়ে আমাকে বলো। আমি তো মরে যাই নি। তোমার ছেলেমেয়ে ভুখা থাকলে আমার কি গর্ব বাড়বে? গুরুপদ নরম চোখে তাকাল, তোমার এ ঋণ ভাই আমি জীবনেও শোধ করতে পারব না। আজ তুমি ছিলে বলেই ধারের দোকানটা পেয়ে গেলাম। না হলে এখানে আমাকে কে চেনে।

বিশ্বনাথের বুক ফুলে গেল কথা শুনে, না-না, এ আর তেমন কী করেছি। এটা আমি না করলেও যে কেউ করত। তাছাড়া তুমি তো আমার কলিগ। তোমার জন্য করব না তো কি রাস্তার লোকের জন্য করব?

গুরুপদর বিশ্বনাথ বন্দনা শেষ হয় না, আজকালকার দিনে কে আর কার জন্য করে ভাই? এখন যে যার তার তার।

সে কথা মানছি। বিশ্বনাথ বড় মুখ করে বলল, এখনও সমাজে মানুষ আছে বুঝলে দাদা। নাহলে কবে পৃথিবীটা রসাতলে চলে যেত।

তা যা বলেছ। গুরুপদ জোর করে হাসল।

মেঠো পথে রোদ পড়েছে সরাসরি। চাপড়ার বিলে চিকচিকিয়ে উঠছে জল। কত যে পাখি আসে ওখানে। এখন সবুজ হওয়া আখগাছ নড়ছে হাওয়ায়। চারিদিকে খুশির গন্ধ।

দশ কেজি চাল, পাঁচ কেজি আটা ধারে কিনেছে গুরুপদ। মুদি দোকানী ভাল মানুষ। বিশ্বনাথ আগে থেকে সব বলে রেখেছিল। তবু গুরুপদর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরে বিনা সঙ্কোচে বলল, ধার বাকি দিতে কোন আপত্তি নেই। তবে হাসপাতালের অনেকেই টাকা মেরে পালিয়েছে। মাসেরটা মাসে মিটিয়ে দিলে ভাল হয়।

গুরুপদ কিছু বলার আগেই বিশ্বনাথ তার কথা কেড়ে নিয়ে বলল, দাদার জন্য আপনার কোন চিন্তা নেই। দাদার পুরো টাকার রিস্ক আমার।

এরপরে আর কোন কথা চলতে পারে না। মুদি দোকানী মাল দিয়ে দিল। বিশ্বনাথ বলল, একটা খাতা খুলে দিন। এতে দু-পক্ষেরই সুবিধা। ভুল বোঝাবুঝি থাকবে না।

চালাক মানুষ বিশ্বনাথ। তার সব ভাল, শুধু একটু বেশি কথা বলে। বিশ্বনাথের পরনে

হাসপাতাল সাপ্লাই খাকি প্যান্ট-জামা, পায়ে সোল ক্ষয়া হাওয়াই চপ্পল, মাথা ঠাণ্ডা থাকবে বলে জ্যাবজেবে তেল মেখেছে সে। চুল তার উল্টো করে আঁচড়ান। গুরুপদর শুকনো ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটতেই সে ভীষণ খুশি হল, গায়ে গা লাগিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল, দাদা, তোমাকে একটা কথা শুধাই? ওই তোমার মেয়েটা গো, কী যেন নাম?

ইরা। গুরুপদ খেই ধরিয়ে দিয়ে বলল, কী হয়েছে?

কিছু হয় নি, এমনি বলছিলাম। এবার তোয়াজের হাসি হাসল বিশ্বনাথ, এমন মেয়ে লাখে একটা মেলে। অমন যদি আমার একটা মেয়ে থাকত তাহলে বুকে থুতু দিয়ে ঘুরতাম।

গুরুপদ উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে নিরুত্তর চোখে তাকাল। বিশ্বনাথ নিকট আত্মীয়র মত বলল, তা দাদা, মেয়েটার বিয়ে থাওয়া নিয়ে কিছু ভাবছ তো? মেয়েরা তো লাউগাছের মত, তড়তড়িয়ে বেড়ে যায়। তা তুমি যদি সাহস দাও, তোমাকে একটা কথা বলি। আমার জানা শোনা একটা ছেলে আছে। ডিপটিওয়েল অপারেটর। তোমার যদি মত থাকে তো বলো। আমি কথা চালাচালি শুরু করি।

বাঁকা খেজুর গাছটার কাছে এসে গুরুপদ দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। বিশ্বনাথকে জরিপ করে বলল, ঠিক আছে ঘরে কথাবার্তা বলি। তোমার বৌদির সঙ্গে আলোচনা করে তোমাকে জানাব।

দেরী করো না দাদা। শুভস্য শীঘ্রম্। বিশ্বনাথ আপন মনে হাসল।

বাঁকা খেজুরতলা থেকে দাসপাড়ার ঘরগুলো চোখের মণিতে ভেসে ওঠে। চেনা সব কিছু তবু বুকের খোদল থেকে নেশার স্রোত উঠতে শুরু করে। বিশ্বনাথের মাঝে মধ্যে তাড়ি খাওয়ার অভ্যাস। পকেটে পয়সা থাকলে মনটা তার তখন উদার হয়ে ওঠে। গুরুপদর দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে সে বলল, মনটা আজ বেশ ফুরফুরে লাগছে। একটু দাসপাড়া হয়ে ঘুরে গেলে হোত।

গুরুপদ তার ইচ্ছের কথা জানতে পেরে বলল, আত্মাকে কষ্ট দেওয়া উচিত হবে না। তোমার মন যখন চাচ্ছে তখন একবার ঘুরে যাও।

তুমি যাবে না?

না ভাই, আমার যাওয়ার উপায় নেই। মেয়েটা ওর মায়ের চাইতে রাগী বেশি। তাল বেতাল দেখলে মুখ শুঁকে দেখে।

যারে তুমি জন্ম দিয়েছ, তারে এত ভয় করলে চলে?

ভয় না করে যাব কোথায়? যুগ বদলাচ্ছে। আমাকে তো সবাইকে নিয়ে থাকতে হয়। গুরুপদর হেরে যাওয়া গলা।

বিশ্বনাথ তার হাত ধরল, খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল, আজ তোমার আনন্দের দিন। ধার বাকির দোকান ঠিক হল। আজ একটু মৌজ মস্তি না করলে দিনটা শুখা শুখা যাবে।

গুরুপদ বিশ্বনাথের মনোভাব বুঝতে পেরে বলল, তাড়ি যে আমি খাই না তা নয়। যখনই সুযোগ আসে তখনই দু-চার গ্লাস মেরে দিই। তবে ভাই আমার কোন বাঁধা ধরা নেশা নেই। পেলে ভাল, না পেলেও ক্ষতি নেই।

এটাই তো মানুষের মত কথা। বিশ্বনাথ জোর দিয়ে বলল, কোন কিছুতেই হাবুডুবু খাওয়া উচিত নয়। মাত্রাজ্ঞান থাকা ভাল তাহলে সম্মানহানির ভয় থাকে না। এই আমাকে দেখো। ঠেকে বসলে আমি কোনদিন বেহেড হয়ে পড়ি নি। একটু-আধটু খাই স্বীকার করছি,

তবে গোরুর মতো খাই না।

কথায় কথায় ছোট হয়ে আসে পথ। দাসপাড়ার কালভার্টটা পেরিয়ে আসে ওরা। বিশ্বনাথের তাতানো কথাগুলো গুরুপদর মনে রেখাপাত করেছে। কিচেন ডিউটিতে আগুন-জলের কারবার। একটু এদিক ওদিক হলে রান্নার দফারফা সারা। বিশ্বনাথ কিচেনের ধারে কাছে থাকে না। তার কাজ হল ফোপর দালালী করা। মানুষ পটাতে তার মত আর কেউ পারে না। গুরুপদর হাত থেকে সে জোর করে ব্যাগটা নিয়ে নিল, দাদা, তোমার হাতটা এবার একটু আরাম করুক। একা আর কত টানবে?

জ্ঞান পড়ার পর থেকেই তো টানছি।

সে যখন টেনেছ তখনকার কথা আলাদা। আমি যখন পাশে আছি কষ্টটা ভাগাভাগি করে নিই। গুরুপদ বিস্ফারিত চোখ মেলে বিশ্বনাথের দিকে তাকাল। এতদিন হয়ে গেল তবু এই মানুষটাকে সে ঠিকঠাক চিনতে পারল না।

হাসপাতালের অন্যান্যরা বিশ্বনাথকে ভাল চোখে দেখে না। আড়ালে বলে, ধান্দাবাজ. ফোর টোয়েন্টি!

লোকের কথা যে সব মিথ্যে তা নয়। চটকদারী কথার দিকে বিশ্বনাথের ঝোঁক বেশি গুরুপদ হারুর তাড়ির ঠেকের সামনে দাঁড়িয়ে ধুঁকপুকানী চোখে তাকাল। দিনের বেলায় নেশা করলে ধরা পড়ে যাবার ভয়। চেনা জানা দু-পাঁচজন দেখলে চোখ ঘুরিয়ে নেয় গ্রাম সমাজে শুরু হয় কানাকানি। ইরার কানে গেলে গুরুপদর আর রক্ষে নেই। সংসারে অশান্তি বাধিয়ে ছাড়বে। কানন সাতে-পাঁচে থাকে না, তার ধারণা মাঝে মধ্যে পুরুষ মানুষ নেশা করলে শরীরে তাগত বাড়ে।

মন স্ফূর্তি থাকলে রোগ জ্বালা সব ছেড়ে পালায়। বিশ্বনাথের দার্শনিক সুলভ কথায় গুরুপদ চুপসান চোখে তাকাল। বিশ্বনাথ ভরসা পেয়ে বলল, যতদিন বাঁচব মনে দুঃখ নিয়ে কেন বাঁচব? মন যা চায় তাই করা ভাল — কি বলো দাদা?

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘাড় কাত করল গুরুপদ। বিশ্বনাথ ওর দিকে অন্তরঙ্গ চোখে তাকাল মন চাঙ্গা রাখতে মাঝে মধ্যে আমি দাসপাড়ায় আসি। হারুর তাড়ি পেটে পড়লে মনে আর কোনও দুঃখ থাকে না। পাঁচুই বা কাঁচা মদ খেলে আমি একেবারে মুক্ত পুরুষ হয়ে যাই। খোলা রসগুলোর এত যে অসীম শক্তি তা পেটে না পড়লে টের পাওয়া যায় না

গুরুপদ বিশ্বনাথের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল। নেশা-ভাঙ করার জন্য বিশ্বনাথের বদনাম আছে হাসপাতাল চত্বরে। দিদিমণিরা অনেকেই তার সঙ্গে নাইট ডিউটি করতে ভয় পায়। ডাক্তারবাবুর কাছে নালিশ যায়। তবু শিক্ষা হয় নি বিশ্বনাথের, তার বোমভোলা মেজাজ নিয়ে আনন্দে টইটুম্বুর।

কী যে আনন্দের দিন বুঝে উঠতে পারল না গুরুপদ, শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকাল নেশা যে এর আগে সে করে নি তা নয় তবু নতুন জায়গায় বদনামের ভয়ে তার বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেল। তাতা হাওয়া এসে ধুলো আর খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে চলে যায় অনেক দূর। গোরুর গাড়ির চাকা ঢুকে যায় চার আঙুল ধুলোয়। গুরুপদর মনে পড়ে ছোটবেলার কথা। বাবার সঙ্গে হাট করতে যেত গোরুর গাড়িতে চেপে, গাড়োয়ান বসত সামনে, ছইয়ে ঢাকা গাড়ির ভেতর ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ হুঁকো টানত তার বাবা। কবেকার দৃশ্য এখন যেন হুবহু সব মনে পড়ে। হাঁ-করে তাকিয়ে থাকে ক্যাচকোচ শব্দ তুলে চলে যাওয়

ারুর গাড়িটার দিকে। বিশ্বনাথ মানুষের মন পড়তে পারে, গায়ে টোকা মেরে শুধোল, দাদা, পেটে না পড়তেই যে নেশা হয়ে গেল দেখছি!

ঘাবড়ে গিয়ে হাসল গুরুপদ, না-না, তা নয়। একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

কী কথা?

গুরুপদ হা করে তাকাল, যা হারিয়ে যায় তা বুঝি আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যায় — তাই না?

তোমার আবার কী হারাল?

ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল ভাই। তখন কত সুখ ছিল জীবনে। ভরা নদীর তা ছিল সেই জীবন। এখন চড়া পড়েছে। সুখের নৌকো আটকে যায়। দীর্ঘশ্বাস ঝরে ঢ়ল গুরুপদর গলায়।

হারুর তাড়ির ঠেকে নজর কাড়ার মতো কিছুই ছিল না। রসে চ্যাটচেটে হাঁড়ি-লসীগুলো উপুড় করা ছিল দেওয়ালের ধারে। একটা ধাড়ী ছাগল লম্বা জিভ দিয়ে গা টছিল কলসীর। মাছি ভনভনে পরিবেশটা বিশ্বানাথের বহু চেনা। হারু দাসের চোখে াখ পড়তেই হাসল সে। আন্তরিকতায় ঠোঁট ভিজিয়ে বলল, আসুন বাবু, আজ আমার াকানে ভিড় টিড় নেই, একেবারে ফাঁকা।

ভিড় নেই দেখে খুশি হল বিশ্বনাথ, আজ আমি একা আসিনি, সঙ্গে আর একজন সেছে।

সে তো দেখতে পাচ্ছি। হারু দাস গোলাকার চোখে তাকাল, কী দেব বাবু, রস না সল জিনিস?

কোনটা ভাল হবে? বিশ্বনাথের কথায় হারু দাস দাঁত বের করে হাসল, হারুর জিনিস নটা খারাপ হয়েছে? বাবুদের আমি দেখে-শুনে মাল দিই। আমি গোরু-গাধার তফাৎ ।। নাহলে কবে আমার এ কারবার উঠে যেত।

সে তো ঠিক কথা। তবে—। বিশ্বনাথ ঢোক গিলল, আজ পকেটের অবস্থা ভাল নেই। গে খান তো, তারপর হিসাব হবে। হারু দাস হিসাব করে বলল, আপনাদের ধার কে দিলে আমার পয়সা কোনদিন মার যাবে না। তাছাড়া আপনি হলেন গিয়ে বড় ক্তারের ডান হাত। আমরা তো তাকে জানি না, কিছু হলে তো আপনার কাছে আগে ট যাই।

সে তো যাও। বিশ্বনাথের কণ্ঠস্বরে জড়তা ফুটে উঠল। গ্রামের নিরক্ষর মানুষরা তাকে ি ডাক্তার বলে ডাকে। সেই ডাক শুনতে ভাল লাগে বিশ্বনাথের। ছোটখাটো জ্বর জ্বালায় ওষুধ দেয় ওদের। বিশ্বনাথের ছুঁচ ফোঁড়ানোর হাতটাও মন্দ নয়। সেলাই-ফোঁড়াই, া ছেঁড়ায় সে ওস্তাদ মানুষ। ফলিডল খাওয়া রোগীর পেট থেকে সে বিষজল বের ] বিশেষ কায়দায়। এসব কেসে তার ঘেন্না কম। বিষ খাওয়া রোগী আসলে বিশ্বনাথের ি পড়ে হাসপাতালে। ডাক্তারবাবুই ডেকে পাঠান।

কাচের গ্লাসে চুমুক মেরে বিশ্বনাথ ঘোলাটে চোখে গুরুপদর দিকে তাকাল, কী ভাবছ ? এখানে এসে মুখ ঝুঁকিয়ে বসে থাকলে লোক হাসবে। গ্লাসের মাল পেটে চালান র দাও। তখন দেখবে ফোঁটায় ফোঁটায় মজা।

গুরুপদ ঘাড় নাড়ল। হড়বড়িয়ে খেতে গিয়ে হেঁচকি উঠল তার। গ্লাসটা নিঃশেষ করে মুখ মুছে বলল, আর পারব না ভাই, মাথা ধরে গিয়েছে।

মাথা তোমার নেশায় ধরে নি, চিন্তায় ধরেছে। অনেকদিন পরে খাচ্ছো তো, ওরকম একটু-আধটু হয়। বিশ্বনাথ চাঙ্গা করার চেষ্টা করল।

গুরুপদ কাচুমাচু মুখে বলল, আর পারব না। বেশি খেলে আউট হয়ে যাব। তখন লোক আমাকে দুষবে।

যে দুষবে আমি তার দাঁত উপড়ে নেব। হাতের পেশী ফুলিয়ে বিশ্বনাথ রোয়াব দেখাল, আমি থাকতে তোমার চিন্তা কীসের? পয়সার কথা ভেবো না, যে খায় চিনি তাকে জোগায় চিন্তামণি। বিশ্বনাথ হা-হা করে হাসল।

গুরুপদ চিৎকার করে বলল, চুপ করো। আমি আর তোমার হাসি সহ্য করতে পারছি না। আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে। কপাল টিপে ধরল গুরুপদ। খাকি জামাটা খুলে ফেলে দুপুরের রাগী সূর্যকে হাত নেড়ে বলল, একটু ছায়া দে বাপ। ভাপে যে মরে যাচ্ছি। মাথায় হাত দিয়ে কঁকিয়ে উঠল গুরুপদ।

## ।। ছয়।।

আমগাছের মাথার উপর উঠে এসেছে সূর্য, গুমোট গরমে আঁতিষ্ঠ জীবজগত। ঝড় উঠলে শীতল হোত ধরিত্রী, উড়ে যেত খড়কুটো আর ধুলো-বালি। কিন্তু ঝড় ওঠার কোনও পূর্বাভাস ছিল না। ঘরের বাইরে এসে ইরা হা-হুতাশ ভরা চোখে তাকাল। এত বেলা হল তবু ঘরে ফেরে নি গুরুপদ। আজ তার অফ-ডে। ঘর ছাড়ার আগে বলে গেল, যাব আর আসব। ফিরতে দেরী হলে চিন্তা করো না। এত বেলা হলো, চিন্তা না করে পারছিল না কানন। ইরার ভাবনাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, মানুষটা কোথায় গেল বল তো? ছুটির দিনে লোকটা মনেহচ্ছে তাস পেটাচ্ছে চা-দোকানে।

যার মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল দশা, সে পেটাবে তাস, এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল ইরার। অভাবের হাঁ-মুখ যে কত জ্বালাময়ী তা সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। গ্রামের মানুষও সুখে নেই। অভাবী মানুষ কচু-ঘেঁচু যে যা পারছে খাচ্ছে। গেঁড়ি-গুগলির লোভে মানুষ হাতড়ে ঘোলা করে ফেলছে পুকুরের জল। জলকচুর ডাঁটাও এখন দুর্লভ। আগে যেগুলো শুয়োরে খেত এখন সেগুলোও যত্ন করে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে হাড়-হা-ভাতে মানুষের দল। হঠাৎ এত অভাব কী ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল এর সঠিক কারণ ইরা অনুধাবন করতে অক্ষম। চার বছর পর পর খরা। মাঠ শূন্য। চাষের জল নেই। পতিত পড়ে আছে জমি। চাষীরা ভাঙা মন নিয়ে ফিরে আসছে জমির আপাত বন্ধ্যা মুখ দেখে। এও এক স্বল্পকালীন আকাল। পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে প্রাণের দায়ে পালিয়ে আসছে হাজার হাজার মানুষ। শরণার্থী শিবিরে জায়গা নেই। অপ্রতুল সাহায্য। শরণার্থী নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে ভারত। সরকার রীতিমতন উদ্বিগ্ন। জয় বাংলার ডাক দিয়েছেন মুজিবর রহমান। রেডিও খুললেই এসব

খবর শুনতে পায় ইরা। সেও চায় সোনার বাংলা স্বাধীন হোক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে মাধবীর আগ্রহের শেষ নেই। সে গর্ব করে বলে, আমি ছেলে হলে যুদ্ধ করতে চলে যেতাম। ইরার আগ্রহও কম নেই। করিমপুর তো নদীয়ার সীমান্তবর্তী গ্রাম। ইরা বড় হয়ে উঠেছে সেখানে। সব চিন্তা ছাপিয়ে এখন একটাই চিন্তা গুরুপদ কেন ফিরল না। কানন তাকে খাওয়ার কথা বলল। সে খেল না। কানন উত্তেজিত হয়ে বলল, অত দরদ দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। যে মানুষ সংসারের কথা ভাববে না, তার কথা আমিও আর ভাবব না। যার যেখানে মন চায় চলে যাক, আমি কাউকে আর বাধা দেব না। কাননের কথা শুনে ইরার ভেতরে ঝড় উঠল। এমন হীন, স্বার্থপর কথাবার্তা সে মন থেকে মেনে নিতে পারে না। মায়ের উপর অভিমান হয়। চার দেওয়ালের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আসে সে। এসময় পল্টু তার চোখের সামনে থাকলে কাজের কাজ হোত। একমাত্র পল্টুই পারত গুরুপদকে খুঁজে আনতে। গোবেচারা বিল্টু কোনও কাজের নয়, সংসারে থেকেও সে না থাকার মতো।

এক ঝাঁক পাখি পাখনায় রোদ মেখে ডাকতে ডাকতে ইরার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। পাখিগুলো বুঝি স্বাধীনতার কথা বলছিল। অনুশাসনের বেড়ি খুলে ফেলার শব্দ তাদের ডানায়। পাখিগুলো দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই খুব হতাশ বোধ করল ইরা। ভেঙে পড়ার আগে পাইলটের নিষ্ঠুর মুখখানা মনে পড়ল। শিহরিত হলো সে। পাইলট নামটা এখন তার কাছে এলার্জি। কিছুতেই সে ভুলে থাকতে পারছে না নামটা। ভয়ের পাখি রক্তের নদীতে ঘুরে বেড়ায়। বকফুলগাছের গোড়ায় এসে তার মনে হয় এই অভাব-অনটন, দুঃকষ্টগুলো বুঝি কিছু নয়। সরু পাতার ভেতর দিয়ে ভাসমান মেঘ উড়তে কোন আজব দেশে হারিয়ে যায়।

হাসপাতাল চত্বরে গাছপালার অভাব নেই। ইরা পায়ে পায়ে হেঁটে এল অনেকদূর। ফাঁকা ফুটবল খেলার মাঠটার দিকে তাকিয়ে তার কষ্ট হলো। কোথাও গুরুপদর ছায়া নেই। তবে ঢালাই পাইপের গা বেয়ে তরতরিয়ে নেমে এল পল্টু। ওর পকেট ভর্তি ভেঁটুল। গুলতি হাতে নিয়ে ও বেরিয়ে পড়বে শিকারে। ওর ভয়ে পাখিগুলো তটস্থ। ছায়া দেখলেই উঠে পালায়। পল্টুর যে পড়াশুনা হবে না এ বিষয়ে ইরা নিশ্চিত। পল্টু মায়াকাহীন গলায় বলে, পড়ে লিখে কী হবে। আমি বড় হয়ে ব্যবসা করব। বাবার মতো চাকরি করলে পেট ভরবে না।

পল্টু এমন পাকা পাকা কথা বলে যে কেউ শুনলে বলবে ও বুঝি কথার জাহাজ। তবুও সে খুব গুরুপদর ভক্ত। কিচেনে গিয়ে কয়লা ভেঙে দেয় রান্নার জন্য। কল থেকে জল এনে দেয় বালতি বালতি। আলুর খোসা ছাড়ায়, পাউরুটির ঘিয়ে ভেজা কাগজগুলো জড়ো করে রেখে দেয় আঁচ ধরানোর জন্য। সে গুরুপদর এত ভক্ত কেন এ রহস্য হাসপাতালের অনেকেরই জানা। কানন তাকে গোবর কুড়াতে যেতে বললে নাক কুঁচকায় সে, মাঠে ঘাটে গোবর কুড়াতে আমার ঘেন্না লাগে মা। ছেলেরা আবার গোবর কুড়ায় নাকি?

কাননই সময় পেলে মাঠে চলে যায় ঝুড়ি নিয়ে। হাঁপানীর টান বাড়লে তার আর কিছু করার থাকে না। বুকে হাত চেপে বসে পড়ে ফাঁকা মাঠে। ভ্যাসভেসে কাশির শব্দ পাঁজরা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়।

পল্টুকে ছাদের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ইরার গা জ্বলে, অ্যাই পল্টু, নেমে আয়। নেমে আয় বলছি।

পল্টু মস্তানের কায়দায় দাঁড়ায়, আমি ছাদে উঠেছি তো তোর কী?

বাবা ঘরে ফেরে নি সে খেয়াল আছে? ইরার কণ্ঠস্বর থমথমে, আজ আর বনে-বাদাড়ে চরে কোন কাজ নেই। যা এক্ষুণি বাবাকে খুঁজে আন।

বাবা কি ছোট ছেলে যে হারিয়ে যাবে? পল্টু অদ্ভুতভাবে দাঁত বের করে হাসল, তোর যত ফালতু চিন্তা। আমার অত চিন্তা-ফিন্তা হয় না।

এ তোর কেমন ভাষা? ইরার চোখ ধকধকিয়ে উঠল, ভালভাবে কথা বলতেও শিখিসনি বুঝি?

কী করে শিখব—আমি তো তোর মত পড়াশুনা শিখে বাবাকে পথে বসাই নি?

ছোট মুখে বড় কথা বলিস নে, মারব কিন্তু—

ইস্, মারলেই হলো? আমার গায়ে হাত তুললে আমিও কাউকে ছেড়ে দেব না। পড়ে পড়ে মার খাওয়ার জন্য আমার জন্ম হয় নি!

ইরার চোখে মেঘ জমল। পল্টু কী দ্রুত বদলে যাচ্ছে খারাপ সঙ্গে মিশে। এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আর কিছুদিন পরে পল্টুই হয়ে উঠবে ছোটখাটো পাইলট। আঁতকে উঠে ইরা আবার বলল, নেমে আয়, নেমে আয় রে! বাবা কোথায় গিয়েছে একবার খুঁজে আয়। আমি মেয়ে হয়ে আর কোথায় যাব।

পল্টু কী মনে করে ঢালাই পাইপে বুক ছেঁচড়ে গিরগিটির চেয়েও দ্রুতগতিতে নেমে এল ছাদ থেকে। গায়ে খড়ি ফুটেছে ঘষটানীতে, মুখ থেকে থুতু বের করে সাদা খসখসে চামড়ায় লাগিয়ে হুটোপুটি করে বলল, বাবাকে নিয়ে আর পারা গেল না মাইরি! মানুষটার যে কবে আক্কেল হবে কে জানে।

হঠাৎ ইরার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল 'মাইরি' শব্দের এমন স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার দেখে। সে হাত বাড়িয়ে খপ করে চেপে ধবল পল্টুর পাখির ডানার চেয়েও সরু হাত, মুচড়ে দিয়ে বলল, আমি অনেকক্ষণ তোর বদমায়েসী সহ্য করেছি। আর সহ্য করব না।

পল্টুর কিশোর চোখ দুটো সাদা ইঁদুরের চোখের মত লাল হয়ে উঠল, তুই আমার কী করবি? মা-বাবা যখন কিছু বলে না তখন তুই বলার কে রে? তুই আমাকে খাওযাস না পরাস?

রাগে অন্ধ হয়ে উঠল ইরা, বাবা-মা কিছু বলে না বলে আমি যে কিছু বলব না এটা তুই ভাবলি কী করে? থাপ্পড় মেরে আমি তোর নোংরা মুখটা ভেঙে দেব।

কই মার তো দেখি? গরম তেলে জল ঢেলে দেবার মতো পল্টুর কথাগুলো। ইরা হাত ছেড়ে দিয়ে চুলের মুঠি ধরল ওর, টানতে টানতে নিয়ে গেল বকফুল গাছের গোড়ায়। মাংস উপড়ে নেবার মতো জোরে টান দিল চুলে, তারপর মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জোর করে ঠেলে দিল বকফুল গাছের এবড়ো খেবড়ো গোড়ায়। মেয়েরা যেখানে টিপ পরে সেখানে কাঁচা সুপুরির আকারে ফুলে গেল পল্টুর কপাল। থেঁতলান চামড়ায় নোনা ঘাম লেগে রি-রি জ্বলে উঠল। পল্টু এত দিন যা বলেনি রাগের ঘোরে তাই বলে বসল, ধেড়ে মাগী বসে বসে খাচ্ছে আর আমাকে মারছে।

পল্টুর সাপ দেখা কাক চিৎকারে ছুটে এল কানন, তোরা কী লাগিয়েছিস বল তো?

তোদের জ্বালায় আমার দেখছি অকালেই মরণ হবে।

ইরা কিছু বলার আগেই পল্টু ছ্যাঁচা কপাল দেখিয়ে বলল, দেখ, দিদি আমাকে কেমন মেরেছে। আর একটু হলে কপালের হাড়টাই ভেঙে যেত!

কানন ঝুঁকে পড়ল, ছিঃ-ছিঃ, এ কী করেছিস তুই? ছেলেটাকে কি মেরে ফেলবি? ইরার পায়ের নীচে মাটি কাঁপছিল, জলভরা চোখে বজ্রাহত গাছের মতো দাঁড়াল। নোংরা কথাটা সে কিছুতেই বলতে পারল না কাননের সামনে। এই জঘন্য পরিবেশ পল্টুকে ফুল থেকে পাথর করে দিয়েছে। সে কাকে শাসন করবে? যন্ত্রণা ক্লিষ্ট মুখ নিয়ে ইরা সরে দাঁড়াল।

কানন পল্টুর কপালে স্নেহের হাত রেখে ঠেস মেরে বলল, ছিঃ, এভাবে কেউ কাউকে মারে? পল্টু তো চোর-ডাকাত নয়—সে তোর ভাই।

ইরা কোনও প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল না, সে জানে মায়ের অন্ধ স্নেহ-ভালোবাসার তোড়ে তার প্রতিবাদ ঝড়ের মুখে খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে। ভয়াবহ কান্নার বেগ তার বুক ঠেলে উঠে এল। নিজেকে আর সংযমের বাঁধনে বেঁধে রাখতে পারল না সে। চোখ জোড়া হয়ে গেল জলাশয়। ঝাপসা চোখে সে দেখল বিশ্বনাথের কাঁধে হাত রেখে টালমাটাল পায়ে হেঁটে আসছে গুরুপদ। অসংলগ্ন জড়ানো কথাগুলো ছুটে আসছে ছিলা পিছলান তীরের মতো। নিজেকে বাঁচানোর জন্য সে কঠিন চোখে তাকাল।

গুরুপদকে দেখতে পেয়ে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হল পল্টুর, কাননের বাহুবন্ধন থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে ব্যথা-যন্ত্রণা ভুলে ছুটে গেল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে গুরুপদকে দেখল ক'মুহূর্ত, তারপর ঠোঁটে তরল হাসির রঙ লাগিয়ে ছুটে এল বকফুলতলায়।

কানন আশ্চর্য হয়ে শুধোল, হ্যাঁরে হাসছিস কেন, কী হয়েছে?

পল্টুর বাঁধনহারা হাসি আর থামতেই চায় না, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুলে ওঠে হাসির তালে তালে, জানো মা, বাবা না মাল খেয়েছে! কেমন হাঁটছে দেখো?

বিশ্রী শব্দগুলো ইরাকে টানতে টানতে পাতালপুরীতে ঢুকিয়ে দিল। কানন প্রতিক্রিয়াহীন। শুধু অসীম শূন্যতার দিকে তাকিয়ে সে আউড়াল, ভেড়া দেখছি বাঘের ছাল পরেছে! এ সব দেখার আগে আমার কেন মরণ হল না।

ইরার চোখ ভিজে যাচ্ছিল। সে মনে করার চেষ্টা করল এর আগে গুরুপদ কোনদিন মদ খেয়েছে কী না। তাসের আড্ডা বা বাউলের আখড়ায় গেলে গুরুপদ মাঝে মধ্যে গাঁজার কলকেয় ঠোঁট লাগায়। বুক পোড়ায়। তবে এগুলো তার কোনো স্থায়ী নেশা নয়। কানন থাকতে না পেরে ইরাকে শুনিয়ে বলল, সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। আমি আর কী করব বল? সব আমার কপাল!

সীমান্ত এলাকায় নেশালী সামগ্রীর অভাব হয় না, টাকা ফেললে সব কিছু হাতের মুঠোয় চলে আসে। গুরুপদর বদরোগটা সেই তখন থেকেই।

ইরা ভেবেছিল বাবা এলে এক সঙ্গে খাবে। সেইমত মনে মনে তৈরী ছিল সে। এখন বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে তার খিদে ভাবটা মরে গেল। সে আর কাঁদল না, সোজা ফিরে গেল ঘরের কোণে। এই পোড়া মুখ সে কাকে দেখাবে? সবাই হাঁ করে দেখছিল গুরুপদকে। ইরার মরে যেতে ইচ্ছে করল।

সন্ধ্যে নামার অনেক দেরী। দুপুর শেষ হয়ে বিকেলের তলপেটে দেখান আকাশ এখন।

গরম বলেই বেলা বড়। প্যাচপেচে গরমে গাছের পাতা ঘেমে উঠছে। একটা ফিঙে পাখি পোকা ধরার জন্য বসেছিল বেড়ার উপর। ওর লাল চোখ দুটো বুঝি গুরুপদর চোখ। কানন কপাল চাপড়ে কেঁদে উঠল, মরতে কেন বিশুদার সঙ্গে গেছিলে গো। ওর পায়ে পা দিয়ে হাঁটলে কি তোমার চলবে? ঘরে তোমার আইবুড়ো মেয়ে। তুমি যদি এখন নেশা ভাঙ কর তাহলে কি ওর আর বিয়ে হবে গো?

কানন কাঁদছিল না, প্রলাপ বকছিল।

পল্টু বেগতিক দেখে ধমকাল, চুপ করো মা, আলতু-ফালতু বকো না তো।

বকব না তো কি নাচব? কানন অশ্লীল ভঙ্গি করতেই ভিড় করে আসা অনেকেই মজা পেয়ে হেসে উঠল। কানন খিঁচিয়ে ওঠা স্বরে বলল, এখানে কি শিব উঠেছে যে দেখতে এসেছ? চুল খোলা কানন শ্মশান কালীর ঢঙে মাজায় হাত দিয়ে দাঁড়াল। জলভরা বালতিটা দেখে তার মাথায় বদবুদ্ধি খেলে গেল। ছুটে গিয়ে জলের বালতিটা তুলে নিল সে। তারপর জোর করে ঢেলে দিল গুরুপদর মাথায়।

পল্টু অসন্তোষ ভরা চোখে কাননের দিকে তাকাল, ওঃ মা, তুমি যাও তো! বাবার জন্য ভাত বাড়ো।

ওর পাতে আমি ভাত দেব না, ছাই দেব। নাকের জল মুছে কানন ফ্যাচ করে কেঁদে উঠল। অনেকক্ষণ ঘরের সামনে ঘাড় গুঁজে পড়ে থাকল গুরুপদ। বেলা গড়ে গেল পশ্চিমে বকফুলগাছের পাতায় জড়িয়ে গেল অন্ধকার।

খবর পেয়ে মাধবী এল, তার মুখে কথা নেই, ফেঁসে যাওয়া কলাপাতার দুঃখ। ইরাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, এসব নিয়েই আমাদের জীবন। তুমি এসব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করো।

ভুলে যাওয়া কি অত সহজ? চোখের তারায় স্পন্দন অনুভূত হল ইরার।

মাধবী বলল, যাও তোমার বাবাকে ঘরে নিয়ে যাও। মদ খেলেও সে তোমার বাবা।

আমি ওকে ছোঁব না। ইরার গলার শিরা ফুলে উঠল।

রাত বাড়লে বাদুড় আসে আমগাছে। আমে রঙ ধরে নি তবু বাদুড়ের উৎপাত শুরু হয়ে গেছে। এর মধ্যে খাওয়ার পরে মুখ ধুতে এসে ইরা দেখল একটা বাদুড় চুপসা মুখে তারই দিকে চেয়ে আছে। এমন দৃশ্য এর আগে সে কোনও দিন দেখে নি। ভয় পেলেও চুপচাপ এঁটো হাতে সে দাঁড়িয়ে থাকল বাইরে। গুমোট অবস্থা কেটে গেছে অনেকক্ষণ আগে। প্রকৃতি জুড়ে চামর দোলান ঠাণ্ডা হাওয়ার স্রোত। বাঁধের ওদিকে কেউ বুঝি হাঁক দিয়ে গেল জোর গলায় প্রতিধ্বনি হলো শব্দমালার। ইরার হঠাৎ মনে পড়ে গেল দাগী আসামী পাইলটের কথা। অমনি পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে ভয়ের হিমসাপ লতিয়ে পেঁচিয়ে ধরল তার সুরক্ষিত দেহ। বুজে এল গলা। কোনমতে মুখ ধুয়ে সে যখন বারান্দায় উঠতে যাবে তখনই পায়ের শব্দ ভেসে এল ইরার কানে। ভয় চোখে পিছু ফিরে তাকাল সে। অস্পষ্ট আলোয় হেঁটে আসা যুবকটাকে চিনতে পারল। জয়দেব শে... বাসে নেমে দ্রুত পায়ে হেঁটে এল তার সামনে। এসময় জয়দেবের উপস্থিতি তাকে বে... ভাবাল। তবু সে ঠোঁটের কোণে ধরে রাখতে চাইল কৃত্রিম হাসি। আবেগহীন সেই হাসি অনেকটা গন্ধহীন প্লাস্টিকের ফুলের মতো।

জয়দেব কাছে এসে নাম ধরে ডাকল। বিদ্যুৎ খেলে গেল ইরার সমস্ত শরীরে। ... ভাবল এর আগে জয়দেব কি তার নাম ধরে ডেকেছে। কিছুই মনে পড়ল না তার

জয়দেব পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারত কিন্তু গেল না, জ্যোৎস্নার স্থির আলোয় দু-চোখ ভরে দেখতে লাগল ইরাকে। ইরাও বারান্দার এক পাশে পোষমানা ময়নার মতো দাঁড়িয়ে থাকল।

সময় চলে গেল দু-জনের মাঝখান দিয়ে। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা অশোভন বলেই ইরা ইতঃস্তত স্বরে বলল, ঘরে যান। বাবা-মা সবাই আছে।

সে আমি জানি। জয়দেব মন কেমন করা চোখে তাকাল, আমি বলেছিলাম আসব। তাই চলে এলাম। সেদিন যাওয়ার সময় তো দেখা হলো না।

ইরা কোনও উত্তর খুঁজে পেল না। ফিকে জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে থাকল সে। গলায় কাঁপন তুলে বলল, আপনি যে আবার আসবেন আমি তা জানতাম।

আমি যে আবার আসব আমি তা জানতাম না। কেউ আমাকে জোর করে এখানে নিয়ে এল।

এটা এক ধরনের অসুখ।

আমি জানি সেই অসুখের নাম কী।

কথোপকথনের মাঝখানে কানন এসে ইরার পাশে দাঁড়াল। জয়দেবকে দেখতে পেয়ে লাল মাড়ি দেখিয়ে হাসল, কখন এলে বাবা? কাল রাতেও তোমায় স্বপ্ন দেখেছি। মন বলছিল তুমি আসবে।

জয়দেব লজ্জা পেল, অমন করে বলবেন না। আমি বড় ভালবাসার কাঙাল। না এসে থাকতে পারলাম না। তাই চলে এলাম। খুব ছোটবেলায় বাবা-মাকে হারিয়েছি। ওদের মুখ আর এখন মনে করতে পারি না। এখানে এলে মায়ের মুখটা মনে পড়ে।

ইরা ঠোঁট উল্টে ঘরের ভেতরে চলে গেল। জয়দেবের কথাগুলো তার বানান বলে মনে হল।

ঘরে ঢুকে এসেও ইরার মনে পড়ল সেই একলা বাদুড়টার কথা। বাদুড়টা কিসের টানে রোজ আসে আমগাছে? তবে কি বাদুড়ের প্রেম জমেছে গাছের সঙ্গে? এই অসম প্রেম কি স্থায়ী হবে। ইরার চোখের মধ্যে ঢুকে পড়ল অন্ধকার।

## ॥ ৭॥

মেঘের যা রঙ, ফোঁসফোঁসানী তাতে যে কোন সময় বর্ষা নামতে পারে। ঘাস পুড়ে যাওয়ার গন্ধে উতলা হয়েছে মাটি। ইরা আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে জয়দেব বলল, আর যদি এক সপ্তাহের মধ্যে বৃষ্টি না হয় তাহলে ছারখার হয়ে যাবে দেশ-দুনিয়া।

খরা শুধু বাইরে নয়, ভেতরেও।

তিনদিন হল জয়দেব এসেছে কিন্তু ইরা তার সঙ্গে মন খুলে কথা বলে নি। জয়দেব মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। পল্টুকে হাতে রাখার জন্য সে দশ টাকা দিয়েছে। দশ

টাকার গুলি কিনেছে পল্টু। গাদা গুচ্ছের নতুন গুলি দেখে ইরার মাথায় বিছে কামড়ে দিল। কাছে ডেকে বলল, হ্যাঁ রে পল্টু, এত গুলি তুই কোথায় পেলি? পল্টু ঘাবড়ে যাওয়া চোখ মেলে তাকাল। এ ঘরে দিদিই তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। আর সবাইকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয় সে। ইরাও জানে পল্টুর মেজাজ খারাপ থাকলে তাকেও দু-চার কথা শুনিয়ে ছেড়ে দেবে। ঝুঁকি আছে জেনেও ইরা সহজে হার মানতে চাইল না, তার স্বভাব কঞ্চির মতো; মচকাবে তবু ভাঙবে না। কাচের গুলিগুলো গুছিয়ে নিয়ে পালিয়ে যেতে চাইল পল্টু, ইরা তাকে যেতে দিল না, হাতটা খামচে ধরল সজোরে, জবাব না দিলে তোকে আমি ছাড়ব না। বল টাকা কোথায় পেলি?

যাঁতিকলে আটকে পড়া ইঁদুরের মতো পল্টুর অবস্থা, গুলি কেনার টাকা জয়দেবদা আমাকে দিয়েছে। মাইরি বলছি দিদি, আমি কারোর পকেট কেটে টাকা হাতড়ে নিই নি।

কেউ টাকা দিলে তুই নিয়ে নিবি? তোর কি বুদ্ধি বলতে কিছু নেই?

জয়দেবদা নিজের লোক। ওর কাছ থেকে টাকা নিলে পাপ হয় না।

আর কোনদিন টাকা নিবি না।

নিলে কী হয়? পল্টু দাঁত দেখিয়ে হাসল। জয়দেব কোন ফাঁকে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল করে নি ইরা। জয়দেবকে দেখে পল্টু জোর গলায় বলল, অ্যাই দিদি, তোর সন্দেহ দূর করে নে।

ইরা কথা বলল না; মুখ ঘুরিয়ে নিল। জয়দেব গায়ে পড়ে বলল, পল্টু টাকাটা নিতে চায় নি, আমিই জোর করে দিয়েছি।

আর কোনদিন ওকে আপনি টাকা দেবেন না। ইরার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। কানন জয়দেবের পক্ষ নিয়ে বলল, টাকা দিয়েছে তো কি হয়েছে? চুরি করে তো দেয় নি।

মা, তুমি চুপ করবে? ইরা ভেঙে পড়ল।

ফুঁসে উঠল কানন, কেন চুপ করব, তোর ভয়ে?

জয়দেব অসহায়ভাবে বলল, চুপ করুন মাসীমা, রাগারাগি করবেন না। আমার অন্যায় হয়েছে টাকা দেওয়া।

কোনও অন্যায় করো নি। কানন জোর দিয়ে বলল, তুমি আমার ছেলের মতো। তুমি যদি দশটা টাকা দিয়ে থাকো তাহলে দোষটা কোথায়? আমরা তো হাতে তুলে কিছু দিতে পারি না।

তোমার প্রশ্রয় পেয়ে পল্টু একদিন পশু হয়ে যাবে! ইরা আঁচল দিয়ে ঘাম মুছল। গম্ভীর হয়ে গেল তার চোখ-মুখ।

জয়দেব আপোষ করতে চাইল, মাত্র দশ টাকায় পল্টু কেন পশু হয়ে যাবে? ও ছেলেমানুষ। ওর এখন খেলাধূলো করার বয়স। ওকে বেশি শাসন করলে চোখের সামনে অন্য পথে চলে যাবে। আমাদের ড্রাইভারী লাইনে একটা কথা চালু আছে। বেশি টাইট দিলে লোহার নাট-বল্টুও কেটে যায়।

ইরার চোখে-মুখে ছিটিয়ে পড়ল রক্ত।

জয়দেব স্বাভাবিক গলায় বলল, শিশুরা ফুলের মতো, ওদের ইচ্ছে মতো বাড়তে দেওয়া উচিত। আমার ছোটবেলা নষ্ট হয়ে গিয়েছে অভাবে। আমি চাই না কারোর ছোটবেলা নষ্ট হয়ে যাক।

বিকেলের পরে একখণ্ড মেঘ ঝুলে থাকল আকাশের মাথায়। ঝড় আসার পূর্বাভাস পেয়ে ঘর ছাড়ল না পল্টু। ঝড়ের সময় আমতলায় শান্তি অনেক। ঝড়ে কত আম পড়ে। ডাঁসা আম কুড়িয়ে খেতে মজা।

কানন কিছুতেই ইরার মন পড়তে পারছে না, পাঁকাল মাছের মতো কথার পাঁকে তলিয়ে যচ্ছে সে। চতুর কথাই তার বর্ম। যত দিন গেল হতাশ হয়ে পড়ল জয়দেব। সে যা আশা করে এসেছিল তার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারল না। যাওয়ার দিন সাহসে বুক বেঁধে সে বলল, ইরা তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল। যদি সাহস দাও তো বলি।

ইরার ফর্সা মুখের রঙ বদলাল, আমার সঙ্গে আপনার কোনও কথা থাকতেই পারে না। তাছাড়া একা থাকতে থাকতে আমি বোবা হয়ে গেছি। কারোর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

আমি যা বলব তা আমার প্রাণের কথা।

কারোর প্রাণের কথা শোনার যোগ্যতা আমার নেই। ইরা এড়িয়ে গেল।

ফিউজ বাল্বের মতো অনুজ্জ্বল, নিষ্প্রভ হয়ে উঠল জয়দেবের মুখমণ্ডল, আঠাল ঢেকুর তুলল সে, আমি এখানে এসেছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে।

সেটাও আমি জানি। ইরা পানসে হাসল।

জান? কী জান? জয়দেবের ভ্রূ কুঁচকে গেল। ঘামে চকচকিয়ে উঠল মুখ।

ইরা সব কিছুকে অগ্রাহ্য করে বলল, সংসারে এমন কিছু জিনিস আছে যা জোর করলে পাওয়া যায় না। আর দেব বললেই সহজে তা কাউকে দেওয়া যায় না। জীবনটা পুতুলখেলার মতো ক্ষণস্থায়ী খেলা নয়।

কাউকে ভালবাসা তো পাপের নয়? জয়দেব করুণ চোখে তাকাল।

কে বলেছে পাপের? ইরা বলল, আমি তো একবারও বলি নি ভালবাসা হল পাপ। তবে এক তরফা ভালবাসার মধ্যে পুণ্য কতটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

তোমার কথা ধাঁধার মতো, আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

কারোর মাথায় যদি ঘিলুর বদলে গোবর থাকে তাহলে সেটা কি আমার দোষ? জয়দেব রুমাল বের করে ঘাড় মুখ এমন কী হাতের তালু মুছে নিল। ইরা তাকে কী বোঝাতে চাইছে সেটা বোঝার মতো বুদ্ধিহীন সে নয়।

ইরা খোলা চুল খোঁপা বাঁধে আলতো ভাবে, জয়দেবকে শুনিয়ে বলে, আমি মাধবীদের বাড়িতে যাচ্ছি। কখন ফিরব কোনও ঠিক নেই।

কঞ্চির বেড়ার উপর লতিয়ে বাড়ে অপরাজিতার লতা, আকাশী নীল ফুলগুলোর দিকে কারোর কোনও নজর নেই। যাওয়া-আসার পথে ইরা ফুলগুলোকে দেখে, নরম মায়াময় স্বপ্নিল ফুলগুলো তার মনে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সরু সরু লতা আর হালকা সবুজ পাতার মাঝখানে নীল রঙা ফুলগুলো নীল দুঃখকে বুকে পুরে অহোরাত্র জেগে থাকে। ইরা কী ভেবে বেড়ার ধারে এসে দাঁড়াল, ফুল ছিঁড়তে মন হল না শুধু আলতো হাত ছুঁইয়ে আদর করল। আর তাতেই অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুভূতিমালা তার সমস্ত সত্তাকে তোলপাড় করে তপ্ত নিঃশ্বাস হয়ে নেমে এল। মঙ্গলের সঙ্গে তার ভাব-ভালবাসার ডগালটি কত দূর বিস্তার লাভ করেছে, কতখানি হৃদয়ের বেড়ার উপর ফুল ফুটিয়েছে তা সে

সঠিক অনুমান করতে পারল না, তার শুধু মনে হল ভালবাসার ফুল ফোটে এমন একটা বিরল প্রজাতির লতানে গাছ লাগিয়েছে সে। আদৌ সেই গাছটা বাঁচবে কিনা ইরা তা জানে না। তবে যাওয়ার সময় মঙ্গলের চোখে সে যে আবেগের রেণু প্রত্যক্ষ করেছে তার মধ্যেই মিশে ছিল মন দেওয়া-নেওয়ার প্রতিশ্রুতি। এত দিন হয়ে গেল মঙ্গলের একটা চিঠি এল না অথচ চিঠি আসুক সে মনে-প্রাণে চাইত। পিওন ফিরে যেত রোজ, ইরা শূন্য চোখে তাকাত। আর তখনই শুরু হোত ব্যথার স্রোত বুকের ভেতর। মাধবীর কাছে ছুটে যেত সে একটু সান্ত্বনার জন্য। মাধবী হাসতে হাসতে বলত, আমার দাদা গভীর জলের মাছ। কাছে থাকলে ও তোমার। দূরে গেলে ও কারোর নয়। ওর স্বভাবই ওই রকম।

হতাশ ইরার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। যে তার কাছে এসেছে, সে তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে।যাকে সে চায়, সে কাছে আসে না। এ এক বিচিত্র খেলা। এ খেলার কোথায় যে শেষ ইরা তা জানে না। সে যেন শূন্যে গিঁট বাঁধতে চাইছে।

মাধবী কোন ফাঁকে এসে ইরার কাঁধের উপর হাত রাখল। চমকে ওঠে ইরা। আচ্ছন্নতা কাটিয়ে বলে, দেখ কী সুন্দর ফুলগুলো? একবার নজর ফেললে আর চোখ ফেরান যায় না।

মাধবীর গালে টোল পড়ে, ঠিক তোমার মতো, তাই না?

ইরার ঠোঁটে ছড়িয়ে পড়ে মলিন হাসি, আমি যদি ফুল হতাম তাহলে কপালে কি এত দুর্ভোগ থাকত?

কেন আবার কী হল তোমার?

জান, জয়দেব আবার এসেছে।

এ তো ভাল কথা! মাধবী মুখ ভরিয়ে হাসল, এক ফুল দো মালী, দারুণ ন্যাটক!

অ্যাই, ভাল হচ্ছে না কিন্তু। অভিমানে ইরার চোখে জল এল, মাধবীর হাত ধরে বলল, আমার ভাল লাগছে না। এখান থেকে আমার পালিয়ে যেতে মন করছে।

মনকে শাসন কর।

ইরা হাল ছেড়ে দেওয়া গলায় বলল, আমি দুই পুকুরে মাছ হয়ে বাঁচতে পারব না। জয়দেবকে আমি আমার অক্ষমতার কথা জানিয়ে দিয়েছি। ও খুব দুঃখ পেয়েছে। কিন্তু কী করব বলো। এছাড়া আমার কোনও পথ ছিল না।

ইরা অন্ধকারের মধ্যে ফিরে এল।

জয়দেব বসে ছিল তার পথ চেয়ে। ইরাকে দেখতে পেয়ে বলল, এ গরম আর সহ্য হচ্ছে না। অমি ভেবেছিলাম আজ বুঝি বৃষ্টি নামবে, তা আর হল না!

আমিও ভেবেছিলাম বৃষ্টি নামবে কিন্তু হল কই? ইরা নিষ্প্রভ চোখে তাকাল। জয়দেব বলল, ভাবনার মধ্যে যদি সত্যের ছোঁয়া থাকে তাহলে সেটা হবেই হবে।

ইরা অসহায়ভাবে বলল, জীবন কোনদিন বাঁধাধরা ছকে চলে না আজ বুঝতে পারলাম।

আমি ভাবছি পরশু চলে যাব। জয়দেব বলল, তবে যাওয়ার আগে হাজারদুয়ারী দেখে যাওয়ার ইচ্ছে আছে। চলো না সবাই মিলে দেখে আসি।

দুই দরজার মাঝখানে যার জীবন আটকা পড়েছে সে হাজারদুয়ারী দেখবার সুযোগ পাবে কী করে? ইরা প্রশ্ন ভরা চোখে তাকাল, যেতে পারলে ভাল লাগত কিন্তু এখন

যে যেতে মন করছে না একদম। তাছাড়া শরীরটাও ভাল নেই।

ওখানে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। শুনেছি ওখানকার গঙ্গার ধারটা বড় চমৎকার।

বিল্টু-পল্টু যেন পা বাড়িয়ে ছিল, ওরা আগ্রহ ভরা দৃষ্টি মেলে ইরার দিকে তাকাল। বেড়াতে যাওয়ার অনিচ্ছা ছিল না ইরার। তাছাড়া ঐতিহাসিক স্মারক হাজারদুয়ারী তার দেখা হয়ে ওঠেনি এখনও। করিমপুরে থাকতে স্কুল থেকে বাস রিজার্ভ করে অনেকেই গিয়েছিল। সেই সামান্য খরচটুকু গুরুপদ তখন তার হাতে তুলে দিতে পারে নি। মাসের শেষে কারোর কাছে ধার পায়নি গুরুপদ। অভিমানে ইরা সেদিন একটা কথাও বলে নি। সে তার বাবার সামর্থ্যের কথা জানে। দ্বিতীয়বার টাকার কথা বলে বাবাকে আর দুঃখ দিতে চায় নি। সংসারের কাঁটা সেই প্রথম বুঝি তার কিশোরী হৃদয়ে গেঁথে গেল। আজ আবার কত বছর পরে সুযোগ এসেছে হাজারদুয়ারী যাবার, সেই অযাচিত সুযোগকে ইরা প্রফুল্ল চিত্তে গ্রহণ করতে পারে না, কাঁটাটা খচখচ করছে অহরহ, প্রকাশ করে দিচ্ছে তার অক্ষমতা। কোনওরকম মতামত ইরার ঠোঁটের ডগায় ছিল না, সে শুধু অসহায় চোখ মেলে জয়দেবের মুখের দিকে তাকাল। ভরসা পেয়ে জয়দেব বলল, তাহলে ধরে নিচ্ছি তুমি যাচ্ছো? না। ইরা কেমন অস্বাভাবিক চিৎকার করে উঠল, যা শুনে অপ্রস্তুত হল জয়দেব। তবু সে উত্তেজিত হল না, রাগের ফুলকি নিভিয়ে দিয়ে শান্তভাবে বলল, এখনও তো সারা রাত পড়ে আছে। যদি যেতে মন চায় তাহলে চলো। আমি আর তোমাকে জোর করব না।

রাতে চাঁদ উঠল আকাশে। গরম হাওয়ার দৌড়ঝাঁপ শুরু হল সর্বত্র। কোথাও বুঝি সুগন্ধি ফুল ফুটে ছিল, হাওয়া বয়ে আনল সুগন্ধ নির্যাস। হাওয়ার ইশারায় পাতারা বুঝি ফিসফিসিয়ে কথা বলে, নাহলে বাঁশপাতার ঠোঁট কেন নড়ে উঠছে অমনভাবে। ইরা জানলার দিকে মুখ করে চেয়ে দেখছিল ফিকে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ রূপ। তখনই কানন তাকে ডাকল, ইরা, খেয়ে নে।

এখন খেতে মন করছে না, একটু পরে খাব। ইরা মায়ের মুখের দিকে তাকাল, ওদের খেতে দিয়ে দাও। তোমার যদি খিদে লাগে তাহলে তুমিও খেয়ে নাও।

তোর কি শরীর খারাপ। ইরার কাছে সরে আসল কানন, তোর যে মাঝেমধ্যে কী হয় আমি বুঝি না।

কানন চলে গেল।

গুরুপদ তাস খেলতে পাড়ায় গিয়েছে, ওর রাত করে ফেরার স্বভাব। তার জন্য খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে দেয় কানন। রাত জাগা তার ধাতে সয় না। রাত জাগলে হাঁপানির টান বাড়ে। প্রতি রাতেই গুরুপদর পায়ের শব্দ পেলে ইরা গিয়ে সদর দরজার ছিটকিনী খুলে দেয়। হাত মুখ না ধুয়েই রান্নাঘরে বসে খেয়ে নেয় সে। ইরা তার সামনে পোষা বেড়ালের মত বসে থাকে।

আজ সাত তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এল গুরুপদ, দূর থেকে চেঁচিয়ে ডাকল কাননকে, আলোটা নিয়ে এসো তো, দেখ কে এসেছে?

ইরার চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। নিমেষে চোখ-মুখের চেহারা বদলে গেল কাননের। এই অভাবের সময় কেউ এলে তার তো চিন্তা হবেই। বিরক্ত হলেও কানন হ্যারিকেন নিয়ে বাইরে এল, মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে বলল, ওঃ মা, এ যে দেখছি কমলা!

আয়, আয় মা ভেতরে আয়। তা তোদের বাড়ির খবর সব ভাল তো?

কমলা ইরার বয়সী হবে। ওর গায়ের রঙ পাকা কমলালেবুর মত নয়, অনেকটা তেলাকচু পাতার মতো। লেখাপড়া বেশিদূর করার সুযোগ পায় নি, মাত্র ক্লাস এইট অবধি বিদ্যে। ওর বাবা দ্বিজপদ তাকে বেশি দূর পড়াল না, কেননা প্রতি ক্লাসেই দু-বার করে থাকতে হোত তাকে। কমলাই পড়াশোনার প্রতি ঘেন্না জন্মাতে একদিন হঠাৎ করে ইস্কুল যাওয়া ছেড়ে দিল। সে এখন সংসারে টুকিটাকি কাজ করে তবে ওর স্বভাব বড় চপলা। ও যে বড় হয়েছে চোখেমুখে, বেশভূষায় বিজ্ঞাপন। বেশ গিন্নীবান্নি চেহারা ওর। কেউ ওর মুখের দিকে তাকালে চোখ পিছলে চলে যাবে বুকে।

কানন ব্যস্ত হয়ে বলল, তুই একা এসেছিস না সঙ্গে কেউ আছে?

পথ ক্লান্তির সামান্য ছোঁয়া ছিল কমলার চেহারায়, তবু সে ঠোঁট ভরিয়ে হাসল, আমার সঙ্গে আবার কে আসবে? আমি তো বড় হয়ে গেছি!

হাসতে গিয়েও হাসি আটকে গেল কাননের মুখে, বড় হয়েছিস বলেই তো চিন্তা। ঠাকুরপো তো তোকে ছেড়ে দিয়ে যেতে পারত?

বাবার একদম সময় নেই। কমলার মোটা ঠোঁট নড়ে উঠল, আমি বিকেল বেলাতেই পৌঁছে যেতাম কিন্তু বাসটা কৃষ্ণনগরে এসে খারাপ হয়ে গেল। আবার বাস পাল্টে আসতে হল।

তোর ভয় করল না? কানন শুধোল।

ইরা পাশে দাঁড়িয়ে বলল, কী সাহস রে তোর! আমি হলে ভয়ে কেঁদে ফেলতাম।

মোটা ঠোঁট নড়ে উঠল কমলার, গজদাঁত দেখিয়ে বলল, আর ঢঙ দেখাতে হবে না। তুই তো আমার মতো মূর্খ নোস যে ভয় করবে! কমলা মিষ্টি করে হাসল, জানিস তোর জন্য বাবা আমাকে কথা শোনায়। বলে—ইরার মত মেয়ে হয় না। ও আমাদের বংশের গর্ব।

ইরার চোখ লজ্জায় কুঁকড়ে গেল। দ্বিজপদর বাড়িয়ে বলার স্বভাব। কমলাকে উসকে দেবার জন্য সে হামেশাই ইরাকে উপরে টেনে তোলে।

কমলা ঘরে ঢুকে এসেই দেখতে পেল জয়দেবকে । পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কাননকে চাপা গলায় শুধোল, জেঠিমা, ইনি কে?

জয়দেব। করিমপুরে থাকে। কাননের অপ্রস্তুত কণ্ঠস্বর।

কমলা উদ্যম হারাল না, চোখের তারা নাচিয়ে বলল, ভালই হল। যাওয়ার সময় ওনার সঙ্গে যেতে পারব।

বিরক্ত কানন বলল, এত কষ্ট করে এলি দু একদিন থাকবি না? এসেই যাওয়ার কথা বলতে নেই। যা, হাত-মুখ ধুয়ে নে। আমরা সবাই এক সঙ্গে খাবো।

ইরা, তোর এখনও খাওয়া হয় নি? কমলা আকাশ থেকে পড়ল। ভ্রূ বেঁকিয়ে বলল, কী করছিলি এতক্ষণ?

চাঁদ দেখছিলাম। ইরার গলায় ঠাট্টা।

একা একা? কমলা ঠোঁট টিপে হেসে উঠতেই ইরা তার গলাটা ধরে টিপে দিল, তুই আর শুধরাবি না দেখছি। এত বড় হলি তবু সেই একই রকম থেকে গেলি!

আমি তোর মতন মাস্টারনী হতে পারলাম কই?

চুপ কর। খাবি চল। ইরা হাত ধরে টানল।

জয়দেব কথা বলা সুযোগ পেয়ে বলল, কাল আমরা হাজারদুয়ারী দেখতে যাব। তুমি কি যাবে?

কমলা খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠল, কেন যাব না? নিয়ে গেলে নিশ্চয়ই যাব।

তাহলে ইরাকে রাজি করাও। জয়দেবের মুখের দিকে তাকিয়ে কমলা বলল, কেন ইরা কি যাবে না বলছে? ও না গেলে ওকে আমি জোর করে ধরে নিয়ে যাব। আমার সঙ্গে শক্তিতে ও পারবে না। কমলা ইরার ঘাড়ের উপর হাত রাখল, আহ্লাদী সুরে বলল, অ্যাই ইরা, তুই কেন যাবি না রে? তোকে যেতেই হবে। কত দিন আমরা এক সঙ্গে বেড়াতে যাইনি বল তো?

ইরা কথা না বলে উঠে গেল। তার মন বলছিল কাল মঙ্গল আসলেও আসতে পারে। এতদিন যোগাযোগ না করে কী করে আছে সে? তাহলে কি মাধবীর কথাটাই সত্যি!

খাওয়া দাওয়ার পরে মেঝেতে বিছানা পাতল কানন। আলো ডিম করে পাশাপাশি শুলো ইরা অ'র কমলা। গুরুপদ নাক ডাকছিল বিশ্রীভাবে। ইরার ঘুম আসছিল না। কমলা পাশ ফিরে শুয়েই চিমটি কাটল তাকে, ফিসফিসিয়ে শুধোল, ছেলেটা কে রে?

ইরার কথা বলার ইচ্ছে নেই। চুপ করে পড়ে থাকল সে। কমলা কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না, আমি সব বুঝে গিয়েছি। তোর লাকটা ভাল।

শুয়ে পড়, বকর বকর করিস না।

কাল যাবি না?

ভোর হোক. তারপর দেখা যাবে। ইরা হাত বাড়িয়ে ঝিমানো আলোটাকে নিভিয়ে দিল। তবু তার চোখের ভেতর থেকে আলোর রেখা মুছল না।

## ।। আট ।।

মঙ্গল এল প্রথম বর্ষার জল গায়ে মেখে, তখন চারদিক সবুজে সবুজ, নদীনালা পুকুর সব ভরে গেছে কানায় কানায়, পাতিহাঁস বর্ষার ভেজা রোদে পালক চুলকায় হলুদাভ ঠোঁট দিয়ে। ইরা জানলা খুললেই জলের শব্দ শুনতে পায়, বৃষ্টির জল ঢালু পথ বেয়ে নেমে যাচ্ছে পাশের ডোবায়, খড়কুটো ধুলো বালি জলকে এগিয়ে দেয় তার নিজস্ব জায়গায়। ইরাকে মাধবী পৌঁছে দিয়ে গেছে তার নিজের ঘরে, গায়ে মাথায় পিঠে সান্ত্বনার হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছে, মন খারাপ করো না। তোমাদের প্রেমের কুঁড়িটা অকালে ঝরে গেল এর জন্য আমি দুঃখিত। আমার দাদার ব্যবহারে আমি লজ্জিত। আমি ভেবেছিলাম সে আমার কথা শুনবে, আমার মতে মত দেবে। তা যখন হল না তখন তুমি তোমার মতো করে বাঁচো।

ইরার চোখের কোণে জলজ মেঘ এসে জড়ো হল, আমি তোমাকে কোনও দোষ দিই

না। সব দোষ আমার ভাগ্যের। মেয়ে হয়ে জন্মেছি যখন তখন এ অবহেলা তো সইতে হবে।

মঙ্গলের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করেছে মাধবী। এর অনেক কারণ আছে। মঙ্গল তাকে যে মেয়েটার ছবি দেখাল তা দেখে মাধবী সুখী হতে পারেনি এক ফোঁটা। ঠোঁট বেঁকে উঠল তার, দাদা, এটা তোর উচিত হল না। ইরাকে তুই কথা দিয়েছিলি। সে তোর পথ চেয়ে আছে। তাকে ঠকানো তোর পাপ।

মঙ্গল যে কাউকে ঠকায় নি এটা সে হাবভাবে বুঝিয়ে দিল। ইরাও সেই সদ্য পরিচিত মেয়ের ফটোটা দেখেছিল। মঙ্গলই তাকে দেখাল। ফটোটা ধরতে গিয়ে হাত কাঁপছিল ইরার। মঙ্গলকে সে কোন কথা বলতে পারে নি। জোর করে আর যাই হোক ভালবাসা হয় না। এটা তার মতো ভাল আর কেউ বোঝে না।

ফিরে আসার সময় মঙ্গল বলল, আবার এসো। একটা ছেলের দু-তিনটে মেয়ে বন্ধু থাকতেই পারে। এটা কোন অন্যায়ের নয়।

ইরার কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। সংকোচের [illegible] ভেঙে মঙ্গল ভীষণ রকমের প্রাণবন্ত। হাসতে হাসতে মঙ্গল বলল, সোনালী আমাকে ভালবাসে। আই লাভ সোনালী।

এরপরে ইরার দাঁড়িয়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। সে চলে আসার সময় মাধবী ডাকল, তবু পিছন ফিরে তাকাল না ইরা। ঘরে ফিরে চোখ ভাসিয়ে কাঁদল। হতচকিত কানন মেয়ের কান্নার নিগূঢ় অর্থ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, মাধবীদের ঘর থেকে ফিরে এলি বুঝি? ফিরে আসবি আমি জানতাম। ওরা বড়লোক, ওরা তোর মন বুঝবে না। তবু তুই মিশতিস, আমি বাধা দিই নি। আজ তোর ভুল ভাঙল। তবে বড্ড দেরী করে তোর ভুল ভাঙল! এখন কপাল চাপড়ান ছাড়া তোর আর কোনও পথ নেই।

বৃষ্টির মধ্যে এসে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ফিরে গেল মঙ্গল। ইরা গোপনে দাঁড়িয়ে তার চলে যাওয়া দেখল। বিল্টু দিদির দুঃখী মুখের আদল দেখতে অনভ্যস্ত। সে শুধোল, দিদি, তোর কি মা মরে গিয়েছে যে অমন মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছিস।

বিল্টুর কথা শুনে চমকে উঠল ইরা, ভাইকে কাছে টেনে নিয়ে নিজেকে শক্ত করে বলল, আমার যে কী হয়েছে আমি তা জানি না। তবে শরীরটা আমার ভাল নেই। সব সময় চোখ দিয়ে জল কাটে।

যতদিন যাচ্ছিল ততই একাকীত্ব গ্রাস করছিল ইরাকে। ঘরে তার মন বসে না কিছুতেই। এর মধ্যে সে মাধবীদের কোয়ার্টারে যায় নি, যাওয়ার কোনও উৎসাহ বোধ করেনি। সেদিন কলতলায় মাধবীর সঙ্গে দেখা হল। দেখা মাত্রই মাধবী হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল ছায়ায়, আমার উপর রাগ করেছ বুঝি?

না, রাগ করতে যাব কেন?

তাহলে যে আর আসো না।

একদম সময় পাই না।

আমি বিশ্বাস করি না। তোমার নিশ্চয় কিছু হয়েছে।

আমার আবার কী হবে? ইরা বরফের মাছের মতো চোখ মেলে তাকাল। তারপরের দিন সকালের বাসে মাধবী ফিরে গেল হোস্টেলে। যাওয়ার সময় সে ইরার সঙ্গে দেখা করে গেল। স্বভাবসুলভ হাসিতে ঠোঁট ভরিয়ে বলল, হোস্টেলের ঠিকানাটা রেখে দাও।

কৃষ্ণনগরে এলে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

কৃষ্ণনগরে গিয়ে মাধবীর সঙ্গে দেখা করা আদৌ সম্ভব হবে কিনা ইরা তা জানে না তবে সে ঠিকানাটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে। মাধবীর বন্ধুত্বকে সে কীভাবে অস্বীকার করবে? এ যুগে মাধবীদের মতো মেয়ের সংখ্যা খুব কম। কমলা যে কয়দিন এখানে ছিল তাকে জ্বালাতন করে মেরেছে। জয়দেবের ছায়া যেখানে কমলার ছায়া নড়ে উঠত। কাননও বিরক্ত হয়েছিল। একদিন গুরুপদ জোর করে কমলাকে পৌঁছে দিয়ে এল। আসার সময় সে দ্বিজপদকে সতর্ক করে বলেছিল, মেয়ে বড় হয়েছে, ওর বিয়ের ব্যবস্থা কর।

তোর মেয়েও বড় হয়েছে, তাকে কি শিকেয় তুলে রাখবি?

গুরুপদ এর পবে আর কোনও কথা বলতে পারে নি। তার অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে দ্বিজপদ হেসেছিল, মেয়েরা কুড়িতে বুড়ি। একবার বিয়ের বয়স পেরিয়ে গেলে ভ্রমব উড়ে পালায়! তখন মেয়েকে মাদুলি বানিয়ে সারা জীবন বইতে হয়।

দ্বিজপদর কথাগুলো ঘরে এসেও ভুলতে পারেনি গুরুপদ। এতদিন ইরাকে নিয়ে তার খচখচানী ছিল, এখন সেই খচখচানী পুরনো বাতের ব্যাথার আকার নিল। ইরা তার সামনে ঘুরঘুর করলে গুরুপদর বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ির ঘা মারে। ভয়ে সে ইরার মুখের দিকে তাকায় না। যে ক্ষীণ আশা জয়দেব তাদের মনে জাগিয়ে ছিল, ইরা তা নিজের হাতেই নষ্ট করেছে। শেষ কবে জয়দেব তাদের ঘরে এসেছিল, গুরুপদ তা স্পষ্ট মনে করতে চায় না। দীর্ঘশ্বাসে বুক ভাসিয়ে একটা মানুষ কত দূর এগিয়ে যেতে পারে? মানুষের দমই বা কতটুকু?

ইরা ইদানীং চাকরির জন্য চেষ্টা করছে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের কার্ডটা রিনিউ করে এল কৃষ্ণনগর থেকে। সে একাই গিয়েছিল সেদিন। গুরুপদ তার সঙ্গে যেতে চাইলে ইরা তাকে বুঝিয়ে বলল, কমলা যদি অত দূর থেকে বাস পালটিয়ে এখানে আসতে পারে তাহলে আমি কেন পারব না? আমাকে ছেড়ে না দিলে আমি যে হাঁটতে পারব না। কতদিন তুমি আর আমাকে হাত ধরে হাঁটা শেখাবে?

মেয়ের তীক্ষ্ণ বেগবান কথার কাছে গুরুপদর সামান্য যুক্তি তোপের মুখে উড়ে গেল। সে বলতে বাধ্য হল, যুগ বদলাচ্ছে, তোরাও বদলে যা। তাহলে আমার কাঁধটা হালকা হয়।

কাঁধ হালকা হওয়া মুখে যত বলা সহজ বাস্তবে আদৌ তা নয়। গুরুপদর কাঁধে আরও যেন চেপে বসেছে দায়িত্ববোধ। ইরাকে সে নিয়ে গিয়েছিল ডাক্তার বাবুর বাসায়। ডাক্তারবাবু সব শুনে বললেন, চাকরির ব্যাপারে আমার কোনও হাত নেই। তবে সি. এম. ও. এইচকে আমি তোমার অসুবিধার কথা বুঝিয়ে বলব। তিনি চাইলে ইরার কিছু হলেও হতে পারে। তবে গ্রুপ-'ডি' তে ঢুকতে হবে।

ইরার এতে কোন আপত্তি নেই। তার জীবনের মস্ত স্বপ্ন ছিল সে নার্স হবে। সেইমত নিজেকে তৈরী করছিল। গুরুপদ পয়সার অভাবে তাকে টিউশনি দিতে পারে নি। সন্ধ্যায় একজন মাস্টার মশাই তাকে ঘরে যেতে বলত। ইরা যেত। একদিন বাবার বয়সী মাস্টার মশাই ফাঁকা ঘরে কু প্রস্তাব দিল। বলপ্রয়োগ করল। ইরা বাধা দিতে গিয়ে শুনল, চুপ করে থাক। কাউকে বলবি নে। আমি তোকে সবরকম সুযোগ-সুবিধা দেব।

বুকের ভেতর চেপে বসা সর্পিল হাতটা ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ইরা আর সেখানে

দাঁড়ায় নি। বজ্র-বিদ্যুৎ ভর্তি আকাশকে সাক্ষী রেখে সে বই-খাতা ফেলে রেখে ছুটে গিয়েছিল ঘরের দিকে। এত বৃষ্টিতে ভিজেও তার বুকের যন্ত্রণা কমল না, বরষার জলে মিশে গেল চোখের জল। মাস্টার মশাইকে সে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না। ঐ একটা ঘটনাই তার জীবনকে বদলে দিল পুরোপুরি। ফেলে আসা বইয়ের দিকে সে আর কোনদিনও তাকাল না। সেই থেকে তার মনের ভেতর তীব্র ঘৃণার চাষ-আবাদ। ওই মাস্টারমশাইকে সে কি কোনদিন ক্ষমা করতে পেরেছে? রোজই যখন ভেজা শরীর নিয়ে সে বাথরুমে যায় কাপড় ছাড়তে তখনই তার মনে পড়ে যায় মাস্টারবেশী এক রাক্ষসের কথা। ওই একটা লোক তার জীবনটাকে অন্য খাতে বইয়ে দিল। তা যদি না হোত তাহলে সে অন্য দশ-পাঁচটা মেয়ের মতো বাঁচতে পারত সুখ-দুঃখ আর হাসি-আনন্দে। এখন কোনও ছেলের সঙ্গে তার দেখা হলে তার মনে পড়ে যায় একটা বিকটদর্শন রাক্ষসের মুখ। রাক্ষসটা বুঝি তাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতে চায়। অহোরাত্র। এই দুঃস্বপ্নকে ভুলে কোথায় পালাবে সে?

আজ আর গুরুপদ তার মেয়েকে লাল চোখ তুলে শাসন করে নি, কাননও বকাসকা করলেও কোনদিন সৌজন্যতার মাত্রা ছাড়ায় নি। শুধু পল্টুই বদলে ফেলে নিজেকে। অসৎ সঙ্গে মিশে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে সে। ইস্কুলে যাবার নাম করে সে প্রায়ই পালিয়ে যায় বাঁধের ধারে, ইরা অনেকদিন তার মুখ থেকে বিড়ির গন্ধ পেয়েছে। জামা-প্যান্ট কাচতে গিয়ে পকেট হাতড়ে পেয়েছে বিড়ির ভাঙা টুকরো। পল্টুকে শাসন করতে গেলে ইরার বুকের ভেতরটা কাঁপে। পল্টুর মুখ চাঁছাছোলা তরোয়াল। কোথায় কি বলতে হয় সেই বোধটুকু তার হয় নি। ইরা জানে এ সবের মূলে শুধু অভাব দায়ী নয়, এর পেছনে অশিক্ষা আর নোংরা পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। সে নিজেও তো এর বাইরে যেতে পারে নি। দিন রাত পাঁক ঘাটালে পাঁকের বদঘ্রাণ শরীর ছোঁবেই।

বৃষ্টি ধরতেই রোদ ফুটল আকাশে। ঘরের সামনের বকফুল গাছখানা এখন কত সবুজ! অথচ মাত্র ক'দিন আগেও গাছটার ছিল মরমর দশা। ওর কাণ্ডটা রোদ পোহানো কুমিরের পিঠের চেয়েও খসখসে। এখন বৃষ্টির জল পেয়ে মসৃণতা এসেছে প্রকৃতির উঠোনে। ঘাসফুলে ভরে আছে মাঠ। বেড়াকলমীর ডালগুলো ফুলের ভারে দুলে ওঠে হাওয়ায়। ইরা চুপচাপ দেখে সব কিছু। কানন মেয়ের এই আপাত গম্ভীর মনের খোঁজ রাখে না। বাসের শব্দ পেলেই কাজের অজুহাতে ছুটে যায় হাসপাতালের গেটের ধারে। মা যে কেন অমনভাবে ছুটে যায় ইরা সব কিছু বুঝতে পারে। জয়দেবকে দেখতে চায় কানন। ছেলেটা একা, তার আপন বলতে কেউ নেই। এত বড় পৃথিবীতে একটা মানুষ একা, ভাবলেও কষ্ট হয়। কানন ইরার মন বুঝে বলল, যা না আজ বুড়োমাতলা থেকে পুজো দিয়ে আয়। ফল নারকেল ধূপ সিঁদুর সব ঘরে আছে। স্নান করে তুই বিল্টুর সাথে চলে যা।

ইরার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, তবু মায়ের মুখের উপর সে না বলতে পারল না। আর কত দুঃখ দেবে ওদের? ওদের কথা মত চললে তার জীবনটা সরলরেখা হয়ে যেত।

ইরা স্নান সেরে এল। ভেজা কাপড় ছেড়ে এল বাথরুমে। ভেজা চুল কোমর ছুঁয়েছে। বকফুলের মতো জৌলুষ ভরা শরীর। দীঘল চোখের টান শাপলার পাপড়ি। সবাই বলে সে নাকি তার বাবার মতো লম্বা। লোকে মিথ্যে কথা বলে না। এগার হাত শাড়ি বুঝি তার শরীর ঢাকতে অক্ষম। ডাক্তার ঘোষের স্ত্রী তাকে বলেছিল, তোমার এই চেহারাটা

ভগবানের দান। নিজেকে সতর্ক রেখো সব সময়। পথে ঘাটে শয়তান লোকের অভাব নেই।

ডাক্তার ঘোষের স্ত্রী কী বলতে চেয়েছেন ইরার তা বোধগম্য না হলেও অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। ইস্কুলে পড়ার সময় ক্লাসের মেয়েরা তাকে দেখে টিপ্পনী কেটে বলত, তোর মতন চেহারা পেলে আমার বাবা আর চিন্তা থাকত না। ভগবান যাকে দেয় সব উজাড় করে দেয়।

ইরার গর্ব হোত এসব কথা শুনে। তবু সে প্রতিবাদ করে বলত, রূপ থাকলেই যে পাত্র ভ্রমরের মতো ছুটে আসবে এ যুক্তি আমি মানি না। মাকালফল দেখতে সুন্দর কিন্তু তার কোন গুণ নেই। এ সংসারে যার গুণ নেই সে তো অচল পয়সা।

বুড়োমাতলায় পুজো দিয়ে ইরা ভাবছিল মা কালীর কাছে কী চাইবে। সবাই তো হাতজোড় করে কিছু না কিছু পাবার আশায়। স্বার্থচক্রে পুরো পৃথিবীটাই দুলছে। এ যেন সেই জ্যোতির্বিজ্ঞানের কক্ষপথ। নিজস্ব কক্ষপথ থেকে কেউ যেন আর ছিটকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। যে যার নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। কারোরই সময় নেই অন্যকে দেখার। স্বার্থময় এই মেলামেশার বিরুদ্ধে যেতে পারে না ইরা। সে জানে কানন আজ তাকে কেন বুড়োমাতলায় পাঠাল। জয়দেব ফিরে এলে কানন হয়ত নিজে আসবে পুজো দিতে। নাহলে সে শান্তি পাবে না।

বুড়োমাতলায় ইরা জোড় হাতে দাঁড়িয়ে বিড়বিড়িয়ে বলল, মাগো, তুমি যা ভাল বুঝ তাই করো। আমার জীবনটা সুন্দর না হোক অসুন্দর করো না। আর হাঁটতে পারছি না মা। এত কঠিন পথ তুমি কেন আমার সামনে বিছালে?

পুজো সেরে ইরা আসছিল প্রসন্ন চিত্তে। বর্ষার মেঘ উড়ে উড়ে চলে গেছে বহুদুরে। জলে ধোওয়া আকাশে আয়নার ঝিলিক। বহু দূরের ছায়াপথ ডিঙিয়ে গড়িয়ে নামছিল রোদ। হাসপাতালের মাঠে গোরু চরছিল লেজ দুলিয়ে। ঘাসে মুখ, পিঠের উপর জোড়া ফিঙে পাখি বসে। সদর গেটের সামনে দিয়ে ধোওয়া মোছা পিচ রাস্তা চলে গিয়েছে শহরের দিকে। ইরার মনে পড়ল এই রাস্তা দিয়ে তারা প্রথম এসেছিল এখানে। মালবাহী ভাড়া টেম্পুর ঝাঁকুনিটা রাস্তায় পা ছোঁয়াতেই টের পেল সে। বিশ্বনাথ তাকে যে ডাকছিল সে শুনতে পেল না। হাসপাতালের গেট পেরিয়ে মাঠে নামতেই দৌড়ে এল বিশ্বনাথ। তার দিকে তাকিয়ে ইরার হাঁটার গতি মন্থর হল, কাকু, কিছু বলবেন?

পান কষে চোবান দাঁত বের করে হাসল বিশ্বনাথ, কোথায় গেছিলে মা জননী।

পুজো দিতে। ইরা বলল।

বিশ্বনাথ গায়ে পড়া হাসি হাসল, পুজো-আর্চ্চা করা খুব ভাল। এতে মন পরিষ্কার রাখে।

ইরার ব্যস্ততা দেখে বিশ্বনাথ বলল, তাড়া আছে বুঝি? একটু দাঁড়িয়ে যাও। ইরা প্রসাদ দিল। বিশ্বনাথ মাথা ঠেকিয়ে মুখে পুরে দিয়ে বলল, আমি আর তোমার সময় নষ্ট করব না। তাড়াতাড়ি বাড়ি যাও। তোমার বাবার শরীর ভাল নেই।

কেন কী হয়েছে কাকু? ইরার কন্ঠস্বর কেঁপে গেল।

বিশ্বনাথ গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, না তেমন কিছু হয় নি। এই একটু মাথাটা ঘুরে

গিয়েছিল আর কী! অবশ্য পল্টু পাশে ছিল। সে ধরে ফেলেছে। না হলে কী যে হো
তা উপরওয়ালাই জানে। বিশ্বনাথ হাত উপরে তুলে অদৃশ্য কাউকে প্রণাম জানিয়ে স্থি
হয়ে দাঁড়াল।

ইরার কাছে এ সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রপাত। কাঁসার রেকাবীটা শক্ত হাতে ধরে
ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। বিশ্বনাথ গলায় মমতা মাখিয়ে বলল, যাও মা জননী, আ
দাঁড়িয়ে থাকা তোমার উচিত হবে না। বয়স হলে মানুষের কখন যে কী হয় বলা মুশকিল
তাছাড়া ঘরে বিবাহযোগ্যা মেয়ে থাকলে কোন বাবার না চিন্তা হয় বলো?

ইরার চোখ ভরে জল এল।

বিশ্বনাথ মুখ দিয়ে অদ্ভুত দুঃখ প্রকাশের শব্দ করে উঠল, কেঁদো না মা জননী। দুঃ
বিপদআপদ নিয়েই তো আমাদের সংসার। তাছাড়া তোমার বাবার বয়স হয়েছে। চে
করো সে যেন কিছুতে দুঃখ না পায়।

ইরার এত কথা শোনার ধৈর্য ছিল না, রেকাবিটা কোনমতে ধরে সে ঘরের দি
ছুটতে লাগল হাওয়ার বেগে।

## ।। ৯।।

বাঁধের গোড়ায় জল এসেছে, ফারাক্কা থেকে জল ছাড়লে গঙ্গা বেড়ে অনায়াসে চলে আ
বাঁধের কাছে। শুধু আখখেতই ডুবল না, ডুবে গেছে ধান পাট। চাষীর কপালে হা
হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে চালের দাম। বাজারে কেরোসিন তেল পাওয়া যচ্ছে না, চাপড
দোকান থেকে ফিরে এসে বিল্টু কাননকে বলল, মা, কী হবে গো, রাতে কি আমাদে
অন্ধকারে থাকতে হবে।

গুরুপদ সবে ডিউটি সেরে ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছে, তখনই বিল্টুর উদ্বেগভ
কথাগুলো তার কানে গেল। কিছুটা বিরক্ত বোধ করল সে কিন্তু পরক্ষণে সামলে নি
নিজেকে। সময়টা এখন কারোরই ভাল যাচ্ছে না, চারদিক থেকে ভেসে আসছে অসুখে
খবর। মাঝে তাকে দেশের বাড়িতে যেতে হয়েছিল, সেখানে দ্বিজপদর অসুখ। কী যে অ
তার হয়েছে ডাক্তারও ধরতে পারছে না, শুধু দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে সে। গুরুপদ একব
ভেবেছিল ভাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে কিন্তু পকেটের জোরের কথা চিন্তা করে ত
ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল। এছাড়া কাননও চায় না ঘরে লোকজন আসুক। আত্মীয়স্ব
এলে কাননের শুধু পরিশ্রম বাড়ে না, ধার-দেনায় তলিয়ে যায় গুরুপদ।

কেরোসিন তেল বাজার থেকে উধাও, এটা কোন সুখবর নয় গুরুপদর কাছে। চাপড়
ভূষিমাল দোকানী ওদের বড় হিতাকাঙ্খী, গুরুপদকে সতর্ক করে বলেছিল, কিছু মনে ক
না, বাজারের অবস্থা ভাল নয়। বৃষ্টি যে ভাবে হচ্ছে তাতে মনে হয় সহজে পরিষ্
হবে না মেঘ। এভাবে বৃষ্টি হলে ধান-চালের দাম বাড়বে। হয়তো বাজার থেকে কেরোসি
মতো চালও উধাও হয়ে যাবে। তখন চড়া দাম দিয়ে চাল কেনা তোমার পক্ষে খুঁ
হয়ে যাবে। তার চেয়ে একটা কাজ কর, এক বোরা চাল আগাম ঘরে রেখে দাও।

তুমি দু-মাসে দিও।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুদ্ধ থামে নি এখনও। গোলা বারুদের গন্ধে হাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠছে দিনে দিনে। মানুষের চোখ লাল হয়ে ফুলে উঠছে, জল কাটছে। অসুখটার নাম নাকি 'জয়বাংলা'। ফোলা কমলেও চোখের লালচে ভাবটা কমতে আরও দু-পাঁচ দিন বেশি লাগছে।

গুরুপদর চোখ লাল হয়ে জল ঝরছিল অনবরত, তবু সে বিল্টু আর পল্টুকে নিয়ে চাপড়ায় গেল। পুরনো সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে হাঁটছিল বিল্টু। দু-ধারের ডোবা নালায় জলের সমারোহ, ডোবার ধারের ঘাসগুলোর অফুরন্ত প্রাণশক্তি অনেক সময় জলের উপর বিছিয়ে দিয়েছে কমনীয় দেহ। একটা ডাহুক কুক কুক ডাকতে ডাকতে রাস্তা পেরিয়ে চলে গেল ঝোপের ভেতর। পল্টু অবাক করা চোখে দেখল সব। নিশপিশিয়ে উঠল হাত। আক্ষেপ করে বলল, গুলতিটা থাকলে ওর বাবার নাম ভুলিয়ে দিতাম। গুরুপদর চোখে মুখে ফুটে উঠল বিরক্তির আলপনা। এই ছেলেটাকে নিয়ে সে আর কিছুতেই পেরে উঠছে না। পড়াশোনায় একদম মন নেই পল্টুর। পুরো গরমের সময়টা সে গুলতি হাতে ঘুরল। হাসপাতালের গোলা পায়রাগুলো তাকে দেখলে ভয়ে উড়ে পালায়। বড় আমগাছের পাখিগুলোও ভয় পায় তাকে। দূর থেকে ছায়া দেখলেই ওরা ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায়। এতে বেশ গর্ব বোধ করে পল্টু কিন্তু বুক শুকিয়ে যায় গুরুপদর। হাই ইস্কুলের হেডমাস্টার মশাই একদিন তাকে বললেন, গুরুপদ, তোমার ছোট ছেলেটির দ্বারা আর কিচ্ছু হবে না। ওর পড়াশোনায় মন নেই। স্কুলে এলে সারাক্ষণ বদমায়েসী করে বেড়ায়। ওকে নিয়ে অন্য মাস্টাররাও ব্যাতিব্যাস্ত। তুমি ওকে একটু শাসন করো। নাহলে ছেলেটা অল্প বয়সে বিগড়ে যাবে।

শাসন কাকে করবে গুরুপদ, পল্টু যে শাসনের বাইরে।। টালি কারখানার শ্রম বেচতে আসা হত দরিদ্র ছেলেগুলো তার প্রাণের বন্ধু। ও তাদের সঙ্গে বিড়ি খায়, চুরি-চামারি করে বেড়ায়। মাধবীদের মর্তমান কলার কাঁদি কেটে নিয়ে পল্টু লুকিয়ে রেখে দিল শালবাবুদের পরিত্যক্ত কারখানায়। সেই কলা পাকতেই ওরা পাঁচ-ছয়জন মিলে অনেকদিন ধরে খেল। পল্টু একছড়া কলা তার মায়ের জন্য এনেছিল। গুরুপদ কলার সাইজ দেখে সন্দেহ বসে পল্টুকে ডেকে শুধিয়েছিল। কিছু আমি হাপিস করে দেব। আমাকে তো চেনো না, আমার মাথায় রক্ত উঠে গেলে আমি কাউকে ছাড়ব না।

ওরা তোর কী দোষ করেছে?

কী করে নি ওরা! মঙ্গলদা দিদিকে ধোঁকা দিয়েছে। ওর বাবা-মা জানো— আমাদের কত ঘৃণা করে।

তা বলে তুই চুরি করবি?

চুরি তো করিনি, না বলে কেটে নিয়ে গেছি।

অত টুকুন ছেলের অত বড় কথা শুনে গুরুপদ মাথার ঠিক রাখতে পারেনি, পল্টুর কান ধরে ঠাস করে একটা চড় মেরেছিল। আচমকা চড় খেয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল পল্টু, সে আদৌ কাঁদে নি, দূরে গিয়ে বলেছিল, কেন মারলে? তুমি আমার বাবা হও সেইজন্য তোমাকে ছেড়ে দিলাম। নাহলে—

দাসপাড়ার সাঁকোটার কাছে এসে গুরুপদ আনমনে নিজের আঙুল কামড়ে ধরল। পল্টু তার পাশাপাশি হাঁটছে। বিল্টু সাইকেল গড়িয়ে হাঁটছিল আগে আগে। এখানে আসার পরে খুব সস্তায় পুরনো সাইকেলটা কিনেছে গুরুপদ। বিশ্বনাথই দরদাম ঠিক করে দিয়েছে। কেনার সময় সেও কিছু টাকা উধার দিয়েছিল। এক বস্তা চাল আনতে গেলে ঘাড়ে করে আনা যাবে না। চাপড়া গ্রাম তো হাসপাতাল থেকে কম দূরে নয়। গুরুপদ ভাবল সাইকেলে লোড করে দেবে বস্তা। তারপর বাপ-বেটায় ঠেলবে।

ঘরে চাল মজুত, জগতখালি বাঁধ ভেঙে বন্যা হলেও তার আর কোনও চিন্তা নেই। গঙ্গার জল যে হারে বাড়ছে তাতে বাঁধ ভাঙলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিল্টু রোজ হাসপাতালে যায় বুলগার হুইটের খিচুড়ি আনতে। এই ভাঙা গমগুলো নাকি বিদেশ থেকে আসে। ওদেশে নাকি গমের চাষ ভাল হয়। এত গম হয় যে খাওয়ার লোক থাকে না। ওরা বস্তায় ভরে সমুদ্রে গমগুলো ফেলে দেয় প্রথমে। ক'দিন পরে গমগুলো পচে গেলে ওগুলো তুলে আনা হয় সমুদ্র থেকে। তারপর একটা গমকে দু-তিন টুকরো করা হয় মেসিনের সাহায্যে। সেখান থেকে বস্তায় পুরে জাহাজ ভরে চলে যায় গরীব দেশগুলোয়। বিশ্বনাথ এসব তথ্য শুনে এসেছে গ্রামের কোন মাতব্বরের কাছ থেকে। গুরুপদকে বলতেই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।

বুলগার হুইটের খিচুড়ি রাঁধার দায়িত্বে আছে সে আর বিশ্বনাথ। ডাক্তার বাবু বলেছেন, টাকা পয়সা পাবে কী না জানি না তবে পেট ভরে খিচুড়ি খেও। রোজ বিকেলে বাইরের উনুনে গমচুরের খিচুড়ি রাঁধে গুরুপদ, তাকে সাহায্য করে বিশ্বনাথ। সয়াবিনের তেল ছিটিয়ে নুন হলুদ দিয়ে খিচুড়ি রাঁধতে খারাপ লাগে না গুরুপদর। আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে গরীব মানুষরা থালা হাতে ছুটে আসে খিচুড়ি খাবার লোভে। আসলে এগুলো বড়দের জন্য নয়। শিশুরাই কেবল এর ভাগীদার। হাসপাতাল থেকে নাম লিখে কার্ড দিয়েছে। সেই কার্ড হাতে লাইনে দাঁড়ালে ডাবু হাতার এক হাতা খিচুড়ি পাবে ওরা। গুরুপদর ঘরে কার্ডে নাম লেখানোর মত কেউ নেই, যারা আছে তাদের বয়স তো পেরিয়ে গিয়েছে, তাদের আর শিশুর পর্যায়ভুক্ত করা যাবে না। তবু রোজ ছোট হাঁড়ি ভরে খিচুড়ি নিয়ে আসে কানন। রাতে তাকে রান্না করতে হয় না, সরকারী খিচুড়িতেই রাতটা চলে যায়। গুরুপদও তৃপ্তির ঢেকুর ছেড়ে বলে, যে দিনটা যায়, সে দিনটাই ভাল। যাক ঘরের চালগুলো তো বাঁচান গেল। এক বেলার চাল বাঁচানো এই খারাপ সময়ে কম কথা নয়।

কানন হা করে শোনে তার কথা। অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, তোমার ঐ গমচুরের খিচুড়ি খেয়ে আমার পেটটা ভার হয়ে থাকে সবসময়। ওগুলো কি সত্যিকারের গমের গো? যদি গমই হয় তাহলে হজম হতে চায় না কেন?

ইরা হাঁপিয়ে উঠছিল এই জায়গায়। এই হাসপাতালে তার সঙ্গে মেলামেশা করার আর কেউ নেই। মাধবীও তো কলেজ-হেস্টেলে চলে গিয়েছে, পুজোর ছুটির আগে সে কিছুতেই এখানে আসবে না। বারবার আসা যাওয়া করলে পড়াশোনায় মনোসংযোগ নষ্ট হয়। একা থেকে থেকে ইরার বেশ কষ্ট বাড়ছিল। ওর চোখে-মুখে স্বস্তির কোন চিন্তা ছিল না। গুরুপদর মেয়েকে দেখলে কষ্ট হোত। টিউশনি ছেড়ে দেওয়ার পর ইরার হাতে সেলাই ফোড়াই করা ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না।

টুনি দিদিমণি সুন্দরবন অঞ্চল থেকে এসেছেন এই হাসপাতালে। ইরার চাইতে দু' এক বছরের বড় হবেন তিনি। ওর কোয়ার্টারটা গুরুপদর কোয়ার্টারের থেকে সামান্য দূরে। টুনি দিদিমণি একা থাকেন সেই কোয়ার্টারে। কাঁচা বয়স, তার উপর ভরা যৌবন—ফলে অনেকেই তার দিকে লোভের চোখে তাকিয়ে থাকে। টুনি দিদিমণি এখান থেকে বদলি নিয়ে চলে যেতে চান। কিন্তু ডিসট্রিক্ট ট্রান্সফার অত সহজে হয় না। কাঠখড় না পোড়ালে ঘি না ঢাললে সরকারী ফাইলের ফিতে খোলা হয় না। টুনি দিদিমণি হাসপাতালের একজন ফিল্ড স্টাফকে নিয়ে বার তিনেক রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ঘুরে এসেছেন। তবু কোনও আশার আলো তার চোখে ফুটে ওঠেনি। তবু চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই তার তরফ থেকে।

টুনি দিদিমণির সঙ্গে আলাপ হয়ে ভাল লেগেছিল গুরুপদর। ওকে দেখে তার মনে হয়েছিল এই মেয়েটা বুঝি ইরার জোড়া। টুনি দিদিমণির নজর কাড়া গায়ের রঙ যে কোন পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবে। ওর চেহারার বাড়তি লাবণ্য ভরা পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাকেও ম্লান করে দেবে। মাথাভরা চুল, চোখ দুটো তার কাজলটানা নিয়মিত শরীর চর্চার ফলে ওর চেহারার বাঁধুনি ঈর্ষণীয়। তবে টুনি দিদিমণি বয়সের তুলনায় একটু বেশি মোটা, দূর থেকে দেখলে তাকে বেশ বয়স্ক বলেই মনে হয়। তবে সে ইরার মত দীর্ঘাঙ্গী নয়, ওর মুখটা পানপাতা গড়ন নয়, অনেকটা বটপাতার মতো। তাহলেও এক নজর দেখলে টুনি দিদিমণিকে সুন্দরী বলতে হয়।

সেই টুনি দিদিমণি গুরুপদকে তার কোয়ার্টারে ডেকে বলল, আমি একটা প্রয়োজনে আপনাকে এখানে ডেকেছি। ইরা আপনার মেয়ে। ওর সঙ্গে আমার এখনও আলাপ হয়নি। তবে আমি আলাপ করে নেব। টুনি দিদিমণি তারপর একটু থামলেন, কপালের উপর ঝুঁকে পড়া কুঁকড়ান চুলগুলো সাটপাট চুলের ভিড়ে মিশিয়ে দিয়ে বললেন, আমি এই কোয়ার্টারে একা থাকি। রাতে আমার খুব ভয় করে। এর আগে হরিদাসী নামের একজন বুড়ি আমার এখানে কাজ করত। রাতে সে আমার ঘরেই শুতো। দিন পনের হল বুড়িটা আর কাজে আসছে না। আমি খবর নিয়ে জানলাম—বুড়িটার খুব অসুখ। সে আর হয়তো কাজ করতে পারবে না। তা না পারুক, তার জন্য আমার তত বিশেষ অসুবিধা নেই। একা মানুষের কাজ আর কতটুকু থাকে? আমি নিজের কাজ এখন নিজেই করে নিই। শুধু অসুবিধা হয়েছে রাতে থাকার লোক নিয়ে। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা বলি। ইরা তো ঘরে ঘুমোয়। ও যদি কষ্ট করে শুধু রাতটা আমার এখানে শুতো তাহলে আমি ভয়ের হাত থেকে বাঁচতাম।

গুরুপদ টুনি দিদিমণির সমস্যাকে হৃদয় দিয়ে বুঝতে পেরেছিল। নার্সিং ট্রেনিং পাশ করে টুনি দিদিমণি এখানে চাকরি নিয়ে এসেছে। ঘরের একমাত্র সন্তান। তার আর জেঠতুতো খুড়তুতো ভাই-বোন নেই। ওর বৃদ্ধ বাবা-মা গ্রামের বাড়িতে থাকেন। ওখানে ওদের জমিজমা, পুকুরঘাট, গোরু-ছাগল আছে। ওখানকার সাজানো-গোছানো সংসার ফেলে বুড়োবুড়ি যে মেয়ের কাছে এসে থাকবেন তারও উপায় নেই। টুনি দিদিমণি বেতন নিয়ে মাসে একবার ঘরে যায়। দু'দিন থেকে বাবা-মা'র দেখাশোনা করে আবার ফিরে আসে। এইভাবেই চলছিল এতদিন। হঠাৎ হরিদাসীর অসুখটা তাকে যে চিন্তায় ফেলেছে, এ নিয়ে আর গুরুপদর মনে কোন সংশয় থাকল না। সে প্রকৃত শুভাকাঙ্খীর মতো বলেছিল,

ঠিক আছে ইরা আপনার কাছে শোবে। আমার মেয়ে বড় মুখচোরা, লাজুক। ওকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নেবেন। আর দায়-অদায়ে আমাকে খবর দেবেন। আমি কানে শুনতে পেলে ঠিক হাজির হব।

স্টোভ ধরিয়ে চা করে এনেছিল টুনি দিদিমণি, সাদা প্লেটে দুটো বিস্কুট সাজিয়ে দিয়ে বলেছিল, আর একটা অনুরোধ ছিল, যদি রাখতেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, অতো সংকোচের কী আছে?

টুনি দিদিমণি ঢোক গিলে নরম চোখে তাকিয়ে মিহি গলায় বলেছিল, আমি আপনার মেয়ের মতো। আমাকে আপনি না বলে তুমি করে বললেই আমার শুনতে খুব ভাল লাগত।

গুরুপদ গরম চায়ে ছ্যাঁকা খেয়ে খুবই আশ্চর্য হয়ে টুনি দিদিমণিকে দেখছিল, একসময় সে তার বিস্ময়বোধকে চাপা দিয়ে রাখতে পারল না, হ্যাঁ মা, আমি তোমাকে তুমি করেই বলব। তবে কি জান, কেউ যদি আগে থেকে না বলে তাহলেই বা কী করে আমি সাহস পাই। তুমি এই হাসপাতালের নার্স। তোমার খ্যাতিসম্মানের সব কথা তো আমার জানা। তবে তুমি আর কোনকিছু নিয়ে ভাববে না। সামনেই আমার ঘর। দায়ে-অদায়ে আমার কাছে এসো। আমি গরিব কিন্তু মনের দিক থেকে অতো গরিব নই।

টুনি দিদিমণির সঙ্গে ইরা চলে গেছে সুন্দরবন এলাকায়। ওরা দিন দশেক পরে ফিরবে। ইরা না ফেরা পর্যন্ত ঘরটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। যে কানন ইরার পিছনে সদা সর্বদা লেগে থাকত, সেও একদিন দুঃখ করে বলল, মেয়েটাকে অত দূরে পাঠিয়ে দিলে, আমার মন কিন্তু ভাল বলছে না। তুমি জোর করলে আমার কিন্তু মন চাইছিল না। তোমার চাপে পড়ে আমি মেয়েটাকে ছেড়ে দিলাম।

—চাপ কি শুধু আমার ছিল, তোমার মেয়ের কথা কেন বলছ না? ও তো যাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। ও অমন করে গলা জড়িয়ে বলল আমি আর না করতে পারিনি।

কানন মুখ ভার করে থাকল, দশ দিনের আর কত বাকি গো? আমি শুধু এখন দিন গুনছি। জানো, পল্টুরও ভীষণ মন খারাপ। কাল খেতে বসে বলল, মা, দিদি কবে আসবে গো? দিদি না থাকলে ঘরে আসতে মন চায় না। দিদি হল আমাদের এ ঘরের লক্ষ্মী। আমি হলাম তার বাহন — পেঁচা।

কাননের মন খারাপের যথেষ্ট যুক্তি ছিল। ইরাকে সে কোনদিন চোখের আড়াল হতে দেয়নি, পাখির মায়ের মতো আঁকড়ে রেখেছে বুকে। শরীরের ওমে স্নেহের বাঁধন দৃঢ় হয়েছে আরও। ইরা চলে যাওয়াতে কানন বুঝতে পারল, মেয়েটার বিয়ে হয়ে গেলে তার আয়ুরেখা আরও ছোট হয়ে যাবে, সে আর বেশিদিন বাঁচবে না।

ইরার সাময়িক অনুপস্থিতিতে গুরুপদর সংসার যে টালমাটাল এটা বাহ্যত দৃশ্যমান না হলেও অন্তর্গত অনুভূতিতে সোচ্চার। ভেজা আবহাওয়ায় মন ভিজে গেলে মানুষের বুঝি দাঁড়াবার আর জায়গা থাকে না। বিশ্বনাথ এখন গুরপদর ছায়াসঙ্গী, গমচুরের খিচুড়ি রান্নার সুবাদে তাদের বন্ধুত্ব আরও প্রগাঢ় হয়েছে। মাঝে মধ্যেই বিশ্বনাথ গুরুপদর কোয়ার্টারে আসে, লাল চা খেয়ে সুখ-দুঃখের গল্প করে চলে যায়। তার ডাক্তারী এখন রমরমিয়ে চলছে। অসুখ-বিসুখের সংবাদ পেলেই সে হাজির হয় রোগীর বাড়িতে,

ইনজেকশন দিয়ে আসে নিয়ম করে। ডাক্তারবাবু বিশ্বনাথকে এখন বেশ স্নেহের চোখে দেখেন। কোন কিছুর দরকার হলে তিনি আগে বিশ্বনাথকে ডাকবেন। পেশেন্ট পার্টির সঙ্গে কথা বসিয়ে দেবেন। ডাক্তারবাবুর সামনেই টাকা-পয়সার চুক্তি হয়ে যায় তার। বাড়িতে গিয়ে ইনজেকশন দিয়ে আসলে তার ফি নেয় বিশ্বনাথ। ড্রেসিং করার পয়সা আলাদা। তবে গ্রামের আশি ভাগ মানুষই দিন আনে দিন খায়, এরা গরিব পর্যায়ভুক্ত। গরিব হোক আর বড়লোক হোক কাউকেই বিশ্বনাথ ছেড়ে কথা বলে না। সে তার টাকা পয়সা ঠিকঠাক না পেলে ঝগড়া করবে। গলা চড়িয়ে বলবে, এত যদি টাকা দিতে কষ্ট হয় তাহলে হাসপাতালে চলে যাও। লাইন দিয়ে ড্রেস করাও, ইনজেকশন নাও। ঘরে বসে আরামে ইনজেকশন নিলে গ্যাটের পয়সা তো একটু খসবে. মরা পেটের জন্য তো আমি এত দুর সাইকেল ঠেঙিয়ে আসি। আমার যদি পেট না ভরে আমি কেন আসব? আমাকে তো পাগলা কুকুরে কামড়ায়নি যে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াব।

বিশ্বনাথ যে রোগীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা নেয় এ খবর সবার জানা। ওর কোয়ার্টারের সামনে সব সময় একটা কাঠের বেঞ্চি পাতা থাকে। গ্রামের লোকজন এসে বেঞ্চিতে বসে। একটা ভাঙা তেলচিটে চেয়ারে বসে বিশ্বনাথ খুব মন দিয়ে তাদের কথা শোনে। স্টোভের উপর একটা ছোট সসপ্যানে সব সময় গরম জল ফুটতে থাকে। ইনজেকশনের সিরিঞ্জও ডুবনো থাকে সেখানে। ভাল মত স্টেরিলাইজ না করে কাউকে ইনজেকশন দেয় না। স্পিরিট তুলো আর কয়েকটা বিভিন্ন আকারের সুচ আর একটা ছোট বাক্সে শোভা পায়। ঘোষ ডাক্তারবাবুর পুরনো, পরিত্যক্ত স্টেথোস্কোপ ঐ বাক্সে যত্ন করে রেখেছে। খুব প্রত্যন্ত গ্রামে গেলে সঙ্গে করে সে ওই স্টেথোস্কোপটা নিয়ে যেতে ভোলে না। দাসপাড়ায়, মোকামপাড়ায় বিশ্বনাথের খাতির খুব জমকালো। ওরা তাকে ভগবানজ্ঞানে মান্য করে। আশেপাশের অনেক গ্রামে তার যাতায়াত। কেউ একবার ডাকলেই হল, সে এক ছুটে সাইকেল নিয়ে হাজির। তার বাক্সে জ্বর মাথাধরা পেটব্যথা পায়খানার ওষুধ থাকে সবসময়। ওই ওষুধগুলো তার কেনা নয়। হাসপাতাল থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অজুহাতে সংগ্রহ করা। গ্রামে গেলে সে তখন আর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নয়, নিজেকে জাহির করে ছোট ডাক্তার হিসেবে। কেউ তার ভিজিট দিতে না পারলে সে মুরগি লাউ কুমড়ো এমন কী পুঁইডাঁটা পর্যন্ত নিয়ে চলে আসে। তবে দোয়েম সুজাপুর অথবা কামারী গ্রামে গেলে সে কম করে দশটা মুরগির ডিম দক্ষিণা নেবে। হাসপাতাল থেকে রোগীর গ্রামের দূরত্ব বুঝে তার দক্ষিণার মাত্রা ধার্য হয়। সে যে শুধু মানুষের ডাক্তার তা নয়, গোরু ছাগল এমন কী শুয়োরের চিকিৎসাতেও সে পারদর্শী। তার কাছে একটা তরলা বাঁশের পাঁপ আছে। ওটার এক মুখ সুচলো করে অন্য গোল মুখে ওষুধ ঢেলে দেয় গোরু ছাগলকে খাওয়ানোর জন্য। তবে পশু চিকিৎসার ক্ষেত্রে সে এ্যালোপ্যাথির উপর বেশি গুরুত্ব দেয় না, কবিরাজী চিকিৎসায় তার তখন ঝোঁক বেশি। গাছগাছড়ার শেকড় পাতা ফুল কুঁড়ি বেটে সে ওষুধ তৈরী করে যত্ন নিয়ে। হামান দিস্তায় ওষুধ ছ্যাঁচার সময় তার ভেতরে কোনও ফাঁকি থাকে না। তবে কেউ যদি টাকা পয়সা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে তাহলে তার ভেতরে অসন্তোষ দানা বাঁধে, খুব বুদ্ধি করে নিজেকে সে সরিয়ে নেয় ওসব বিতর্কিত জায়গা থেকে। পরম হিতার্থীর মতো বলবে, এসব ডেঞ্জার রোগ আমার দ্বারা সারবে না। আমি তো ছোটখাট ডাক্তার। আপনারা বরং গোরুর গাড়িতে

করে পশুটাকে বিডিও অফিসে নিয়ে যান। ওখানে পাশ করা পশুব ডাক্তার আছে। কড়া কড়া বড়ি ইনজেকশন আছে। পেটে পড়লে চারপায়ে খাড়া হয়ে লেজ তুলে দৌড়বে

এত যার বুদ্ধি মাথায় সেই বিশ্বনাথ ফেসে গেল একদিন। সকালবেলায় প্রতিদিনের মতো তার কাঠের বেঞ্চিতে রোগী এসে বসেছে। কেউ জনমজুর খাটতে যাবে, কেউ আবার গোরু নিয়ে যাবে মাঠে, কেউ লাঙল দেবে জমিতে, কেউ বা মই দেবে। মানুষের ব্যস্ততার আর শেষ নেই। আউটডোর খুলবে দশটায়। অতক্ষণ কে বসে থাকবে ফ্রি'তে ইনজেকশন নেবার জন্য। মাত্র দুটো টাকা ফেললেই বিশ্বনাথ সুচ ফুঁড়ে দেবে পছন্দ মতো জায়গায়। কামারী সুবলেব তাড়া ছিল বেশী। সে হড়বড় করে বলল, আমার ইন্‌জিসীনটা তাড়াতাড়ি ফুঁড়িয়ে দাও। আমাকে মাঠে যেতে হবে। অনেক দেরী হয়ে গেল। বিছানা থেকে উঠে মুখ ধুয়ে চা খাচ্ছিল বিশ্বনাথ। সুবলের ব্যস্ততার গুরুত্ব বুঝতে পেরে সে বলল, বসো জুঁৎ করে। ইনজেকশনটা দাও। সিরিঞ্জ ধোয়া আছে। হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি।

পেনিসিলিন ইনজেকশন বিনা টেস্টেই সুবলের শরীরে ঢুকিয়ে দিল বিশ্বনাথ। ওষুধের বিক্রিয়ায় মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই মুখে গ্যাঁজলা উঠে স্থির হয়ে গেল সুবল। বিশ্বনাথ মুখে গ্যাঁজলা উঠতে দেখে ভয় পেয়ে ছুটে গিয়েছিল গুরুপদর কাছে। বিস্তারিত না বলে হাত ধরে টেনে এনেছিল তাকে। গুরুপদ যখন এল তখনও বেঁচে ছিল সুবল, ওর হাতে পায়ে খিঁচ ধরেছে, শিরাগুলো টানটান, চোখ উল্টে মুখের দুপাশে জমে উঠেছে সাদা ফেনা। এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা বিশ্বনাথের ডাক্তারী জীবনে এই প্রথম। হাজারটা কিংবা তারও বেশি সূচ ফুঁড়েছে, কই এমন অঘটন তো ঘটেনি? লোকে তো বলে তার ইনজেকশনের হাত ভাল। এমন কি অনেক দিদিমণির চাইতেও ভাল। হাসপাতালে স্পেশ্যাল ক্যাম্প হলে, ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের বিশেষ কর্মসূচী চলাকালীন ডাক্তার ঘোষ তাকেই বেছে নেন ইনজেকশন দেবার জন্য। যদিও তার কোন ইনজেকশনের ট্রেনিং নেই তবু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে ও কাজে লাগাতে পুরোপুরি সক্ষম। দু-চোখে আঁধার দেখতে বিশ্বনাথ স্থান কাল পাত্র ভুলে পা চেপে ধরেছিল গুরুপদর, দাদা আমাকে বাঁচাও। চাকরি চলে গেলে আমার বৌ-বাচ্চা না খেতে পেয়ে মারা যাবে। এটা মার্ডার কেস গো। আমার জেল হয়ে যাবে।

গুরুপদ ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেছিল অনেকক্ষণ, বিশ্বনাথকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে বলে সে পড়িমড়ি করে ছুটে গিয়েছিল ডাক্তারবাবুর বাসায়। সব কিছু শুনে ডাক্তার ঘোষ বললেন, সুবল মারা গিয়েছে তাকে তো আর ফেরানো যাবে না। যে মানুষটা বেঁচে আছে, তাকে যাতে না মরতে হয় আমি সেই চেষ্টা করব। তুমি একটা কাজ কর গুরুপদ। যত তাড়াতাড়ি পার স্ট্রেচার নিয়ে লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে এসো। আর লক্ষ্য রেখো যাতে বেশি লোক জানাজানি না হয়।

গুরুপদ যখন স্ট্রেচার নিয়ে সুবলকে ওঠাতে যাবে তখন দু-বার ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল চোখের তারা। মাথাটা হেলে পড়ল গুরুপদর হাতের উপর। রুগী আসার আগে ডাক্তারবাবু হাজির। সেলাইন সেট নিয়ে তিনি তৈরি ছিলেন। মৃত সুবলকে হাসপাতালে স্ট্রেচারে করে বয়ে আনল গুরুপদ আর বিশ্বনাথ। ডাক্তার ঘোষ সেলাইনের সুচ ঢুকিয়ে দিলেন সুবলের শিরায়। দু'ড্রপও টানল না, হাত ভিজে গেল সেলাইনে। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ডাক্তার ঘোষ বিব্রত চোখে বিশ্বনাথের দিকে তাকালেন, বিশ্বনাথ কান্না

ভেঙে পড়ে পা জড়িয়ে ধরল ডাক্তারবাবুর। পা'টা রাগবশতঃ ছাড়িয়ে নিলেন ডাক্তার ঘোষ, কিছুটা দূরে সরে গিয়ে তিনি রুষ্ট স্বরে বললেন, তুমি আজ ক্ষমার অযোগ্য কাজ করেছ। আমি চাইলে তোমাকে পুলিশে হ্যাণ্ড-ওভার করতে পারি। কিন্তু সেটা কোনও সলিউশন নয়। তোমার ফ্যামিলিটা রুইণ্ড হয়ে যাক আমি তা চাই না। যদি বাঁচতে চাও তো পেসেন্ট পার্টির বাড়িতে সংবাদ দাও।

অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ ওরা আর ডাক্তারী শাস্ত্রের কী বোঝে, শুধু এইটুকু বুঝল, যাওয়ার সময় হয়েছিল তাই সুবল অসময়ে চলে গেল। এ ঘটনার পরে সাত রাত ঘুমাতে পারে নি বিশ্বনাথ। প্রায়ই চলে যেত দাসপাড়ায় হারুর কাঁচা মদের আড্ডায়। গুরুপদ সঙ্গের লোকটাকে তলিয়ে যেতে দেখে প্রকৃত বন্ধুর মতো টেনে তুলল, শাসন করে বলেছিল, এ তুমি কী করছ বিশ্বনাথ? তোমার ঘর পরিবার আছে। মাসে দু'একবার মদ খেলে তোমাকে মানিয়ে যায় কিন্তু তুমি যদি রোজকার খদ্দের হও হারু দাসের তাহলে তোমার সুখের সংসারে উই লাগবে। নিজেকে সামলাও, নাহলে তুমি ডুবে যাবে। জলে ডুবে গেলে মানুষ সাঁতার কেটে উঠতে পারে কিন্তু পাঁকে ডুবে গেলে তুমি যে ভাই আর উঠতে পারবে না।

গুরুপদর কথায় বিশ্বনাথের নেশার ঘোর কেটে গেল, সে গুরুপদর হাত ধরে ক্ষমা চাওয়ার মতো করে বলেছিল, দাদা, তুমি আমার চোখের চালসে সরিয়ে দিলে। আমি আর অন্ধের মতো হাঁটব না। আমি ক্লাস ফোর স্টাফ, আমি আর কোনদিন কাউকে ইনজেকশন দেব না। আমার জীবন তো শেষ হয়ে যাচ্ছিল শুধু ভগবানের মতো ডাক্তারবাবু ছিলেন বলেই আমি রক্ষা পেলাম। বাঁধের ধারে জল দেখতে গিয়েছিল পল্টু আর বিল্টু। কানন নিষেধ করল, যাসনে, বাণের জল বুনো হাতির চেয়েও সবল। কেউ কোথায় ঠেলে ফেলে দেবে তখন বিপদ ঘটে যাবে।

বিল্টু কোন জবাব না দিলেও পল্টু রুখে দাঁড়াল, হাজার হাজার লোক যাচ্ছে কই তাদের তো কিছু হচ্ছে না। আমরা গেলে যত মহাভারত অশুদ্ধ। এত ভয় যার ভেতরে থাকে সে কী করে মা হয় বুঝি না।

কাননের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল পল্টুর জবাব শুনে, সে তবু ওদের ভয় দেখানোর জন্য বলল, তোর বাবা আসলে আমি সব বলে দেব। ডিউটি যাওযার আগে তোর বাবা রেশন তোলার টাকা দিয়ে গেছে। রেশনটা আজ না তুললে আর পাওয়া যাবে না। বাজারে চিনির কত দাম। গমও পাওয়া যাচ্ছে না।

বিল্টু ফিসফিসিয়ে পল্টুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কী সব আলোচনা করল। শেষে বাহাদুরী দেখিয়ে পল্টু বলল, দাও রেশনের ব্যাগটা দাও। তবে বলে যাচ্ছি রেশন তুলে আমরা কিন্তু জল দেখতে যাব।

ভেজা বাঁধ। বৃষ্টির জলে এঁটেল মাটি পেছল হয়ে আছে। যদি যাস তো সাবধানে যাবি। অনেক দূরে দাঁড়িয়ে জল দেখবি। ভিড় দেখলে ধারে কাছে যাবি না। আমি শুনেছি কাল একজন ভেসে গিয়েছে গাঙের জলে। কাননের দুঃশ্চিন্তা ওদের মনে কোন রেখাপাত করল না। রেশনের ব্যাগগুলো নিয়ে ওরা চলে গেল।

রেশন তুলে ফেরবার সময় বিল্টুর মুখে কোনও কথা নেই। সে উঁচু ক্লাসে পড়ছে, পড়াশুনায় মন্দ নয়। তার বোধশক্তি, কোন কিছু বিচার করার প্রক্রিয়া পল্টুর চাইতে

ঢের বেশি উৎকৃষ্ট।

রেশন ডিলার মন্মথবাবু রসিদ লেখার সময় কার্বন পেপারের মতো কালো মুখ করে বললেন, গম নেই, চিনিও আসে নি—তবে মাইলো বলে একরকম জিনিস এসেছে ওটা কি তোরা নিবি?

মন্মথবাবুর গোল চশমা পরা মুখের দিকে তাকিয়ে থ মেরে গেল বিল্টু। মাইলো শব্দটা জীবনে তার প্রথম শোনা। এর আগে মাইলো সে চোখেও দেখেনি। পল্টুর দিকে তাকিয়ে বিল্টু চোখের ইশারায় বলল, কী করব রে?

পল্টু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বড়দের মতো করে বলল, নিয়ে নে। সরকার থেকে দিয়েছে যখন তখন খারাপ জিনিস হবে না।

মন্মথবাবু খসখস লিখতে লিখতে বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস তোরা। সরকার থেকে যখন দিচ্ছে তখন নিয়ে নেওয়াই ভাল। মাইলো তো খাবার জিনিস, বিষ নয়।

গোল গোল রক্তমুখ দানাগুলোর সঙ্গে বিল্টুর সেই প্রথম পরিচয়। হাতে নেড়ে ঘেঁটে তার মনে হয়েছিল এগুলো কোন মনুষ্য খাদ্য নয়, এগুলো সম্ভবত পশুখাদ্য।

বাঁধের জল দেখে মন ভরে গেল ওদের, আনন্দ উত্তেজনার পাশাপাশি ভয় এসে তাঁবু বিছালো বুকের ভেতর। ছাড়া জলের যা তর্জন-গর্জন যে কোন সময় বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে যেতে পারে হাসপাতালের মধ্যে। তা যদি হয় তখন শুধু হাসপাতাল নয় দেবগ্রাম পাগলাচণ্ডী পলাশী রেজিনগর সব ভেসে যাবে। পুরো জেলা এবং তৎসংলগ্ন এলাকা ডুবে যাবে জলের তলায়। তখন কী হবে, কোথায় দাঁড়াবে ওরা। ভয়-শিহরণ রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ বুকে পুরে নিয়ে ওরা ফিরে এল ঘরে। গুরুপদ ডিউটি থেকে ফিরে একটা বিড়ি ধরিয়েছে সবে আর ঠিক তখনই কানন মুখ শুকিয়ে তাকাল, আজও ইরাটা এল না। মেয়েটা যে কোথায় গেল, কেমন আছে কোনকিছুই জানতে পারছি না।

গুরুপদ দাপনা চুলকে কাননের দিকে তাকাল। মনে তার চিন্তা থাকলেও বুকে সাহস রেখে বলল, মেয়েটা তো আর ভেসে যায় নি, ও তো টুনি দিদিমণির সঙ্গে গিয়েছে। তোমার আর ইরাকে নিয়ে অত না ভাবলেই ভাল হবে। এখনও দশদিন হয়নি, ওরা ঠিক দশদিন পরে আসবে।

কানন ঝাঁঝিয়ে উঠল না, কেমন ম্রিয়মান চোখে তাকাল, মেয়ে বড় হলে চোখের বাইরে গেলে সব মায়েরই চিন্তা বাড়ে। পুরুষগুলোর বুক তো পাষাণ দিয়ে গড়া। ওদের চিন্তা কেন হবে?

গুরুপদর চিন্তা হলেও সে তা মুখ ফুটিয়ে বড় করে কারুর কাছে বলে না। কিন্তু পল্টু যখন তার এক হাত দূরে রেশনের ব্যাগটা নামিয়ে রাখল তখন ব্যাগের ভেতর রক্তমুখ ব্রণর মতো খাদ্যবস্তুগুলো দেখে তার শুধু চিন্তাই হল না কপালে ভাঁজ পড়ল অনেকগুলো, এসব কী এনেছিস তোরা?

পল্টু জবাব দেবার আগে বিল্টু বলল, মাইলো। মন্মথবাবু দিল। দামে সস্তা।

— দামে সস্তা? তার মানে? গুরুপদ আগ্রহ নিয়ে ঝুঁকে পড়ল ব্যাগের উপর, তার পর হাত চালিয়ে দিল ব্যাগের ভেতর, খাবলা দিয়ে দু-মুঠো মাইলো তুলে নিয়ে বলল, এগুলোকে মাইলো বলে, হ্যাঁ রা? বাপের জন্মেও দেখিনি শুনিনি! তা এগুলো কী ভাবে খেতে হয়?

বিল্টু বাবার বোকা বোকা মুখটার দিকে তাকিয়ে পণ্ডিতের হাসি হাসল, এগুলো গমের মতো পিষে আটা বানিয়ে খেতে হয়। খেতে অনেকটা গমের মতো লাগে। এগুলো ভেজেও খাওয়া যায় মন্মথবাবু বলল।

মন্মথবাবু যাই বলুক গুরপদ কিছুতেই ঐ লালমুখ শস্যদানাগুলোকে খাদ্যবস্তু হিসাবে মানতে পারছিল না। তার মনের কোণে কত যে প্রশ্ন উঁকি ঝুঁকি মারল। এক সময় নিজেই ফুঁপিয়ে উঠল সে। কানন চা বানিয়ে নিয়ে এসে তার পাশে বসতেই বিড়বিড়িয়ে উঠল গুরুপদ, কালে কালে কত কী যে দেখব তা কে জানে? পেটের জন্য আর কী কী যে খেতে হবে তার কোন ঠিক নেই। ভগবান, আর যাই-ই খাওয়াও মানুষের মাংস যেন মানুষকে খেতে না হয় কোনদিন। গম্ভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গুরুপদ চায়ের কাপটা স্পর্শ করল কাঁপা হাতে। দুধ ছাড়া চায়ের মতো পৃথিবীটা ভেসে উঠল তার চোখে।

## ।। দশ।।

মাত্র দশ দিনের ছুটি ব্যাঙাচির লেজের মত একদিন নিঃশেষ হয়ে ফিরে যাওয়ার দিনটাকে সামনে এনে দিল। ইবার মন্দ লাগেনি জায়গাটা, একঘেয়েমী থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির শ্বাস নিচ্ছিল ঘনঘন। প্যাচপেচে কাদার মতো মন নিয়ে সে যে কালীগঞ্জে এতগুলো দিন কীভাবে কাটিয়েছে তা ভেবে শিহরিত হল। বেড়ার এক পাশে দাঁড়িয়ে টগর গাছটার দিকে তাকিয়ে সে দূরের খোলা মাঠটার দিকে তাকাল। সকাল হয়েছে একটু আগে, রোদ এসে কিৎকিৎ খেলছে বর্ষার জল খাওয়া ঘাসের উপর। এ দিকটায় বৃষ্টির পরিমাণ বেশি, মেঘ থেকে ঝরে পড়া বিন্দুগুলোর ওজন আরও বেশি। গায়ে লাগলে একেবারে ত্বকের ভেতরে টোকা মারে। টুনি দিদিমণি হাসতে হাসতে বলেছিল, বৃষ্টির মতো কারোর যদি জীবন হোত?

কেন? প্রশ্ন করেছিল ইরা।

টুনি দিদিমণি গালে টোল ফেলে বলেছিল, বৃষ্টির জীবনের কোনও স্থিরতা নেই। পক্ষপাত বিচার নেই। গড়িয়ে কোথাও গিয়ে মিশলেই হল।

রোদ উঠলে বৃষ্টির আয়ু শেষ হয়। ইরা কী ভেবে বলেছিল কথাটা। টুনি দিদিমণি জবাব দিতে তাকিয়ে আনমনে বলল, আমি যদি বৃষ্টির ফোঁটার মতো হতাম তাহলে নিজেকে নিয়ে আমার এত চিন্তা থাকত না। আজ আমার জন্য তোমারও তো কম কষ্ট হল না!

টুনি দিদিমণি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পেল না। বিগত দশ দিনে তার উপরে ঝড় বয়ে গেছে। অন্য কোন মেয়ে হলে ভেঙে পড়ত নির্ঘাত। সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে দু-পা এগিয়ে আবার পিছিয়ে আসত চার পা। ঘরের বাইরে বেরোত না। চোখের নীচে

কালি ফেলে শুকনো রুক্ষ চেহারা নিয়ে ঘুরত। হয়ত তেল দিত না মাথায়, চিরুনীর স্পর্শ পেত না চুল। আর যা যা হোত না তার কোনও কিছুই টুনি দিদিমণি করল না। শুধু ভাঙা ভাঙা গলায় ইরার হাত ধরে বলেছিল, তুমি আমার বন্ধু আবার বোনও। আমার সঙ্গে তোমার বয়সের পার্থক্য বেশি নেই। শুধু একটাই পার্থক্য আছে আমি একটা চাকরি করি, তোমার কোনও চাকরি নেই। শুধু এইটুকু পার্থক্যের জন্য তুমি আমার থেকে অত দূরে থাকবে তা আমি কেন মানব? তুমি আমাদে দিদি বলে ডাকবে। আমাকে পিসি বলবে না। আমি তোমার বাবার বোন হতে যাব কেন? আমি যদি তা মেয়ে হই তাহলে আপত্তি কোথায়?

হাসপাতালের ঘরোয়া নিয়ম হল যত নার্স আসবে তারা সব স্টাফদের ছেলেমেয়েদের পিসি হবে। এই নিয়মের বাইরে ছিল টুনি দিদিমণির কথাগুলো। ইরার পছন্দ হল। সত্যিই তো তার থেকে একমাত্র তিন চার বছরের বড় মেয়েকে সে কেন পিসি বলে সম্বোধন করবে? টুনি দিদিমণিকে সে টুনিদি বলে ডাকবে। সেই প্রথম রাতেই ইরার মুখোমুখি বসে টুনি দিদিমণি শুধিয়েছিল, সত্যি কথা বলতে কি তুমি ভয় পাও? যদি ভয় না পাও তাহলে তোমাকে বলি তোমার জীবনে কি কোনদিন প্রেম এসেছিল?

ইরা এমন ধরনের একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিল না, আড়ষ্ট ভীতু গলায় সে বলেছিল, প্রেম এসেছে কিনা জানি না তবে আমার একজনকে ভাল লাগত।

—কে সেই মহাপুরুষ?

—মাধবীর দাদা মঙ্গল।

—প্রেমের পরিণতিটা কী হল? এখন কি লজেন্সের মতো চুষতে চুষতে ছোট হয়ে এসেছে প্রেম?

ইরার হাই উঠে এল গলায়, চোখে জড়িয়ে যেতে চাইল ঘুম, তবু সে অলস আড়মোড়া ভেঙে বলল, আমার প্রেম ন্যাপথলিনের বলের মতো উড়ে গিয়েছে। যেটুকু সুবাস ছিল তাও হারিয়ে গেছে।

তোমরা জন্য দুঃখ হয়। টুনি দিদিমণির কণ্ঠস্বরে আপন হবার বাসনা। ইরার হাত নিজের মুঠোয় এনে আলতো চাপ দিয়ে বলেছিল, আমি একজনকে ভালবাসি, তার নাম বিমল। তুমি হয়ত তাকে দেখে থাকবে এই হাসপাতালে কাজ করে। ছেলেটা ভাল, তবে -। টুনি দিদিমণি থামল. চোখের কোণে কৌতুকের হাসি, ঠোঁটে ফুটে উঠেছে দুষ্টুমীর রেখা। বিমলকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারি নি, মন আগে না শরীর আগে। তবে ও বলে শরীরকে কেন্দ্র করে প্রেমের লতা বেড়ে ওঠে। মন হল সেই লতার ফুল।

ইরা খুব মন দিয়ে শুনেছিল, সব কেমন তার কাছে ধাঁধার মতো লাগল। কিন্তু স্টাফ বিমলকে ইরা যে এতদিনে দেখেনি তা নয়। বড়ই চালাক চতুর সে। হাঁসের মত স্বভাব জলে সাঁতার কাটবে কিন্তু পাখনায় লাগাবে না জলের দাগ। পাঁক ঘাঁটবে কিন্তু নোংরা হলে তার যত আপত্তি। সারাদিন এ গ্রামে সে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় বিমল। ক্লান্ত হয়ে যখন কোয়ার্টারে ফেরে তখন তার ইচ্ছে করে টুনি দিদিমণির হাতে এক কাপ চা খেতে।

রোজই টুনি দিদিমণির কোয়ার্টারে চা খেতে আসত বিমল। রেডিও শুনত। রাত ন'/দশটার আগে সে তার নিজের ঘরে যেত না। টুনি দিদিমণির ডিউটি থাকলে বিমলের আরও সুবিধা। সে সাতটা বাজলেই চলে যেত ডিউটি রুমে। এইভাবেই ওরা একদি

কে অপরের মনের কাছে পৌঁছে গেল। এক বেলা দেখা না হলে ওদের মনে হত কত াল যেন দেখা হয় নি!

টুনি দিদিমণি বিমলের কথা বলতে গিয়ে নীরব হয়ে গেল সেদিন। প্রসঙ্গ শিকেয় লে রাখতে চাইল। ইরাও জোর করে নি। ঘরের আলো কমিয়ে মশারী গুঁজে ওরা কই বিছানায় শুয়ে পড়ল।

এভাবেই রাতগুলো বেশ কেটে যাচ্ছিল ইরার। যে টুনি দিদিমণিকে তার দেখে মনে ত অহঙ্কারের ঢিপি, দু'চার দিন মেলামেশা করার পর তার মনে হল এমন নিপাট াল মনের মানুষ আর হয় না। টুনি দিদিমণির তুলনা একমাত্র জলের সঙ্গে করা চলে। ল সব পাত্রেই নিজেকে মানিয়ে নেয়। টুনি দিদিমণিও জলের চাইতে কম কী।

যতদিন গেল ওদের সম্পর্ক আরও গাঢ় হল। প্রায় রাতেই ইরার খাওয়ার নিমন্ত্রণ াকত। এক সঙ্গে না খেলে তার অভিমান হত। ঠোঁট ফুলিয়ে বলত, তুমি আমাকে নিজের াদি ভাব না। ভাবলে এত ঘনঘন আঘাত দিতে না।

সে রাতের কথা ভালই মনে আছে ইরার। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বাতাসে াত শীত আমেজ। নতুন বউয়ের কচি মুখের চেয়েও সুন্দর চাঁদ উঠেছে আকাশে। মেঘ াসে ঢেকে দেয় ওড়না। হাওয়া যেন ডানপিটে স্বামীর মতো খুলে দিতে চায় ওড়না। াঁকে দিতে চায় চুম্বন। গাছের পাতায় ঠিকরে পড়েছে চাঁদের আভা। জলের ছোঁয়ায় ীমঘষা মুখের উজ্জ্বলতা ফিরে পেয়েছে প্রত্যেকটি পাতা। মুরগির মাংস দিয়ে ভাত খয়ে ইরা অনেকক্ষণ গল্প করল টুনি দিদিমণির সঙ্গে। ওদের গল্পের কোনও বিষয়বস্তু াকত না, যা আসত ঠোঁটের ডগায় তাই উগরে দিত দু'জনায়, অকারণে হেসে উঠত দ্ধ ঘরের হাওয়ায়, কখন ওরা খুনসুটি করতে করতে আবেগ জোয়ারে ভেসে একে মপরকে জড়িয়ে ধরত অপার ভালবাসায়। রাত বাড়লে ঘুম এসে যেত ইরার পরিশ্রমী রীরে, কোল বালিশটা আঁকড়ে ধরলেই ঘুমের রাণী এসে তার চোখের পাতা বুজিয়ে দয়ে চলে যেত। সে রাতে কী কারণে যেন ইরার ঘুম ভেঙে গেল, ঘুম চোখে সে হাত াড়িয়ে দিল টুনি দিদিমণির দিকে, কিন্তু ফাঁকা বিছানায় তার হাত কারোর কোমল স্পর্শ পেল না। ভয়ে ঘুম ছুটে গেল তার। পঞ্চ ইন্দ্রিয় সজাগ করে সে জানতে চাইল ঘুমন্ত ময়েটা গেল কোথায়। তাহলে কি হাসপাতালে চলে গেছে সে, কেউ এসে ডেকে নিয়ে গছে রাতের বেলায়। এমন তো তাকে কোনদিন যেতে হয় না। তাহলে কোথায় যেতে পারে সে? বিছানায় চুপচাপ পড়ে থেকে ইরা নিজেকে যখন মানসিভাবে শক্ত করার চষ্টা করছিল তখনই চাপা কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এল তার। টুনি দিদিমণি রাগে ফুঁসছিল, খবরদার তুমি আর আমার কোয়ার্টারে চোরের মতো আসবে না। তোমাকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনেছি। তুমি আমার সর্বস্ব লুটে নিয়ে আমাকে এখন বঁড়শি গাঁথা মাছের মতো খেলাচ্ছো! যা দেবার থাকে একটা মেয়ের আমি তোমাকে তা দিয়েছি। এখন তুমি ভয়ে ইঁদুরের গর্তে ঢুকতে চাইলে আমি সাপ হয়ে তোমাকে ঠিক ছোবল মারব।

—টুনি, তুমি এত উত্তেজিত হয়ো না। আমার দিকটা একটু সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা কর। বিমলের কণ্ঠস্বরে ভয় মাখানো, তোমাকে বিয়ে করতাম যদি আমার বোনের বিয়েটা হয়ে যেত। মাধুরীর বিয়ে না দিয়ে আমি কী করে বিয়ের পিঁড়িতে বসি বলো।

—মাধুরীর বিয়ে না দিয়ে তুমি কেন এই ভালবাসার নাটক করলে? টুনি দিদিমণি

ফুঁপিয়ে উঠল। হয়ত চোখ মুছল অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আমার শরীর স্পর্শ করা আগে তোমার কি এতটুকু বিবেকে বাঁধল না! তুমি তো একজন হেলথ্ স্টাফ, তুমি কি জান না একজন কুমারী মেয়েকে জোর করে ভোগ করলে তার কী হতে পারে?

বিমল অন্ধকারে টুনি দিদিমণির হাত ধরল, যা হবার হয়ে গেছে। তুমি এবারের ম নার্সিং হোমে গিয়ে কনট্রাক্ট করে এসো। তোমার তো সব জানাশোনা, কোন অসুবিধ হবে না। প্রয়োজন হলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

—এছাড়া কি তোমার আর কোন সমাধান জানা নেই? টুনি দিদিমণির গলার স্ব নরম হয়ে এল, অনুষ্ঠান করে বিয়ে করতে তোমার যদি অসুবিধা থাকে তাহলে চ আমরা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করে নিই।

—বললাম তো মাধুরীর বিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমি কোনও কিছু করতে পার না। আমি অসহায় টুনি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

—আমার এত বড় সর্বনাশ করে ক্ষমা চাইতে তোমার বুক কাঁপছে না?

অন্য প্রান্ত থেকে কোনও উত্তর আসে না। টুনি দিদিমণি আবার সেই একই প্র ছুঁড়ে দিল। বিমল একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আমি আসছি। এবার তোমা মন যা চায় করো। আমি তোমার কোনও ব্যাপারে মাথা গলাব না। নার্সিং হোমের খরচে জন্য যদি টাকার দরকার হয় আমাকে বলো। আমি কারোর হাত দিয়ে টাকা পাঠি দেব। দরজাটা ঠেলে দিয়ে বিমল চলে গেল ঝোড়ো হাওয়ার গতিতে। অন্ধকারে এ একা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল টুনি দিদিমণি। রাতের অন্ধকার আর পেটের সন্তান সাক্ষী রেখে সে কাঁদল বুক উজাড় করে। তারপর একসময় রান্নাঘরের ছিটকানি খু জল খেল পেট পুরে। পা টিপে টিপে বিছানায় ফিরে এসে সে দেখল ইরা জেগে আ তার জন্য। ওর ঘুম চলে যাওয়া চোখে বিস্ময় আর উদ্বেগের রেণু। না থাকতে পে ইরাকে সে বুকে জড়িয়ে ধরল খড়কুটো ভেবে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, তুমি তো স শুনেছ; এবার আমি কী করি? আমার যে মরা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। আ মরব ইরা। দেখবে আমি ঠিক মরব।

—ছিঃ টুনিদি, এমন ভাবাও যে পাপ। ইরা সান্ত্বনা দিল, যে এসেছে তাকে তু নিজের করে নাও। সে তো শুধু তোমার।

টুনি দিদিমণির মুখ থেকে বেরিয়ে এল প্রশ্ন, অন্যের পাপকে আমি কেন সারাজী আগলে রাখব?

—পাপ তো শুধু তার একার নয়, তোমারও। তুমি কেন নিজেকে মেলে ধরেছি ইরার প্রশ্নে আহত, ব্যথিত চোখে তাকাল টুনি দিদিমণি, আমি জানি এ প্রশ্ন শুধু তু নও আমাকে সবাই করবে। আমার কাছে কোনও উত্তরও মজুত নেই। ঐ শয়তান আমাকে নষ্ট করে দিয়েছে।

টুনি দিদিমণির অনুরোধে ঐ রাতে চা করে আনল ইরা, মুখোমুখি বসে ওরা সিদ্ধ নিল, যে এসেছে তাকে চলে যেতে হবে অসময়ে। এছাড়া আর সব পথে কাঁটা বিছা বিমল তাকে যে কোনদিন বিয়ে করবে এমন প্রতিশ্রুতি সে দেয়নি। আর যদি প্রতিশ্রু দিত তাহলেও বিশ্বাস করত না সে। মাছ যেমন হাঙরকে কোনদিন বিশ্বাস করে না তেম সেও আর কোনদিন বিমলকে বিশ্বাস করে ঠকতে চায় না। নিজেকে বাঁচাবার জন্য টু

দিদিমণি ইরার হাতটা আঁকড়ে ধরে বলল, তুমি আমার ছোট বোনের মতো। আমার কলঙ্কের কথা যখন সব শুনেছ, তখন আমাকে তুমি কলঙ্কের পাঁক থেকে টেনে তোল। আমার বুদ্ধি সব লোপ পেতে বসেছে। আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না।

দশদিনের ছুটি নিয়েছে টুনি দিদিমণি, ইরা তার ছায়সঙ্গী। ভোরের বাসটা যখন কৃষ্ণনগরে এসে পৌঁছাল, তখন ভাবেনি একটা ভ্রূণ হত্যা নামী নার্সিং হোমে এত সহজে হয়ে যাবে। অপারেশন থিয়েটার থেকে টুনি দিদিমণি যখন বেড়ে এল তখন তার নরম চোখের কোল, আপেল রাঙা গাল তুবড়ে গিয়েছে এক ঘণ্টার রক্তঝরা যন্ত্রণায়। মাত্র তিন ঘণ্টার বিশ্রাম নিয়ে টুনি দিদিমণি অন ডিউটি নার্সকে সজল চোখে বলল, এবার আমি যেতে পারব।

সাদা পোষাকের মাঝ বয়সী নার্স টুনি দিদিমণির হাত ধরে নাড়ি দেখলেন, তারপর অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে থাকলেন, ব্লিডিং কি কমেছে? যদি খুব বেশি হয় এই মেডিসিন দুটো খেয়ে নেবেন।

ইরা শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে ভেঙে চুরে খান খান হল নিজের ভেতর। নার্সিং হোম থেকে রিকশায় করে ওরা যখন স্টেশনে এল তখন দুপুর সরে গিয়ে বিকেলকে পথ করে দিয়েছে। ইরার হাত ধরে খুব ধীরে ধীরে হাঁটছিল টুনি দিদিমণি, চোখে মুখে আষাঢ়ের মেঘ, ভ্রূণহত্যার অপরাধে সে বোবা হয়ে গেছে যেন। ইরা শুধোল, তাহলে মথুরাপুর অবধি টিকিট কাটি টুনিদি? ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল সে। বারবার চোখ দুটো ভরে যাচ্ছিল জলে। চোখ মুছতে মুছতে আঁচলটাই ভিজে গেল এক সময়। মথুরাপুরে আসতেই টুনি দিদিমণি বলল, আমি মনে হয় বেঁচে গেলাম! নিজেকে মেরে নিজেকে বাঁচান যে কত কষ্টের তুমি তা বুঝবে না বোন। তবে আমার মতো তোমার যেন কোনদিন এমন দুর্ঘটনা না ঘটে। কোনও দিনও বিয়ের আগে নিজেকে মলাটহীন করো না। তাহলে আমার মতো ঠকবে, কাঁদবে। আর কেউ আমার মতো কাঁদুক আমি তা চাই না।

দশ দিনে নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়েছে টুনি দিদিমণি। গর্ভ হারানোর যন্ত্রণা তবু মাঝে মাঝে তাকে কুরে খায়। অন্যমনস্ক কিংবা উদাস হয়ে গেলে ইরা তার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়ায়, মাথার চুলে বিলি কেটে দিয়ে বলে, টুনি দি, সব ঢেউ ঠিকানা খুঁজে পায় না। কিছু ঢেউ মাঝ সমুদ্রে হারিয়ে যায়। কিছু আবার দু কদম ছুটেই টুপ করে ডুবে যায়।

টুনি দিদিমণি ইরার কথার অর্থ বুঝতে পারল না। চোখ রগড়ে নিয়ে শূন্য আকাশের দিকে তাকাল, এখন আমার যা মনের অবস্থা, তুমি যদি কাছে না থাকতে আমি পাগল হয়ে যেতাম। তোমার এই ঋণ আমি যে কী করে শোধ করব জানি না। তবে এই আকাশটা যদি আমার হোত তাহলে আমি তোমাকে দিয়ে দিতাম। তবু আমার মনে হোত তোমাকে কিছুই দেওয়া হল না।

—আমাকে এসব কথা বলার কোনও অর্থ হয়? ইরার অভিমান সংগত। ফেরার দিন টুনি দিদিমণির চোখে আবার জল এল। মায়ের পায়ে হাত ছুঁইয়ে সে বলল, মা, তোমার টুনি অনেক বদলে গেছে। ও চাকরি করতে গিয়ে নিজেকে চাকরের চেয়েও অধম করে ফেলেছে।

ট্রেনে জানলার ধারে বসার সিট পেয়েছে ওরা। লালগোলা ট্রেনটা ছুটছিল বেগবান

আরবী ঘোড়ার মতো। কয়লার ইঞ্জিন থেকে ছিটকে যাচ্ছে আগুনের ফুলকি। ধোঁয়ার কালো সাদা ছেয়ে ফেলেছে আকাশ। টুনি দিদিমণি ভয় পেয়ে বলল, দেখো দেখো নীল আকাশ কেমন ছেয়ে যাচ্ছে কয়লার ধোঁয়ায়? আহারে, এও কী হয় প্রতিদিন প্রকৃতিতে। খোড়ে নদীর ব্রীজ পেরোতেই ঝমর ঝমর শব্দ হল লোহার বীজ্রে। ঘর্ষণের শব্দ টুনি দিদিমণিকে বারবার করে মনে করিয়ে দিল স্বেচ্ছাচারী রাতে বুকের পাঁজর ভেঙে যাওয়ার কথা। কয়লার টুকরো উড়ে এসে পড়ল তার চোখে। জল কেটে লাল হয়ে উঠল চোখ।

ইরা বলল, ডলো না। আপসেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—কয়লার গুঁড়ো কি সহজে বেরয়?

হাসপাতালের গেটের সামনে ভিড় জমেছিল অনেক। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। প্রায় দশ দিন পরে চেনা সীমানায় ঢুকে এসে বড় করে শ্বাস নিল ইরা। ভিড়ের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সে শুনতে পেল পাইলট মস্তান নাকি টাঙ্গির কোপে প্রাণ হারিয়েছে। ইরা আর একবার শ্বাস পুরে নিল বুকের খাঁচায়। পাইলট নামটা তার পক্ষে ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়, ঐ ছেলেটাই তাকে আখ খেতে নিয়ে গিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতে চেয়েছিল একথা সে মাধবী ছাড়া আর কারোর কাছে বলে নি অথচ তার প্রায় সময় মনে হত ওই অপমানের ভাষা বুঝি সবাই জেনে গেছে। নিজেকে তখন মাড়িয়ে যাওয়া ঘাসের চেয়েও দুর্বল মনে হোত তার। আজ এই মুহূর্তে ইরার মনে হল পাপের শেষ আছে পুণ্যের পৃথিবীতে। আকাশের চাঁদ সূর্য তারার মতো মানুষও অনেক শক্তি ধরে রাখে হাতের মুঠোয়। সময় বড় বলবান। সময়ের ধার কোনও দিনও ভোঁতা হয় না।

ভ্যান রিকশায় শোয়ানো ছিল পাইলটের রক্তাক্ত দেহ। ওর মা আছাড় পাছাড় দিয়ে উচ্চস্বরে কাঁদছিল। ছেলের মৃত দেহকে সে কিছুতেই ময়না তদন্ত করতে সদরে যেতে দেবে না। পুলিশ এসে সরিয়ে দিল শোককাতর মাকে। থানার ওসি অর্ডার দিলেন, সবাইকে সরে যেতে।

ভিড় পাতলা হতেই রিকশাব চাকা গড়াল সদরের দিকে।

## ।। এগার।।

মাঘের শীত বাঘের চামড়া ভেদ করে বুঝি গায়ে ঢুকে যায়। মোটা খদ্দরের চাদরা গায়ে জড়িয়ে গুরুপদ সূর্যের দিকে মুখ করে বসেছিল। বিল্টুর পরীক্ষা, সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছিল। পল্টু সাফ সাফ বলে দিয়েছে সে আর পড়াশুনা করবে না। পাল মশাইদের টালি কারখানায় সে এখন কাঁচা টালি রোদে দেয়, রঙ মাখায় তারপর শুকনো হয়ে গেলে গুনতি করে ভাটার কাছে রেখে আসে। শ' হিসাবে দরদাম পায় সে। প্রায় মাসখানি

কাজ করার পর সে একদিন গুরুপদকে বাজার করার জন্য কুড়ি টাকা দিয়েছিল। গুরুপদ নিতে চায় নি। কিন্তু কাননের জন্য তাকে নিতে হল। কানন বলেছিল, ছেলে তো চুরি করে নি, তুমি কেন ওর প্রথম কামাই নেব না। তুমি যদি না নাও তাহলে আমি নিয়ে নেব। তবে একটা কথা মনে রেখো ছেলেটাকে তুমিই অবহেলা করে খাবাপ রাস্তায় ঠেলে দিচ্ছো। আমার ছেলের যদি কোনও কিছু খারাপ হয় তাহলে আমিও তোমাকে ছেড়ে দেব না। শুধু পল্টু নয়, সব ছেলে-মেয়ের প্রতি কাননের অন্ধ ভালবাসা জড়িয়ে আছে। ওকে দেখে বোঝা যাবেনা ও অত জেদী, অভিমানী। নিজের অধিকারবোধ থেকে সে একচুলও সরবে না।

গুরুপদ বিড়ি ধরিয়ে পিঠটা সেঁকে নিতে চাইছিল শীতকালীন রোদে। এখন প্রায় রাতেই তার ঘুসঘুসে জ্বর হয়, মাথার এক পাশ টনটন করে যন্ত্রণায়। ইরা কাল রাতেও বাবার কপালে হাত রেখে চমকে উঠেছিল, ধীরে ধীরে তেতে ওঠা কপালটা যেন চুলায় চাপান ধান সেদ্ধ করার মোড়া কড়াই। খুব আশ্চর্য আর ভীত হয়ে ইরা শুধিয়েছিল, বাবা, কবে থেকে তোমার এমন হচ্ছে। ডাক্তার দেখাও নি কেন?

গুরুপদ আমলই দিল না কথায়, ও কিছু না, সেরে যাবে।

—টুনিদিকে আমি বলব। সে তোমাকে ওষুধ এনে দেবে।

—ওষুধে কি সব রোগ সারে? গুরুপদর চোখের কোণ ভিজে গিয়েছিল সহসা, ইরার হাতটা স্নেহবশে আলতো ভাবে ধরে সে কেমন আর্ত চোখে তাকাল, তোর জন্য আমার সব সময় চিন্তা হয়। কমলার বিয়ে হয়ে গেল অথচ তোর এখনও কিছু হল না।

—না হোক ও নিয়ে তুমি ভেবো না।

—ভাবব না। না ভেবে যে থাকতে পারি না। গুরুপদ বিছানায় বসে একটা বিড়ি ধরিয়েছিল, আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে বিড়িটা কেড়ে নিল ইরা, খবরদার আর তুমি বিড়ি খাবে না। ডাক্তারবাবু তোমাকে বিড়ি খেতে মানা করেছেন। তোমাকে যদি আবার বিড়ি খেতে দেখি তাহলে আমি ডাক্তারবাবুকে বলে দেব। বিড়িটা ফেলে দিয়ে ইরা তার বাবার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। গুরুপদ মুখ মুছে নিয়ে বলল, তোর যদি কিছু একটা হয়ে যেত তাহলে আমি শান্তিতে মরতে পারতাম। তোর মায়ের শরীরও ভাল নয়। এই শীতে ওর টানটা বেড়েছে। খুব সাবধানে রাখতে হবে ওকে। নাহলে আরও বেশি বাড়বে। আমি তো বুড়ো গোরু, নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। যা করার তোকেই করতে হবে সব।

চাদরটা ভালমতন গায়ে জড়িয়ে গুরুপদ আশেপাশে তাকাল। ইরা বা বিল্টু পল্টু কেউ নেই। বিড়ির ডিবাটা বের করে আনল শান্তিতে। তৃপ্তি করে একটা বিড়ি ধরিয়ে সে ধোঁয়া ছাড়ল ঘন ঘন। বিশ্বনাথ তখন মেল ওয়ার্ডের দিকে যাচ্ছিল। গুরুপদকে বসে থাকতে দেখে হাসি মুখে এগিয়ে এল সামনে, দাদা কী করছ ওখানে বসে?

গুরুপদ বিরক্ত হল বিড়ি টানায় ব্যাঘাত ঘটায়, এই বসে আছি। রোদ পোয়াচ্ছি। শীতের রোদ চামড়ার জন্য ভাল। বিশ্বনাথ আরও কাছাকাছি এসে দাঁড়াল, এখনও আঁচ ধরাওনি বুঝি? তা কখন রান্নাবান্না করবে।

গুরুপদর কোনও চিন্তা নেই, রোগী তো বেশি নেই। রান্না চাপালে চটজলদি হয়ে যাবে। তা তুমি কোথায় যাচ্ছো?

মেল ওয়ার্ডে একটা রুগী আছে। চরকুঠুরিয়ায় বাড়ি। ও খাসী হতে চায়।

তাহলে তো তোমার পোয়া বারো। গুরুপদ ঠাট্টার ছলে হাসল। বিশ্বনাথ একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে আগুন ধরাল, নীচু গলায় বলল, এখন আমার অবস্থা পড়তির দিকে। সেই ঘটনার পর থেকে আমি আর গ্রামে যাই না। রুগী বসার বেঞ্চিটা ঢুকিয়ে দিয়েছি ঘরের ভেতর। ওই বেঞ্চিটাতে বসে ছিল সুবল। ছিঃ ছিঃ, সেদিন যে কী হল আমার মাথা একটুও কাজ করল না। আমার ভুলে একটা সংসার ভেসে গেল।

—পুরনো কথা ভুলে যাও।

—ভুলতে পারিনা দাদা। সুবলের বউকে কাল হাটে দেখলাম। কী চেহারা হয়েছে বউটার। ওর দিকে তাকানোই যায় না।

গুরুপদ সান্ত্বনা দিল, সব কপালের লিখন। তুমি তো একটা উপলক্ষ মাত্র। ওরা যখন কথা বলছিল, টুনি দিদিমণি এল সামনে। সাদা পোষাকে ওকে শ্বেত শুভ্রা সরস্বতীর মতো মনে হল গুরুপদর। চোখ তুলে তাকাল সে, কিছু বলবে?

টুনি দিদিমণি বলল, আজকে রাতে আমার ওখানে খেয়ে নেবেন। বিকালে দাসপাড়া থেকে একটা মুরগি এনে দেবেন।

—আজ বুঝি কোনও অনুষ্ঠান আছে? শুধাল গুরুপদ।

টুনি দিদিমণি বলল, না-না তেমন কিছু নয়। অনেকদিন থেকে ভাবছিলাম আপনাকে একদিন ডেকে এনে খাওয়াব।

ঠিক আছে আমি খাব তবে আসর থেকে ফেরার পর।

টুনি দিদিমণি ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

বিশ্বনাথ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, টুনি দিদিমণি চলে যাওয়ার পর সে যেন চাঙ্গা হয়ে উঠল, চোখে মুখে রগড়ের প্রলেপ দিয়ে বলল, দাদা, তোমার ভাগ্য খুব ভাল। টুনি দিদিমণি তোমাকে খাওয়ার কথা বলে গেল। অথচ জান, এই হাসপাতালের অনেকেই বলে ওর মতন অহঙ্কারী নার্স আর দুটি নেই। আমারও এতদিন তাই মনে হোত। বিশ্বনাথ সুতোর কাছাকাছি আগুন এসে যাওয়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে রহস্যভরা চোখে তাকাল একটা কথা বলি দাদা, টুনি দিদিমণি তো তোমার মেয়ের মতো। ওর মতন মেয়ের উচিত হয় না বিমলবাবুর মতো চাবশ বিশ লোকের সঙ্গে সম্পর্ক বাখা। এই নিয়ে হাসপাতালের অনেকে অনেক কথা বলে। আমার কিছু কিছু কানে আসে, খারাপ লাগে শুনতে।

গুরুপদ কোনও উত্তর না দিয়ে উঠে গেল। দশটার আগে তাকে একবার কোয়ার্টারে যেতে হবে, বিল্টুর ফাইনাল পরীক্ষা আজ থেকে শুরু হবে। তিলের খাজা খাওয়ার জন্য ও আটআনা চেয়েছে। দশটা দশ পয়সা বিল্টুকে দিতে হবে। না দিতে পারলে তার খারাপ লাগবে। ছেলেটা এক প্রকার মুখচোরা। কোনও দিন তার কাছে কিছু মুখ ফুটিয়ে চায় না। যে চায় না তাকে দেওয়ার দায়িত্ব তো অপরের।

পল্টু আজ সকালে ঝগড়া করে চলে গেল। সাত সকালে ভিজে ভাত খেতে তার আপত্তি। কাননকে সে নিষ্ঠুর কথাগুলো বলে গেলে, তুমি নিজে হাঁপানির রোগী বলে আমাকেও রোগী বানাতে চাও? তোমার মতলব আমি বুঝে গিয়েছি। আমি আর ঘরের ভাত খাব না। এবার থেকে টালি কারখানার মজুরগুলোর সঙ্গে আমি রান্না করে খাব।

কাননও রুষ্ট হয়ে বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খা গে যা। এখন তোর চোখ ফুটেছে, উড়তে

শিখেছিস, এখন তো তুই পালাবি, এতো জানা কথা। তোর মতন ছেলের থাকার চাইতে না থাকাই ভাল। তোকে নিয়ে আমরা সবাই জ্বলে পুড়ে মরছি।

গুরুপদ কাননকে বাধা দেয় নি, ছোট ছেলেটার উপর তারও অভিমান কম নেই। সে যা বেতন পায় তাতে তো চলে যায় কোন মতে। মোটা ভাত কাপড়ের অভাব সে কোন দিন এদের বুঝতে দেয় নি। মাছ-মাংস না দিতে পারলেই কি পড়াশোনা করা ছেলেকে টালি কারখানার শ্রমিক হতে হবে? বাকি জীবনটা সে কি এইভাবেই কাটাবে? টালি কারখানার কাজ তো সারা বছর ধরে হয় না, বর্ষার ক'মাস বন্ধ থাকে। তাছাড়া টিন-অ্যাসবেসটাস্ এসে যাওয়ার পর টালির কদর কমেছে। এক নাম্বার টালিও গাদা দেওয়া থাকে বছরের পর বছর, শ্যাওলা লেগে সবুজ হয়ে যায়। ফলে টালি কারখানার এখন আর সেই রমরমা নেই। পল্টু এ কাজে কী যে সুখ পেল তা গুরুপদর অজ্ঞাত। ডাক্তারবাবু একদিন তাকে সতর্ক করে বললেন, গুরুপদ তুমি এতো ভাল মানুষ, অথচ তোমার ছোট ছেলেটা একেবারে অন্য ধরনের। আমি সেদিন বাজার থেকে ফিরছিলাম, হঠাৎ দেখি পল্টু কদমতলায় বিড়ি ফুঁকছে। আমাকে দেখেও ওর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ও কি টালি কারখানায় ঢুকেছে? এত অল্প বয়সে পড়াশুনা ছেড়ে দিল, বড় হয়ে কী করবে?

বড় হয়ে পল্টু যে কী করবে এই নিয়ে গুরুপদরও চিন্তার শেষ নেই। সে যে চোর হবে না ডাকাত হবে, না ভবঘুরে উদাসীন হবে এই নিয়ে যথেষ্ট সংশয় আছে ওদের। তবে চুরি-চামারীর দিকে পল্টুর ঝোঁক বেশি। সেদিনও তাদের সংসারের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেল। সেদিন বিশ্বনাথ তাদের মানসম্মান বাঁচাল। পল্টু টিকাদার বাবুদের ম্যানহোলের ঢাকনাটা চুরি করে বিক্রি করে দিল লোহালক্কড় কিনতে আসা ফেরিওলার কাছে। মাত্র পাঁচ টাকায় অত বড় কাস্ট আয়রণের গোল চাকতিটা সে বেচে ছিল। টিকাদারবাবু 'ফিল্ড' থেকে ফিরছিলেন তখন। ফেরিওলার ঝাঁকায় ম্যানহোলের ঢাকনাটা দেখে থামতে বললেন ওকে। জিনিসটা ভাল করে দেখে নিয়ে শুধোলেন, এটা তুমি কোথায় পেলে?

ফেরিওলা অপ্রস্তুত ঢোক গিলে বলল. ওই যে বকফুলওলা বাড়িটার ছেলে পাঁচটাকায় বেচে দিল। বলল, ওটা কোনও কাজে লাগে না ফালতু পড়ে আছে। কই আমার সাথে চল তো?

ফেরিওলা টিকাদারবাবুর লৌহ কঠিন ব্যক্তিত্বের কাছে হেরে যেতে বাধ্য হল। সাইকেলের মুখ ঘুরিয়ে সে আগে আগে চলল পল্টুদের বাড়ির দিকে। পল্টু তেল মাখছিল গামছা পরে। ইরা সবে স্নান সেরে এসেছে কলতলা থেকে। টিকাদারবাবুকে আসতে দেখে ইরা মাথার চুল থেকে ভেজা গামছা তুলে নিয়ে সাদরে ডাকল, আসুন।

ইরারা এতদিন হল এসেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনদিনও টিকাদারবাবুর পায়ের ধুলো পড়েনি তাদের ঘরে। লেখাপড়া জানেন বলে তিনি সব সময় দূরত্ব বজায় রাখতে ভালবাসেন। ইরা তাদের কোয়ার্টারে গেলেও কদাচিৎ কথা বলেন তিনি। ঘরে থাকলেও অফিসের খাতাপত্তর কী সব লিখতে থাকেন দিনরাত। নাহলে বাংলা খবরের কাগজটা চোখের সামনে ধরে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়তে থাকেন। টিকাদারবাবুকে দেখে পল্টুর মুখ শুকিয়ে আমচুর। সে পায়ে পায়ে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে বকফুলগাছটার পিছনে।

টিকাদারবাবু সাইকেল স্ট্যাণ্ড করলেন বেড়ার পাশে। মাথা থেকে শোলার টুপিটা

খুলে বাঁ হাতে নিলেন। তারপর ইরার দিকে অসন্তোষভরা চোখে তাকালেন, পল্টু কোথায়? ওকে ডাকো।

ইরার চোখ চলে গেল বকফুলগাছের পেছনে, পল্টু সেখানে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল ওর চেহারায় অপরাধীর আদল। ইরা হাতের ইশারায় পল্টুকে ডাকল সামনে। ভীতু পায়ে পল্টু এসে দাঁড়াল। ততক্ষণে টিকাদারবাবুকে গুরপদর উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিশ্বনাথ নিজের ঘরে না গিয়ে কী মনে করে ইরার পাশে এসে দাঁড়াল। অযাচিত ভাবে সে শুধোল, কী হয়েছে বাবু?

কী হয়নি বলো? বাঘের গলায় হুকরে উঠলেন টিকাদারবাবু, গুরুপদর ছেলেটা বড় হলে ডাকাত হবে দেখছি। এই বয়সে যদি পায়খানার ঢাকনা বিক্রি করে দেয় তাহলে এ ছেলে বড় হলে পুরো ঘরদোর বিক্রি করে দেবে। কথা শেষ করে টিকাদারবাবু ফেরিওলাকে বললেন, ভাল করে দেখ তো এই ছেলেটা কিনা।

ফেরিওলা এক পলক তাকাল তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ। শুকনো বারুদে আগুন লাগিয়ে দিলে যেমন হয় তার চেয়ে অধিকতর উত্তেজনায় ফেটে পড়লেন টিকাদারবাবু, একে আমি থানায় দেব। বিশ্বনাথ তুমি সাক্ষী থাকলে। মাত্র পাঁচটাকা দিয়ে ম্যানহোলের ঢাকনা বিক্রি করেছে গুরুপদর ছেলে। তারপর ফেরিওলার হাতটা ধরে টিকাদারবাবু মুচড়ে দিয়ে বললেন, তোমাকেও আমি থানায় নিয়ে যাব। যে চুরি করে আর যে চোরাইমাল কেনে দু-জনেই সমান অপরাধী।

ফেরিওলা সাইকেল ছেড়ে দিয়ে পা জড়িয়ে ধরল টিকাদারবাবুর, অনুনয় বিনয় করে সে বলল, আমার ভুল হয়ে গেছে বাবু। আমি আর কখনও হাসপাতাল চত্বরে ঢুকব না। আজ আমার শিক্ষা হয়ে গেল।

ফেরিওলাকে ছেড়ে দিয়ে টিকাদারবাবু পল্টুর হাত ধরে গেটের বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। পল্টুর পা দুটো ভয়ে মাটি কামড়ে ধরেছে যেন। ইরার মুখে কোনো কথা নেই। রান্নাঘর থেকে হায়-হায় করে শোকাতুর চিলের মত ছুটে এল কানন, তার এলোমেলো চুল আছাড় খেয়ে পড়েছে মুখের উপর, নাকের জল ফ্যাচ্ করে ভিতরে চালান করে দিয়ে বলল, ঐ কুলাঙ্গারকে আপনি মেরে ফেলুন বাবু। ওর জন্য আমাদের মানসম্মান বলতে আর কিছু থাকল না।

টিকাদারবাবু গলায় শুকনো লঙ্কার ঝাঁঝ পুরে বললেন, তোমাদের জন্য আজ ওর এই হাল হয়েছে। তোমরা লাই দিয়ে দিয়ে ওকে মাথায় তুলেছ। আজ ও রাহু থেকে রাবণ হয়ে গিয়েছে। রাবণ কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় আমার জানা আছে। এই চল। টিকাদারবাবুর শক্ত পেশীবহুল হাতের টানে বেড়ার উপর মুখ থুবড়ে পড়ল পল্টু।

বিশ্বনাথ টিকাদারবাবুর চণ্ডাল রাগের কথা জানত। তার স্পষ্টবাদিতার জন্য তিনি অনেকের কাছে সমালোচিত। এই হাসপাতালের অনেকেই তার মুখের উপর কথা বলতে ভয় পায়। তিনি ডাক্তার থেকে সুইপার কারোর দোষ দেখলে ছেড়ে কথা বলেন না। বিশ্বনাথ বেগতিক দেখে এগিয়ে গেল পল্টুর কাছে, কৃত্রিম রাগে ফেটে পড়ে সে চার ঘা মারল পল্টুকে। তারপর কান ধরে হিড়হিড়িয়ে টেনে আনল বাবুর কাছে, বাবুর পা ধরে ক্ষমা চা। কান ধরে উঠ-বুস কর পঞ্চাশ বার। তুই যা দোষ করেছিস তোকে কেটে ফেললেও বাবুর রাগ পড়বে না।

পল্টু চালাক ছেলে। বিশ্বনাথের চোখের ইশারায় সে ছুটে গিয়ে পা চেপে ধরল টিকাদারবাবুর। কান ধরে উঠ-বোস করতে যাচ্ছিল তখন টিকাদারবাবুর দয়া সহসা উথলে উঠল, পল্টুকে ধমক দিয়ে বললেন, আজ বিশ্বনাথ যদি এখানে না এসে পড়ত তাহলে তোকে আমি শ্রী-ঘরের ভাত খাইয়ে ছাড়তাম। থানার দারোগাবাবু আমার বন্ধু হয়। আমি বললে সে তোর ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নুন ঘষে দিত। বিশ্বনাথের কৃত্রিম রাগের তখনও অবসান হয় নি, সে মাথা গরম করে বলল, যা, ভুল যখন করে ফেলেছিস তখন আর কী করা যাবে! তবে এমন ভুল যাতে আর না হয় সেই চেষ্টা করিস। বাবুর দয়ার শরীর বলে আজ তুই বেঁচে গেলি। বাবুর জায়গায় আজ যদি অন্য কেউ থাকত তাহলে তোর যে কী হাল হোত তা একমাত্র ভগবানই জানে। বিশ্বনাথ টিকাদাববাবুর সামনে ঠাস করে আর একটা চড় মারতেই পল্টু ঝুপ করে বসে পড়ল তার পায়ের কাছে, চুলের মুঠি ধরে বিশ্বনাথ তাকে উঠাল, বসে পড়লে চলবে? যা ঢাকনাটা বাবুর ঘর অবধি পৌঁছে দিয়ে আয়। তারপর চান করে খেয়ে দেয়ে ঘুমো। আর যেন তোকে এদিক-সেদিক ঘুরতে না দেখি।

টিকাদারবাবু লাল চোখ মেলে দাঁড়িয়েছিলেন, তার রাগ তখনও জল হয়নি পুরোপুরি, বিশ্বনাথ বাবুর সামনে দাঁড়াল অনুগত শরীর নিয়ে, তারপর হাত কচলে বললেন, বাবু, বেলা অনেক হলো, এবার ঘরে যান। খেয়ে-দেয়ে আরাম করুন। ঢাকনাটা পল্টুকে দিয়ে আমি পৌঁছে দেব। আপনার কোনও চিন্তা নেই। ছেলেমানুষ একটা ভুল করে ফেলেছে। ওকে আপনি মাফ করে দিন।

আর যেন কোনদিন ওর নামে নালিশ না শুনি। আজ শুধু তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে ওকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। সাইকেল গড়াতে গড়াতে টিকাদারবাবু তার ঘরের দিকে চলে গেলেন, হাতের টুপিটা তিনি ঠিক মাথায় পরে নিয়েছেন অভ্যাস মতো।

দুপুরে গুরুপদ ফিরল দেরী করে। দেরী করে ফিরলে সে আর সময় ব্যয় না করে কাপড়চোপড় বদলে বালতি নিয়ে চলে যায় কলতলায়। ইরা তক্কে তক্কে থাকে, বাবা কলতলায় গেলে সেও যায় পেছন পেছন। গুরুপদকে সে আর কিছুতেই কল পাম্প করতে দেয় না। গুরপদও নাছোড়বান্দা। হাসতে হাসতে বলল, তুই দেখছি আমাকে একেবারে বুড়ো বানিয়ে ছাড়বি।

তা নয়। তোমার শরীর খারাপ। ইরা বলল, ডাক্তারবাবু তোমাকে কল টিপতে মানা করেছে। বুকে চাপ লাগলে ব্যথাটা বেড়ে যেতে পারে।

আমার ও ব্যথা অন্য ব্যথা। শীতকালে আমার অমন ব্যথা হয়।

—কই আগের বছর তো হয় নি? ইরা চোখ তুলে তাকাল।

—হয়েছিল। তোর মনে নেই।

ইরা চুপ করে থাকল। বালতিতে জল ভরে সে তার বাবাকে বলল, ভাল করে স্নান করো। আমি আরও জল ভরে দিচ্ছি। কল টিপতে আমার ভাল লাগে। গুরুপদ গায়ে পিঠে জল ঢেলে হঠাৎ করে বলল, তুই চলে গেলে কে আমাকে এত সেবা যত্ন করবে বল তো।

—আমি কোথায় যাব? উদাস হয়ে গেল ইরা।

গুরুপদ মলিন হাসল, মেয়েরা কি চিরদিন বাবার ঘরে থাকে রে? বাবাগুলো বড়

স্বার্থপর হয়। মেয়েদের না তাড়ানো পর্যন্ত ওদের বুকের ভার হালকা হয় না।

ইরা ঠোঁট কামড়ে ধরে লম্বা খেজুর গাছটার দিকে তাকাল। একটা কাঠঠোকরা পাখি শুকনো কাঠে ঠোকর মেরে মজা নিচ্ছিল। ইরার নিজেকে হঠাৎ কাঠঠোকরা পাখিটার মতো মনে হল। বাবা তো গাছের ছায়া। চোখটা করকরিয়ে উঠতেই ইরা কল পাম্প করা থামিয়ে আনমনে সবুজ মাঠটার দিকে তাকাল। চমকে উঠল সে। একটার বাসে মঙ্গল নেমেছে। হাতে এ্যাটাচি, কাঁধে ব্যাগ। পায়ে চকচকে জুতো। শ্যাম্পু করা চুল উড়ছে হাওয়ায়। মঙ্গল হেঁটে আসছিল মাঠ দিয়ে। মাথা উঁচু করে হাঁটা নয়, কিছুটা মাথা গুঁজে হাঁটছিল সে। ইরা ভাল করে দেখল, শুধু দেখতেই থাকল। কিছু পরে সে আর একবার জোর ধাক্কা খেল। কলের হ্যাণ্ডেলটা আর একটু হলে তার থুঁতনিটা থেঁতলে দিত। মঙ্গলের পাশাপাশি হাঁটছে, ও কে? বেশ সুন্দর ছিমছাম চেহারা। ফর্সা গায়ের রঙ রোদে ঝিলিক মেরে উঠল। লাল শাড়ির আঁচল উড়ছিল বিশ্বজয়ীর পতাকার মতো? তবে কি এই সেই সুন্দরী মহিলা যে মঙ্গলের মন জুড়ে বসে আছে। তা কী করে হয়? ইরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মঙ্গলের পাশ ঘেঁষে হেঁটে গেল বউটা। ওরা নিজেদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মতো কথা বলছিল। নতুন সিঁদুরের দাগে বউটার কপাল আরও চওড়া দেখাল ইরার চোখে।

গুরুপদ বলল, কী রে আর একটু কল টিপে দে, বালতিতে জল যে একেবারেই নেই।

ইরা জোরে জোরে কল টিপতে লাগল, তার চোখ থেকে তবু মুছে গেল না সিঁদুরের রেশ। চোখের জলে চোখ ভিজে গেলে শুধু সিঁদুর কেন অনেক কিছুই ঝাপসা দেখায়।

বিকেলের রোদ পড়ে গেলে ক্লান্ত ছায়া উঠোন জুড়ে শুয়ে থাকে। নরম শান্ত শিষ্ট পৃথিবীতে মন খারাপের জীবানুগুলো শীতার্ত পরিমণ্ডলে ঘোরাঘুরি করে। ইরাও সাময়িক ব্যস্ততা ভুলে নিজের ভিতরে হারিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তার নিস্তরঙ্গ জীবনে বৈচিত্র্যের বড় অভাব। টুনি দিদিমণির সঙ্গে দেখা হলে সে তাকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করে। কথার মোহময় যাদুকাজলে তার দু-চোখে এঁকে দিতে চায় স্ফূর্তির স্বর্ণরেখা। বিকেলে টুনি দিদিমণির ডিউটি না থাকলে ইরাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালের মাঠে গিয়ে বসে। কত রকমের গল্পগুজব হয় সেখানে।

আজও টুনি দিদিমণি সেজেগুজে তার ঘর অবধি এল, তাকে দেখে গায়ে চাদরটা জড়িয়ে বাইরে এল ইরা। টুনি দিদিমণি বলল, আজ আর মাঠে বসব না। শীত পড়েছে চল একটু ঘোরাঘুরি করি।

— কোথায় যাবে?

—বাঁধের ধারে গেলে কেমন হয়? অনেক দিন ওদিকে আমরা যাই নি। ইরা রাজি হয়ে গেল।

ভাঙা পাচিলের ধার দিয়ে ওরা নরম স্নিগ্ধ আলোয় পাড়ার মধ্যে ঢুকে গেল। ইরার নাকে ঢুকে গেল তীব্র সুগন্ধ। গন্ধটা ভাল করে পরখ করে ইরা বলল, তুমি আজ সেন্ট মেখেছ, কী ব্যাপার।

হাসল টুনি দিদিমণি, পরক্ষণে বিষাদে ভরে গেল মনটা, আজকের দিনে বিমলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। প্রথম দর্শনে ওকে মনে হয়েছিল রাজপুত্র। সত্যি বলছি ওর আকর্ষণীয় কথাবার্তা আমাকে ওর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। মনে মনে ওর মতন একজন

।পুরুষকে আশা করেছিলাম।

টুনি দিদিমণি স্মৃতির পুকুরে ডুবে যেতে চাইল, ইরা তাকে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করিয়ে শুধোল, তাতে সেন্ট মাখার কী হল?

—সেন্ট মেখেছি সেই দিনটাকে ভুলে যাবার জন্য। কিন্তু ভুলতে পারছি কই?

— ক্ষত দাগ সহজে ওঠে না মন থেকে। শুধু নদীতে নয় পলি মনেও পড়ে।

— তুমি ঠিক বলেছ। মনটা যদি নদীর চর হোত তাহলে মানুষের এত দুঃখ পাওয়া থাকত না।

মানুষের মন কখনও উঠোন কখনও নদীর চর।

টুনি দিদিমণি বাঁধে উঠে এসে নীচের দিকে তাকাল। পঁচিশ ফুট কিংবা তারও নীচে টলটল করছে বুড়ি গাঙের পরিত্যক্ত জল। পাল পাড়ার লোকেরা মাটি কেটে নিয়েছে ব্যবসার জন্য, ছোট বড় গর্তগুলো জলে মুখ ঢেকেছে। ওগুলো পুকুরের মত দেখায়। বিস্তীর্ণ চরে কোথাও বালির চিহ্ন নেই। চর এখন চাষের জমি। জমিতে আখের চাষ। নতুন মাটিতে মুসুরী ছোলা আর সর্ষের বাড়াবাড়ি রকমের স্বাস্থ্য প্রদর্শনী। ফুল এলে আখগাছের আয়ু ফুল আসা বাঁশের মতো কমে যায়। কোথাও আখ কাটা শেষ। মাঠে পড়ে আছে শুকনো খসখসে পাতা। কেউ এসে আগুন ধরিয়ে দেবে পাতাগুলোয়। ছাই পড়ে থাকবে দোঁআশ মাটিতে। হাওয়ায় উড়বে ছাই। বুনো বাবলার ডালে বসে শিস দেবে দোয়েল শ্যামা। মাঠে ঘুঘু বুক ফুলিয়ে ডাকবে। রোদ এসে ছিটিয়ে দেবে রঙ। ইরার চোখে পুরো বাঁধধার মনে হয় সাজান ছবি। টুনি দিদিমণি তাকে আদরের চিমটি কেটে বলল, ফাঁকা মাঠ দেখতে ভাল লাগে না। যে মাটিতে চাষ হয় না তার কোনও দাম নেই। ইরা হাঁ করে তাকাল হঠাৎ এ কথার বলার অর্থ।

---আমি কথাটা তোমাকে বলেছি। নিজেকে গুছিয়ে নাও। পূর্ণতা কারোর একদিনে আসে না। পূর্ণতার জন্য মানুষকে পরীক্ষা দিতে হয়। তুমি সেই পরীক্ষায় ফেল করেছ। আমিও ব্যর্থ হয়েছি। ইরা চোখের তারায় অস্বস্তি অনুভব হল, দূরের মাঠ থেকে চোখ ফিরিয়ে সে টুনি দিদিমণির দিকে তাকাল, আমি আর পিছন ফিরে তাকাতে চাই না।

—আমিও তোমাকে তাকাতে বলছি না। তবে জয়দেবকে কষ্ট দেওয়া তোমার উচিত নয়।

ইরা বিদ্যুৎ স্পর্শে শিহরিত হল বুঝি, এতদিন এই নামটা তার রক্তে যে ঘোরাঘুরি করে নি তা নয়। সে আশা করেছিল জয়দেব আসবে। তার সামনে দাঁড়াবে মাথা উঁচু করে। দিন চলে গেল তবু সে আসে নি। জোয়ারের পর ভাটার পালা। শ্মশানে পড়ে থাকে ছাই পোড়াকাঠ। নদীতে ভেসে যায় ঠাকুরের ফুল। ফুল জানে গন্তব্য। মানুষও তো জানে না কোথায় গিয়ে ঠেকবে জীবনের নৌকা। জয়দেব নৌকা ভিড়াতে চেয়েছিল। ইরা নোঙর করতে দেয় নি। আফশোষ তো তারই হবার কথা। যে নৌকো ভেসে গেছে ঢেউয়ের মাথায় তাকে কোন মন্ত্রবলে ফেরাবে সে? অসম্ভব। ইরা অনেকদিন পরে নুয়ে পড়ল নিজের অক্ষমতায়।

টুনি দিদিমণি বলল, ঐ দেখ সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে। ওটা আবার কাল পুবে উদয় হবে। আমাদের জীবন কেন ওই ধর্ম থেকে সরে দাঁড়াবে। তুমি যা করেছ সেটা তোমার গর্হিত অন্যায় নয়। ভুল সবারই হয়। তবে ভুল শুধরে নিলে তা জীবনকে সুন্দর পরিচ্ছন্ন করে।

— হাতের তীর যে ফেরে না টুনিদি!

—ফেরে না, মানছি। তবে তীরের কাছে যদি হাতের মালিক ছুটে যায়?

এভাবে তো কোনোদিন ভাবে নি। ইরার সমর্পিত গলা, তুমি আমাকে কী কর
বলছ?

টুনি দিদিমণি জোর গলায় বলল, আমি তোমাকে হারিয়ে যেতে বলছি না। তুমি আবা
ফোটা ফুলের মতো সুগন্ধ বিতরণ করো এটা চাইছি। তোমার ভালবাসা আজ তা
ভালবাসাকে ঘরে তুলেছে। আমি কার কথা বলছি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ?

ইরা চুপ করে থাকল। টুনি দিদিমণি তাতিয়ে দেবার জন্য বলল, মঙ্গল যদি তোমা
দুঃখ দিতে পারে তাহলে তুমি তাকে কেন দুঃখ দেবে না। সে অধিকার তোমার আছে
তুমি কেন সব শোক তাপ নিজের গায়ে মেখে নেবে? যদি এমন করো তাহলে সে
তোমার পরাজয়।

অস্তমিত সূর্যকে ফেলে রেখে ওরা ফিরে এল। ঘরে ফেরা পাখির ডানার কাঁপন ইরা
শরীরকে ফুলে ওঠা ঢেউয়ের মতো মাতিয়ে তুলেছে। ওর চোখে মঙ্গলের জন্য এক ফো
সহানুভূতি নেই। সে যদি অন্যভাবে বাঁচতে পারে তাহলে ইরাই বা কেন পারবে না

গুরুপদ ইরার অপেক্ষায় ঘর-বার করছিল। খবরটা শোনার পর থেকে তার মনে
অবস্থা ঠিক নেই। কানাই হাসপাতাল থেকে সরাসরি চলে এসেছে। তার বিশ্বাস এখা
খবর দিলে জয়দেবের সেবা যত্নের কোনও অভাব হবে না। গুরুপদ কানাইয়ের উপ
ঝুঁকে পড়ে শুধোল, কী ভাবে এমন অঘটন ঘটে গেল? এখন কেমন আছে জয়দে

কানাইয়ের হাত পা নয় সর্বশরীর ঝিনঝিন করছিল, ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে চুমু
দিয়ে সে বলল, টেম্পুটা উল্টে যাবে আমি ঘুণাক্ষরে টের পাইনি। রানিং লরিকে সাই
দিতে গিয়ে জয়দেবদা গাড়িটাকে আর বাগে আনতে পারল না। ব্রেক কাজ করল ন
রাস্তার পাশের খাদে উল্টে গেল। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। গ্রামের লোকে
আমাদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে গিয়ে আমার জ্ঞান ফেরে। আমার চো
সামান্য। ডেটল লাগিয়ে ছেড়ে দিল ডাক্তার। কিন্তু ওস্তাদের অবস্থা ভাল নয়। মাথা ফে
অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে। তেরচা সেলাই পড়েছে।

সন্ধ্যার বাসে কানাই নেমেই ছুটে এসেছে গুরুপদর কাছে। তার বিশ্বাস গুরুপদ একব
হাসপাতালে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে জয়দেবের। গুরুপদ যে ভগবান নয় এটা
ভাল ভাবে জানে। তবু মানুষের হাতের ছোঁয়ায় অনেক বিছানায় শোওয়া মানুষ চা
হয়ে ওঠে। জয়দেবের জ্ঞান ফেরার পর সে কাকে যেন খুঁজছিল। সে যে কাকে খুঁজছি
কানাইয়ের তা অজানা নয়। কিন্তু সে জানে, ইরা জয়দেবের কাছে যাবে না। তার ম
জয়দেবের কোনও জায়গা নেই। সে এসে গুরুপদর সাহায্য প্রার্থনা করেছে। সব শু
কানন চোখ মুছে বলেছে, তুমি কোন চিন্তা করো না। ও যাবে। সে আমাদের বিপদে
দিনে পাশে ছিল তার বিপদ শুনে আমরা না গেলে যে অধর্ম হবে।

— তাহলে কাল ভোরের বাসে আমরা রওনা দেব।

— হ্যাঁ হ্যাঁ তাই হবে। কানন ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

ইরা যখন এল তখনও ঘরে আলো জ্বালে নি কানন। গুরুপদ গালে হাত দিয়ে খা
উপর বসেছিল। কানাইকে দেখে ইরা একটু অবাক হল। ওর ঠোঁটের কোন থেকে গড়ি

পড়ল হাসি। কানাই চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল মেঝেতে, আমি আবার এসে গেলাম। না এসে আমার উপায় ছিল না। কানাই থামল। গলা খেঁকারি দিল, ওস্তাদের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে।

ইরার গলা থেকে ছিটকে এল, অ্যাকসিডেন্ট, কী বলছ কানাইদা? আমার যে বিশ্বাসই হচ্ছে না।

— হ্যাঁ, আমি যা বলছি তাতে এক ফোটাও খাদ নেই। ওস্তাদের জ্ঞান ফিরেছে। সে তোমাদের দেখতে চাচ্ছে। তাই আমাকে ছুটে আসতে হল। এবার যাওয়া না যাওয়া সব তোমাদের উপর নির্ভর করছে। কানাই যেন কথাগুলো বলে নিশ্চিন্ত হল। ইরা দ্বিধা দ্বন্দ্বের ফাঁদের মধ্যে আটকে গেল।

গুরুপদ সবার বাধা অগ্রাহ্য করে বিড়ি ধরাল, ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কেউ না যাক, আমি যাব। জয়দেব আমার ছেলের মতো। ও যা করেছে নিজের ছেলে তা করে না।

কানন বললে, বিল্টুর পরীক্ষা না হলে আমিও তোমার সঙ্গে যেতাম।

গুরুপদ ইরার মুখ থেকে কিছু শুনবার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। ইরা কোন কথা না বলে উঠে গেল ওদের সম্মুখ থেকে। রাতভর সে নিজেই নিজের বিরুদ্ধে লড়াই করল। টুনি দিদিমণির ঘরে শুতে গেল না সে রাতে। কানন জোর করতেই বিরক্তি প্রকাশ পেল ওর কথায়, আজ আমার শরীর খারাপ। আজ আমি কোথাও যাব না।

ভোর রাতে ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি হয়ে নিল গুরুপদ। তুষের চাদরটা গায়ে জড়িয়ে সে যখন বাইরে এল তখনও আলো ফোটেনি, তরল আঁধারে ভরে ছিল চারপাশ। কানাই আর গুরুপদ পাশাপাশি হাঁটছিল। কারোর মুখে কোন কথা নেই। ইরা এল না বলেই ওদের মনে সুখ নেই।

গেটের কাছে এসে গুরুপদ শুনতে পেল ইরার ডাক, বাবা দাঁড়াও। আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

পেছন ফিরে তাকাল গুরুপদ। সকালের প্রথম আলোর মত ছুটে আসছে ইরা। চোখে মুখে কোন জড়তা নেই, তরতাজা বকফুলের মতো। মেয়েকে কাছে পেয়ে বুকের ভার সরে গিয়ে মুখে হাসি ফুটল গুরুপদর। সকালের স্নিগ্ধ আলো ছুঁয়ে দিল তাকে।

## ।। বার।।

কপাল ফেটে বুঝি ভাগ্য ফিরল জয়দেবের, টেম্পু ছেড়ে সে এখন ট্রাকের ড্রাইভার। মালিক সত্যানন্দবাবু অনুকূল ঠাকুরের ভক্ত। দেব-দ্বিজে তার মতিগতি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বাড়ছিল। তিনি একদিন জয়দেবকে ডেকে পুত্রস্নেহে বললেন, তুমি আমার

কোম্পানীর জন্য অনেক করেছ। তোমার সততার কোনও তুলনা হয় না। এ মাসের পনের তারিখের মধ্যে আমার একটা লরি রোডে নামবে। পুজোপাঠ শেষ হলে আমি সেই নতুন গাড়ির চাবি তোমার হাতে তুলে দেব। তিন চাকা থেকে চার চাকায় উঠলে বলে তোমার মাইনেও বাড়বে। এবার তুমি ভাল দেখে একটা মেয়ে দেখে সংসারী হও।

জয়দেব এত বড় সুখবর আশা করেনি। সত্যানন্দবাবুর আশ্রয় যদি সে না পেত তাহলে তার যে কী গতি হোত তা সে নিজেও জানে না। বাবুর ছায়ায় বেশ কটা বছর তার কেটে গেল। প্রতি বছর পুজোর সময় বাবু তাকে প্যান্ট জামা দেয়, পুজোর বোনাস বাবদ থোক টাকা ধরিয়ে দেয়। এখনও অবধি বাবুর কোনও কথা জয়দেব অমান্য করেনি, ঝড় জল, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও সে ভাড়া নিয়ে গেছে বাবুর নির্দেশে। যার নুন খাওয়া তার গুণ না গাইলে অধর্ম হবে। বাবুর সামনে এখনও মাথা তুলে কথা বলতে পারে না জয়দেব, চোখের মধ্যে সারা শরীর জুড়ে অদ্ভুত শ্রদ্ধামিশ্রিত আলোড়ন শুরু হয়, আপসেই মাথা নুয়ে আসে তখন। মাত্র ক' বছরের ড্রাইভারী অভিজ্ঞতায় টেম্পু ছেড়ে ট্রাকে ওঠা সবার ভাগ্যে হয় না। জয়দেব বাবুর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা বজায় রেখে বলল, ট্রাক চালাব এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। আপনার দয়ায় আমার সব স্বপ্ন পূরণ হল যখন তখন আর একটা দাবী আমার মিটিয়ে দিন। জয়দেব অনুগত ভঙ্গিতে মাথা চুলকে বলল, কানাই শুধু টেম্পুর খালাসী নয়, সে আমার বন্ধু। এ লাইনে ওর সঙ্গে বোঝাপড়া আমার দীর্ঘদিনের। বাবু, আমি আর কিছু চাই না, শুধু কানাইকে আমার সঙ্গে দিয়ে দিন। ও আমার আপদে বিপদে পাশে থাকবে। তাছাড়া ও গাড়ির কাজটা ভাল জানে। ছোটখাটো মিস্ত্রির কাজ ও একাই করে দিতে পারবে।

—ঠিক আছে তোমার অনুরোধ আমি রাখলাম। এবার তুমি আমার অনুরোধ একটা রেখো। শুনেছি ভাড়াবাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হয় তোমার। যে মেয়েটা হাসপাতালে তোমাকে দেখতে আসত তাকে আমার খুব পছন্দ। তোমার যদি পছন্দ থাকে তাহলে বলো আমি গিয়ে ওর বাবার সঙ্গে কথা বলি।

জয়দেব চুপ করে থাকলেও কানাই চুপ করে থাকার ছেলে নয়। সে ঝাঁপিয়ে পড়ল কথার মাঝখানে, বাবু, মেয়েটাকে আমাদের পছন্দ। ওর বাবা-মাও চায় ওস্তাদের সঙ্গে বিয়ে হোক। কিন্তু মেয়েটা রাজি নয়।

—কেন ওর কী অসুবিধা?

—আমি যতদূর জানি কোনও অসুবিধা নেই। তবু যেন কেন অমন বেঁকে বসেছে, আমরা কেউ কিছু বুঝতে পারছি না। কানাই ভক্তি গদগদ চোখে তাকাল, যদি কিছু আপনি মনে না করেন তাহলে একটা প্রস্তাব দিই। আপনি যদি ওস্তাদের হয়ে মেয়েটার সঙ্গে কথা বলেন তাহলে বিশেষ ভাল হোত। আপনার কথা সে ফেলতে পারত না। দু-হাত এক হয়ে ঝামেলা মিটে যেত।

—ওদের বাড়ি তো সেই কালীগঞ্জে, তাই না? সত্যানন্দবাবু কিছু করার জন্য তৎপর হলেন, বলো, আমাকে কবে যেতে হবে। জয়দেবের জন্য মেয়ে দেখতে যাব—এ তো আমার কাছে খুশির খবর। তাছাড়া ওর তো এ দেশে তেমন কেউ নেই যে পাশে দাঁড়াবে। কানাই খুশি হল, আপনার যাওয়ার দরকার নেই। মেয়েটা দিন সাতেকের মধ্যে এখানে আসবে। তখন আমি ওকে আপনার কাছে নিয়ে আসব।

—তাহলে তো সোনায় সোহাগা হয়। কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেলে ঐ দিনই আমি আশীর্বাদটা সেরে ফেলব। সত্যানন্দবাবু জয়দেবের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে হাসলেন।

ইরা যখন তার পুরনো জায়গায় বেড়াতে এল কাননের সঙ্গে তখনই কানাই গিয়ে কাননকে সব বুঝিয়ে বলল। সব শোনার পরেও কথাগুলো বিশ্বাস হচ্ছিল না কাননের। অত বড় মাপের মানুষ তার মেয়েব সঙ্গে কথা বলবে এর চেয়ে ভাল সংবাদ আর কী হতে পারে। কানন ইচ্ছা করেই ইরাকে কোনও কিছু বলল না। নির্দিষ্ট দিনে টেম্পু নিয়ে এল জয়দেব। কানাই তার পাশে। ইরাকে বলল, উঠে এসো। আজ তোমার ভাগ্য পরীক্ষা।

বাধ্য মেয়ের মতো টেম্পুতে উঠে এসে জয়দেবের পাশে বসল ইরা। নিজেকে মেলে ধরতে পারল না, গুছিয়ে রাখল নিজের ভেতর।

তিনতলা বাড়ির সামনে যখন টেম্পুটা থামাল জয়দেব তখনও ইরা জানে না সে কোথায় যাচ্ছে। চোখে-মুখে বিস্ময় নিয়ে সে জয়দেবের দিকে তাকাল, জয়দেবকে যেন বোবায় ধরেছে, মুখে কথা নেই তার, সে কেমন জব্দ করার চোখে তাকাল। ইরার সংশয় হটিয়ে দিল কানাই, এটা আমাদের মালিকের বাড়ি। মালিক তোমাকে দেখতে চেয়েছে। তাই নিয়ে এলাম।

কানাই সাফ কথার মানুষ, তোমাকে আমাদের মালিক দেখতে চায়। বুড়ো মানুষটার কথা তো আমরা ফেলতে পারি না।

সত্যানন্দবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে ইরার প্রতিবাদ করার স্পৃহা অস্তমিত সূর্যের মতো ঢলে পড়ল। বয়স্ক ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানতে বাধ্য হল তার শোভন সুন্দর মনোভাব। কানন স্বপ্নাচ্ছন্ন স্বরে বলল, ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্য। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ এই তিনটে বিষয় নিয়ে কারোর কোনও ভবিষ্যৎ বাণী খাটে না। আমরাও মনে মনে চেয়েছিলাম জয়দেব আমাদের সংসারের একজন হোক। ভগবান আমার প্রার্থনা শুনেছে।

সত্যানন্দবাবু বহুদর্শী, ইরাকে তার মনে ধরেছে, এক মুখ পরিচ্ছন্ন হাসিতে ঠোঁট ভরিয়ে বললেন, জয়দেবকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি। ওব ব্যবহাব আব সততা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ যুগে সবাই যখন অবনতির দিকে পা বাড়িয়েছে তখন জয়দেব নিজেকে সামলে রেখেছে। ড্রাইভারী লাইনে উচ্ছন্নে যাবার রাস্তা খুব সোজা। একটু এদিক ওদিক হলেই যে কোন সময় তলিয়ে যেতে পারে। জয়দেব তলিয়ে যায় নি, ও পায়ের তলার মাটিকে আরও মজবুত করেছে।

কানন আবেগ-আপ্লুত স্বরে বলল, আপনি যা ভাল বুঝুন, করুন। আমি আমার মত জানিয়ে গেলাম।

ঐ দিনই ইরাকে সোনার আংটি দিয়ে আশীর্বাদ কবলেন সত্যানন্দবাবু। ইরা তাঁর পা স্পর্শ করে একটি শব্দও বলতে পারল না, তার বারবার করে মনে পড়ছিল বিগত দিনের কথাগুলো। নিজের কথাগুলো তাকে আহত করে। অপরাধী করে তোলে।

সত্যানন্দবাবু তার মনের মেঘ উড়িয়ে দিলেন, আজ থেকে জয়দেব তোমার, ওর দায়দায়িত্ব সব তোমার উপর সঁপে দিলাম। আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা কবি তোমরা সুখে শান্তিতে নিজেদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাও। কোনও অসুবিধা হলে আমার কাছে এস। আমাকে তোমাদের একজন ভেবো।

সংসারের নদীতে একই নৌকায় চেপে বসেছে ইরা। বিয়ের পরে ওদের জীবন

সুগন্ধিময় ফুলের নির্যাস' ভাড়া ঘরে ইরা তার সংসার সাজিয়েছে নিজের হাতে। গুরুপদ নিজে না আসলেও পল্টু আর বিল্টুকে পাঠিয়েছিল ইরার সংসার গুছিয়ে দেবার জন্য। ওরা দিন পাঁচেক থেকে চলে গেল। ইরার মন খারাপ। তবু কিছু করার নেই। ছোট ঘরে ভাই দুটোকে কতদিন আর আটকে রাখবে। জয়দেব কিছুটা অসন্তুষ্ট। একদিন তো মুখের উপর বলে দিল, আর ভাল লাগছে না আমার। তোমাকে একটু একলা পাই না।

মুখ টিপে টিপে হাসছিল ইরা, চোখে-মুখে দুষ্টুমীর ছায়া, সবুর কর, ধৈর্য ধরো। এত তাড়াহুড়োর কী আছে?

ইরা কি মনে মনে হাঁপিয়ে ওঠে নি একটুও? বুকে হাত দিয়ে ইরার একথা বলার সৎসাহস নেই। বিল্টু পল্টু যেদিন এল সেদিন থেকেই জয়দেবের মন খারাপ। ইরাকে ইশারায় ইঙ্গিতে কথা শোনাতে ছাড়ল না। ইরা মুখ বুজে সহ্য করল। একদিন একা পেয়ে বলে দিল, কষ্ট তোমার একার নয়, আমারও। তবু এই কষ্ট হজম করার মধ্যে এক ধরনের তৃপ্তি আছে।

—তোমার যে কিসে তৃপ্তি আমি বুঝি না!

জয়দেবের কথা গায়ে মাখল না ইরা।

যে বাড়িতে ভাড়া থাকে ওরা, সেখানে রোদ হাওয়া খেলে বেড়ায় মনের আনন্দে। শুধু জল তুলতে গেলে ইরা হাঁপিয়ে ওঠে। সরকারী কল থেকে এতদিন জল আনা যার অভ্যাস ছিল এখন কুয়োর দড়ি বালতি নিয়ে তাকে যেতে হয় নিয়ম করে। সংসারে জল কম লাগে না। ইরা তবু জয়দেবের সাহায্য নিতে চায় না। জয়দেবও এগিয়ে আসে না সাহায্য করতে। সে ভাবে এগুলো ইরার দায়িত্ব। সে শুধু ট্রাক চালাবে টাকা এনে দেবে। বাজার হাট করে দেবে। আর বাবুসাহেবের মত খাবে পা নাচিয়ে।

বাড়িওলা মাসীর নাম মেনকা। মোটাসোটা দেখতে, নাক বোঁচা, গোল মুখ। তবু চোখ দুটো কাজল পরা। ঐ চোখের দৌলতে এত বয়সেও মেনকাকে বুড়ি লাগে না। মেনকা যখন হাসে তখন দাঁত বেরিয়ে পড়ে, মাড়ি দেখা যায়, হাসি ঠোঁট থেকে ঢিল ফেলা পুকুরের মতো সারা মুখে সংক্রামিত হয়। অদ্ভুত স্বপ্নালু দেখায় মাঝবয়সী মহিলার মুখখানা।

মেনকা হাতের কাজ সেরে প্রায় দিনই আসে ইরার সঙ্গে গল্প করতে। ভীষণ কথা বলতে ভালবাসে সে। ইরাকে দেখে নিজের ফেলে আসা দিনগুলোর কথা রোমন্থণ করে। ইরা মন দিয়ে শোনে।

মেনকা বলে, মাত্র তের বছর বয়সে বিয়ে হয়ে গেল আমার। তখন কী ছাই পাঁশ সংসারের জ্বালার কথা বুঝতাম! ধীরে ধীরে সব বুঝে গেলাম। চাপ পড়লে সবাই বাপ বলে। এখন দেখ দিব্যি ঘরদোর করে থিতু হয়েছি। এই ঘরদুয়ার ছেড়ে বাপের ঘর যেতেও মন করে না।

ইরা হাঁ করে শোনে। মাত্র ক'দিনে সে হাঁপিয়ে উঠেছে এখানে। জয়দেব ভালবাসার কোনও কম রাখে নি। লাইন থেকে ফিরেই জড়িয়ে ধরে পাগলের মতো! অসভ্যের মতন চুম্বন এঁকে দেয় ঠোঁটে গালে কপালে। তীব্র তার ঠোঁটের উত্তাপ। ইরা পুড়তে থাকে। ছ্যাঁকা খাওয়া মথের দশা। কখনও চোখে জল চলে আসে। তবু এক ধরনের বিচিত্র আনন্দ। বাধা দিতে পারে না। বুকটা ওঠা-নামা করে ঘনঘন। চোখ বুজে আসে। ঠোঁট নরম হয়। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে অদ্ভুত শিরশিরানী। ভাল লাগে, ভীষণ ভাল লাগে।

চোখ বুজে পড়ে থাকলে বুঝি বছর ঘুরে আসবে। লতা হাত পেঁচিয়ে ধরে জয়দেবের কোমর। হাত দুটোয় তখন কোথা থেকে শক্তি আসে। বুকের স্পর্শে কাঁপন ওঠে বুকে। চোখ-মুখে অদ্ভুত নেশাচ্ছন্ন দশা। যে কেউ হঠাৎ করে দেখলে বলবে অসুখ করেছে তার। হ্যাঁ অসুখ। অসুখই তো! নাহলে চোখের তারায় অস্থির কাঁপন কেন উঠবে, কেন উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠবে শিরা উপশিরা?

হাসতে গেলে ইরার মুখখানা বরাবর বড় দেখায়, লাল ঠোঁট আরও লাল। অনাবৃত গলায় শোভা পায় সোনালী হার। শাড়ির উপর, বুকের মাঝখানে সেই ধাতব প্রসাধন শিল্পকর্ম শুয়ে থাকে চুপচাপ। শুয়ে থাকা হারের মত বাধ্য শরীর নিয়ে ইরারও শুয়ে থাকতে মন করে জয়দেবের লোমশ বুকের মাঝখানে।

মেনকা ভাল মন্দ রাঁধলে দিয়ে যায় তার জন্য। ইরা নিতে চায় না। তবু জোর করে দিয়ে যাবে। বেশি বাধা দিতে গেলে বলবে, তুমি তো আমার মেয়ের মতো। আমার রীতা বেঁচে থাকলে সে আজ তোমার বয়সীই হোত।

স্মৃতির কাছে মানুষ যেত কত দুর্বল তার প্রমাণ মেনকার অশ্রুসজল চোখ দুটো। ভাড়াবাড়িতে থেকেও মায়ের স্মৃতিভার তাকে ব্যতিব্যস্ত করতে পারে নি। সারাদিন ঘরে থাকে না জয়দেব, চা জল খাবার খেয়ে মা কালীকে প্রণাম করে চলে যায়। যাবার আগে ইরাকে তার একান্তে কাছে পাওয়া চাই। দু-হাতের বজ্রবন্ধনীতে ইরার শরীর ঘামতে থাকে, চোখ বুজে আসে আবেশে। হুড়মুড়িয়ে মনের উঠোনে স্বপ্নবলাকারা ডানা ঝাপটাতে শুরু করে। এমন সুখের জীবন বুঝি সব নারী কামনা করে। ইরা সুখী। জয়দেবের বুকে মৃদু আঘাত করে সে কান পেতে শুনতে চায় জীবনের স্পন্দন। জয়দেব বাতাস লাগা উতলা ঘাসের মতো নড়ে, তার ঠোঁটের ভাষা অন্য, কামনার কম্পন স্থিতু হয় বিপরীত উষ্ণতার মায়া জালে। এই ভাবেই গড়িয়ে চলে জীবন। ইরার অনাবৃত শরীর জুড়ে জয়দেবের কর্মক্লান্ত শরীরে অফুরান শক্তি জুগায়, যৌবনের ধর্ম কখনও সরলরেখায় চলে না। খণ্ডচিত্র ছড়িয়ে থাকে বিছানায়। ইরার শরীর জুড়ে ঘিরে থাকা লজ্জা একদিন ব্যাঙাচির লেজের মতো খসে পড়ে। সে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে স্বেচ্ছায়। যত দিন যায় জীবনকে ছুঁয়ে দেখবার জন্য আকুলতা বৃদ্ধি পায় হৃদয়ে। ছোট ঘরখানাকে মনে হয় স্বর্গের বাগান। সে আর জয়দেব ছাড়া সেখানে কারোর প্রবেশের অনুমতি নেই।

জীবন সরলরেখায় চলে না, ঠোক্কর খেয়ে এক সময় বাঁক নেয়। লরি থেকে নেমে জয়দেব তার আগের শান্তশিষ্ট মেজাজকে ধরে রাখতে পারে না। যত দিন যায় সে খিটখিটে হয়ে ওঠে। তার নজর কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে। হাত পা ধোয়ার জল সময়মত না পেলে তিরিক্ষি হয়ে ওঠে মন। ইরাকে সোহাগ করার বদলে শাসনের তর্জনী তুলে শাসায়।

ইরা হাঁপিয়ে উঠে বলে, আমাকে যা বলার ভালভাবে বলো। তুমি রাগ করে থাকলে আমার চোখ দুটো অন্ধকার হয়ে যায়।

— তুমি যদি চোখে অন্ধকার দেখো তার জন্য কি আমি দায়ী থাকব। জয়দেবের সিগারেটের ধোঁয়া ইরার চোখে ঢুকে জ্বালা পোড়া শুরু করে দেয়। সে খুঁজতে থাকে নিজের দোষ ত্রুটি। সংশোধনের পথ কেউ তাকে দেখিয়ে দেয় না। জয়দেব সংশোধনবাদে বিশ্বাসী নয়। সে চায় আনুগত্য, সেবা। সে চায় ক্রীতদাসী হোক ইরা। তার কথায় উঠুক

বসুক হাসুক কাঁদুক। ইরার স্বাধীন সত্তায় শুরু হয় ভাঙন।

মেনকা তাকে সান্ত্বনা দেয়, মেয়েদের যে মুখ ভার করে থাকতে নেই। তোমার মুখে হাসি না থাকলে মানায় না। কী হয়েছে তোমার?

— আমার কিছু হয় নি মাসীমা। ইরা চোখের জল লুকিয়ে ফেললেও ভেজা চোখ দুটোকে লুকিয়ে রাখতে অক্ষম।

— তুমি কিছু লুকিয়ে ফেলতে চাইছ।

— আমার লুকিয়ে রাখার মতো কোনও কিছু নেই।

— তাহলে হাসো, প্রাণ খুলে হাসো। মেনকা হাত ধরে ইরাকে নিয়ে যেতে চায় নিজের ঘরে। ইরা সেখানেও পিন ফোটান বেলুন। রঙ নেই, উচ্ছ্বলতা নেই নিতান্তই সাদামাটা আটপৌরে হাসি। হাসিতে কালো বাদল মেঘের ছায়া। এই ছায়া সে কী ভাবে দুর করবে। ছায়ায় কি ঢেকে যাবে মনের আকাশ?

## ।। তের।।

পড়ন্ত বিকেলে রোদ্দুর কোথায় যে মুখ লুকায় ইরা জানে না। চোখের সামনে কালো ওড়না ছুঁড়ে দেবার মতো অন্ধকার নেমে এলে চারদিক বড় সুনশান আর গম্ভীর হয়ে ওঠে। ঘরে ফেবা পাখির ডানায় তখন ঘরে ফেরার দ্রুত ছন্দধ্বনি। জীবজগতও তার থেকে ব্যতিক্রমী নয়। গোরু ছাগল ধুলো উড়িয়ে চলে যায় চেনা চৌহদ্দিতে। আলো কমে আসা পৃথিবীতে ইরার ভয় করে একা থাকতে। জয়দেব ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা ফুরিয়ে রাত নামে, চরাচরে তখন আশ্চর্য নীরবতা বিদ্যমান। গৃহকোণে গৃহমুখী মানুষের তখন বিছানায় যাবার তাড়া। অথচ ইরার চোখে ঘুম নেই, বিছানো থাকে রাজ্যের উদ্বেগ সকালেও জয়দেব তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করল না। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করার মনোভাব। চোখের মধ্যে চোখ ফেলে সে তাকাল না, কেমন রাগ রাগ মুখ করে সে ইরার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকাল। ইরা তার রাগের কারণ বুঝতে পারে নি। কাছে গিয়ে হাত ধরেছিল জয়দেবের, খুব সহজভাবে বলেছিল, তোমার কী হয়েছে বল তো অমন মুখভার করে থাকলে আমার ভাল লাগে না।

জয়দেব ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, তোমার ভাল না লাগলেও আমার কিছু করার নেই। দয়া করে আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

সারা দিন তো তুমি একা থাকো। আমিও একা থাকি। তুমি ঘরে আসলে আমি কি কথা বলব না? ইরার প্রশ্নের ভেতরে সূক্ষ্মভাবে লুকান ছিল অভিমান, তুমি ছাড়া আমার কে আছে এখানে? তোমার সঙ্গে যদি আমি কথা না বলি তাহলে কার সঙ্গে কথা বলবে

জয়দেব কোনও উত্তর না দিয়ে চলে গিয়েছিল কুয়োতলায়। জলে বালতি ফেলার শব্দে ঘরে বসেই চমকে উঠেছিল ইরা। এত জোরে বালতি আছড়ে ফেলার অর্থ জয়দেবের মেজাজ ঠিক নেই। তাহলে কি গাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে? সত্যানন্দবাবু তো শুধু গাড়ির মালিক নন, জয়দেবের অভিবাবক। তার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। ইরা গামছা হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। রোজই পা ধুয়ে এসে ইরার হাত থেকে গামছা নেয় জয়দেব। সেদিন তাকে অবজ্ঞা করে চলে গেল সে। ইরা তার পিছন পিছন এল। গামছার কথা বলতেই ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল জয়দেব, আমার হাত আছে, আমি নিয়ে নিতে পারব। তুমি এক কাপ চা দাও। যদি না দিতে পার তাহলে সরে যাও। আমি নিজেই বানিয়ে নিতে পারব।

ইরা আর চোখের জল আড়াল করতে পারে নি। সে বারবার করে খুঁজছিল তার দোষটা কোথায়?

সে রাতে জয়দেব মুখ ঘুরিয়ে শুলো অন্যদিকে। ইরা তার কোমরে হাত দিতেই ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল হাত, চোখে মুখে অসহ্য বিরক্তি নিয়ে বলেছিল, আমাকে একটু ঘুমোতে দাও। কাল অনেক কাজ আছে।

ইরা দুঃখ পেলেও জয়দেবের এই ছন্নছাড়া মনোভাবের কোনও সদুত্তর খুঁজে পায়নি। বুকের ভেতর থেকে উদ্‌গত কান্নার বেগকে দমন করে সে বলেছিল, তুমি আমাকে আর সহ্য করতে পারছ না। কেন পারছ না তাও আমি জানি না। তোমার মনে যদি অজ্ঞাতে কোন দুঃখ দিয়ে থাকি তাহলে আমাকে বলো। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব।

জয়দেব এ কথারও কোন উত্তর দেয় নি, উত্তর দেওয়ার সামান্য প্রয়োজনটুকু সে বোধ করে নি। একসময় ইরা তার নাক ডাকার শব্দ শুনেছে। সেই শব্দ হাতুড়ির ঘা মেরেছে তার বুকে। তাকে কাহিল করে দিয়েছে। একই বিছানায় জড়োসড়ো হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছে সে। অশান্তির মধ্যে ঘুম আসে নি। ঘোরের মধ্যে রাত গড়িয়ে গিয়েছে ভোরের দিকে।

সকালে উঠে গা ম্যাজম্যাজ করছিল ইরার। জয়দেব অনেক সকালে উঠে ব্রাশ করা শেষ করে চলে গিয়েছে বাথরুমে। সেখান থেকে সোজা কুয়োতলায়। বালতি বালতি জল তুলে স্নান করেছে সে। ইরা তাকে সাহায্য করতে গেলে জয়দেব ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে।

মন ভেঙে গেছে ইরার। সে তো এমন জীবন চায় নি। সে চেয়েছিল দুঃখে সুখে গা মিলিয়ে বাঁচতে। এই অশান্তি অসহ্য।

অত সকালে জয়দেব কোনদিনও যায় না। ঘরের বাইরে গেলেও সে সেদ্ধ ভাত খেয়ে যায়। সেটুকু সেবা করার সুযোগ দিল না জয়দেব। ইরা তার হাত ধরতেই জয়দেব একই ভঙ্গিমায় বলল, হোটেলে খেয়ে নেব। তোমার অত ছটফট করার দরকার নেই।

—আমি থাকতে হোটেলে খেলে লোক হাসবে।

—যারা হাসার তারা তো হাসবেই। আমি ও নিয়ে মাথা ঘামাই না। গাড়ির চাবিটা নিয়ে বেপরোয়া ভঙ্গিতে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল জয়দেব।

সেই থেকে একা হয়ে গেছে ইরা। বারবার ফুলে ফুলে উঠেছে ঠোঁট। কখনও সজল হয়েছে চোখ। মেনকার কাছে যেতে পারে নি। যদি ধরা পড়ে যায় অভিজ্ঞ চোখের কাছে? ঘরের কথা সে পরকে কেন বলবে? লোক এসব নিয়ে মজা করুক এসব তার পছন্দ

নয়। যত কষ্ট হোক সে সহ্য করবে। জয়দেবের কাছে এমন ব্যবহার অকল্পনীয়। মাত্র ক' দিনে কী হল জয়দেবের! ইরা ভেবেছে জয়দেব আসলে তাকে নিয়ে সে ঘুরতে বেরোবে। বিয়ের পর থেকে কোথাও তো যায় নি। যাওয়ার মতো পরিস্থিতিও আসে নি। সারাদিন ঘরের বাইরে থাকলে ঘরের কথা কি ভুলে যেতে হয়? একা একা কিছুতেই সময় কাটতে চায় না ইরার। সেলাই-ফোঁড়াই নিয়ে বসবে তাও মন করে না। ঘুণ ধরা বাঁশের চেয়েও দুর্বল হয়ে যাচ্ছে ইরা। মেনকা তার শুকনো মুখ দেখে বলল, তোমার কী হয়েছে, যখন দেখি মুখটা শুকনো? বিয়ের পরে যদি হাসি খুশি না থাকতে পার তাহলে আর থাকবেটা কখন? ইরাও ভেবেছে কথাগুলো। সুখের সংসারে হঠাৎ যদি মেঘ নেমে আসে তাহলে এর জন্য কে কতটা দায়ী এই বোধ এখনও তার মধ্যে জেগে ওঠেনি। তবে সে চেষ্টা করে নিজেকে গুছিয়ে রাখতে। ফুলের বাগানের যে শোভা থাকে সেই শোভা সৌন্দর্য সুগন্ধ নারীর মধ্যে থাকা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। ইরা যে কী ভাবে সামাল দেবে ঝড়ঝাপটা বুঝতে পারে না। মেনকা বহুদর্শী। তার কপালে স্নেহের হাত রেখে বলে, ভেঙে পড়ো না। মন শক্ত করো। সংসার পাতলে সবসময় যে সুখ তোমাকে ছুঁয়ে থাকবে এমন ভাবা ঠিক নয়। সুখও থাকবে, দুঃখও থাকবে। দুটোকেই সমানভাবে নেওয়ার চেষ্টা করো। তাহলে দেখবে কোনও কিছুই তোমাকে টলাতে পারছে না।

কথাগুলো হা করে শোনে ইরা। ঘরের কার্নিসে চুপচাপ বসে থাকা নিরীহ গোলা পায়রাগুলোর মতো তার মুখ। ঐ পায়রাগুলো বুঝি নীরবে তাকে সান্ত্বনা দেয়। মেনকা তার মোটাসোটা শরীর নাড়িয়ে বলে, যখন দেখবে গোলাপায়রা উড়ে গেছে, তখন সুখও উড়ে যাবে। পায়রা সুখের কাঙাল। সুখ চলে গেলে ওরাও চলে যায়। ইরার ভীতু চোখ রোজ সকালে পায়রাগুলোকে দেখে। খেতে দেয় ওদের। আদর যত্ন করে। চাল গম ছিটিয়ে দেয় উঠোনে। শস্যদানার উপরে আহ্লাদে আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে পায়রা। দানা খুঁটে খুঁটে খায়। বকম বকম শব্দ ভাসায়। ডানা ঝাপটায় বাতাসে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়ে গিয়ে বসে। কেউ বা হাঁটে গুটিসুটি। পালক ফুলায়। ঠোঁট দিয়ে পালক খোঁটে। ইরাকে দেখে। ইরাও দেখে। ভীতু চোখ। ভয় হামাগুড়ি দেয় বুকে। হাত নাড়াতেও ভয়, কথা বলতেও ভয়। যদি পায়রাগুলো উড়ে পালায় তার দেহ সঞ্চালনে। তাহলে কী হবে? ওরা যদি না ফিরে আসে? যদি সুখ হারিয়ে যায়? ভয় ছোবল মারে রক্তে। বুকের ভেতর ব্যাঙ লাফায়। কেঁপে ওঠে চোখের তারা। ভ্রু কুঁচকে বিসদৃশ মুখ। ওই মুখ কি তার? রোজ আয়নায় দেখা মুখের সঙ্গে মিল নেই এক ফোঁটা। তাহলে ঐ মুখটা কার? ইরা আর ভাবতে পারে না। পায়রাগুলো দানা খুঁটে খাচ্ছে। মুখ থেকে ছিটকে আসছে আনন্দধারা। বকম্ বকম্। ওরা সুখে থাকুক। আরো সুখে থাকুক। মেনকার কথা সত্যি হোক। ভাল লাগার রেশটা ইরাকে পেঁচিয়ে ধরে। সে যেন হারিয়ে যাওয়া ইরাকে খুঁজে পায়। সাদা চোখে দেখে মেঘ কেটে যাচ্ছে। মেঘের কোনা থেকে ছিটকে আসছে রোদ। ওই সুখের রোদ ইরার যেন কত চেনা। মনের জমাটবাঁধা শ্যাওলাকে শুকিয়ে দেবে, আর কিছুতেই অসুখের বংশ বিস্তার করতে দেবে না। মেঘ সরে গেলে আলোয় আলোকময় হবে সব কিছু। ওই আলোকিত জগতের সেও একজন।

কুয়োতলায় ইট পাতা। পুরনো ইটের কোন রঙ থাকে না। দুঃখের কোনও রঙ থাকে না তেমন। তবু মনে কালো রঙটাকে বিষাদ আর দুঃখের রঙ হিসাবে ধরে নেয় সে

শ্যাওলা ধরা ইঁটগুলোয় হাঁটতে গেলে পা পিছলে পড়ার ভয়। ইরা ভেবেছে শ্যাওলাগুলো সে নিজের হাতে নষ্ট করে দেবে। পাশে জয়দেব থাকলে তার ভয় কিসের?

বিকেলের রোদ ভাঙা পাচিলের গা বেয়ে নেমে যায়, সরীসৃপের মতো বুকে ভর দিয়ে ঢিমে গতিতে কোথায় চলে যায়। কোথায় যায় সুখপাখি? সুখপাখির পেছনে যে আঁধার তাকে ইরার আজন্ম ভয়। কোয়ার্টার জীবনে সুখের স্পর্শ সে খুব কম পেয়েছে। অভাব ইটে বিছানো শ্যাওলার চেয়েও সুলভ। এখন অভাব নেই তবু কিসের যেন অভাববোধ হয়। আগে হোত না, এখন হয়। ফাঁকা ঘরে একা থাকলে মনে হয় অনেক কথা। এখনও তো তার মনে হয় জয়দেব কি তাকে ভালোবাসে না? অন্য কাউকে কি সে ভালোবাসে? তার নজর নিশ্চয়ই অন্য ঠিকানার হদিস পেয়েছে। যাকে ভালবাসা যায় তার মুখের দিকে তাকানো যায় না এমন তো সে শোনে নি কোনদিন। টালির ঘরের ফাঁক দিয়ে যখন রোদ এসে ঘর আলো করে তখন মনের ভেতর কী করে যেন আলো ঢুকে পড়ে। সেই আলোয় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে ভালবাসে ইরা। কিন্তু ক' দিন থেকে আলো আসছে না ঘরে। গুমোট হয়ে আছে ঘরের ভেতর। জয়দেব বুঝি অন্ধকার বয়ে আনে বাইরে থেকে। সদর দরজাটা কাঠের। সেখানে পা রাখলে বদলে যায় সে। তখন অস্বাভাবিক দেখায় চেহারা। যেন কোন কঠিন অসুখ থেকে উঠেছে এমন চোখ মুখ। ইরা বুঝি তার স্ত্রী নয়। কোঠাবাড়ির পুষে রাখা মেয়েছেলে। যখন ইচ্ছা ভোগ করো। আবার তুলে রাখো। আবার ভোগ কর। ইরার প্রেম পণ্য নয়। কুয়োর জল নয় যে যখন খুশি বালতি ডুবিয়ে তুলে নেবে। স্নান করবে, মুখ ধোবে। আঁচাবে।

গায়ের লোমগুলো এক সঙ্গে জেগে উঠল জেহাদ ঘোষণা করে। ঠোঁটে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকল ইরা। আর কিছুক্ষণের মধ্যে জয়দেব এসে যাবে। তখন তাড়াহুড়োর শেষ থাকবে না। জয়দেব ঘরে আসার অর্থ হল বুনো ঝড় ঢুকে এল ঘরে। সেই ঝড় সামাল দেবার ক্ষমতা ইরার নেই। ঝড়ে সে বেসামাল হতে জানে। ঝড়ে সে নিজেকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। পুরনো পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে অমন করে কী দেখে জয়দেব। পুরনো ইটগুলোকে এত ঘনিষ্ঠ চোখ দিয়ে দেখার কী আছে? তুলসী গাছটার সিমেন্ট বাঁধানো বেদী। গাছটার উপর মেনকার যত্নের শেষ নেই। বাড়িওয়ালীর মন পাওয়ার জন্য মাঝেমাঝে গাছের গোড়ায় জল ঢালে ইরা। গাছটা একটু একটু করে বড় হচ্ছে। তুলসীর পাতাগুলো বুঝি ইরার সবুজ চোখ। গাছটার উপর তার টান কম নেই। গাছটা একটু একটু করে বাড়ছে। ইরা রোজ দেখে। রোজ দেখলে চোখে মায়া জন্মাতে বাধ্য। জয়দেব তো তাকে রোজ দেখে তবু তার চোখে ইরার প্রতি কেন মায়া নেই। কোন মায়াবী ইরার সুখ তার করতলে নিচ্ছে।

কাঠের দরজা খুলে ইট বিছানো উঠোনে এসে দাঁড়াল জয়দেব। পরিশ্রান্ত মুখ চোখ। খসখসে ঠোঁট। পোষাকে আসাকে যত্নের অভাব। জোড়া চোখ স্বপ্নহীন নিষ্প্রভ। ওই চোখের ভাষা পড়ে উঠতে পারে না ইরা। অথচ কতদিন হয়ে গেল এক বিছানায়। এত স্বল্প পরিসর কেন হবে মানুষের সুখের জীবন।

জয়দেব ঘরে ঢুকল না, কুয়ো থেকে জল তুলে পা ধুলো। ইরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল, এল না। আশাহত চোখ মেলে তাকাল। ঐ চোখে ঘৃণা না সহানুভুতি বোঝা ভার।

শুধু এটুকু বোঝা যায় ওই চোখগুলো তার কাছে পর হয়ে গেছে। গোলা পায়রার দল যে যার মতন আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে নিজেদের অন্ধকারের ছোবল থেকে আপাত উদ্ধার পাবার জন্য। ইরা ভীতু গোলা পায়রার মতো কাঁপে, তবু টালমাটাল পায়ে সে এগিয়ে গেল জয়দেবের সামনে, তুমি আমাকে উপেক্ষা করছ। তোমার উপেক্ষা আমি যে সহ্য করতে পারছি না। আমার দোষটা কোথায়, আমি কী করেছি তুমি আমাকে বলে দাও জয়দেব উত্তেজিত হল না, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তোমাকে উপেক্ষা করব কেন? তুমি তোমার মতো থাকো, আমি আমার মতো থাকি। ব্যাস, মিটে গেল ঝামেলা।

তুমি যা সহজভাবে বলছ সেটা তোমার মনের কথা নয়। ইরার কম্পমান ঠোঁটে নীল অভিমানের স্পর্শ, তোমার মুখ চেয়ে আমি এখানে এসেছি। তুমি যদি কথাবার্তা বন্ধ করে দাও তাহলে আমি কোথায় যাব।

যেখানে মন চায় চলে যাও, আমি বাধা দেব না। কঠিন শোনাল জয়দেবের গলা এখানে কেউ ধোয়া তুলসীপাতা নয়। সবারই দোষ আছে।

ইরা কী শুনছে এসব? কঠিন শব্দগুলো তার বুক এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে যায়। হতাশায় ম্লান হয়ে আসে মুখ। টালির ছাদের নীচে সে সুখের ঘর বাঁধতে চেয়েছিল তাসের ঘরের মত তা এখন মুখ থুবড়ে পড়েছে। এলোমেলো ঘরটাকে সে আবার নতুন করে সাজাবে কী ভাবে। তবু যত্ন নিয়ে চা বানাল ইরা। ঝগড়ার পথে সে হাঁটবে না ওতে সে নিজেই আহত হয়, সারারাত নীরব যন্ত্রণা তাকে কুরে কুরে খায়। কাঠের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ইরা ভাবে সেই পায়রাগুলোর কথা যারা তার হাত থেকে শস্যদানা খায় প্রতিদিন মন দিয়ে। পায়রাগুলো উড়ে গেলে সত্যিই কি তার স্বপ্নের তাজমহলটা মুখ থুবড়ে পড়বে।

খাওয়া-দাওয়া প্রক্রিয়া এখন ইরার কাছে একটা অভ্যাস মাত্র। জয়দেব খেতে বসেও বোবা। ইরা তার গায়ে টোকা মেরে বলল, মাছের ঝোলটা কেমন রেঁধেছি বললে না তো?

জয়দেবের মুখ বেঁকে উঠল, তুমি যেমন রোজ রাঁধো তেমন হয়েছে।

— আর একটু তরকারি দিই? ইরা সাগ্রহে শুধাল।

— না থাক। অনেক খেলাম। পেট ভরে গেছে। বাকি ভাতগুলো থালার একপ্রান্তে সরিয়ে এঁটো হাতে উঠে দাঁড়াল জয়দেব। বারান্দার এক ধারে জলের বালতিটা ভরে রেখেছিল ইরা। রাতে আর কুয়োতলায় যায় না ওরা। মেনকাই মানা করেছিল। সেদিন জ্যোৎস্নারাত একটা সাপ শরীর টানটান করে শুয়েছিল ভেজা ইটের উপর। আর একটু পরে হলে পা দিয়ে ফেলত মেনকা। বিপদ হয় নি, সে রক্ষা পেয়ে গেছে। বালতির জলে মুখ না ধুয়ে জয়দেব মাথা নীচু করে চলে গেল কুয়োতলায়। আবার লোহার বালতির সঙ্গে জলের বৈরিতার আওয়াজ শুনতে পেল সে। বুক ভেঙ্গে গেল ইরার। বাইরে এসে দেখল ফুটফুটে চাঁদ উঠেছে অন্ধকার হটিয়ে দিয়ে। পাঁচিলের এক কোণে মর্তমান কলার ঝাড়। কলাপাতায় জ্যোৎস্না পড়ে চকচক করছে। মেনকারও বুঝি খাওয়া শেষ হয়েছিল ইরাকে দেখতে পেয়ে বাইরে এল সে, একমুখ হেসে জিজ্ঞেস করল, খাওয়া হয়ে গেল বুঝি?

ইরা ঘাড় নাড়তেই কাছে এগিয়ে এল মেনকা, গলা নামিয়ে প্রশ্ন করল, তোমাদের

ান অভিমানের পালা কি এখনও চলছে? তারপর সে নিজেই সমাধানের রাস্তা দেখিয়ে িল, আর যাই করো বিছানায় গেলে জেদ করে থাকবে না। বিছানা হল আপোশের কমাত্র জায়গা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে জয়দেব পুরো ঘরটাকে ভরিয়ে দিয়েছে তামাকের ধোঁয়ায়। রার শ্বাস নিতে কষ্ট হলেও মুখে কিছু বলল না। বিয়ের পরে পান খাওয়ার অভ্যাসটা য়দেবই ধরিয়ে দিয়েছে তাকে। কাজ থেকে ফেরার সময় সে রোজ একটা মিষ্টি পান কনে আনত। ক'দিন থেকে সে আর পান আনছে না। ইরা দু-একবার বলেই থেমে গছে। পান সে নিজের ইচ্ছায় খেত না, জয়দেবের মন রাখার জন্য খেত। শুতে যাবার াগে মুখে ক্রীম ঘষল ইরা। চুলে চিরুনি দিয়ে সে জয়দেবের দিকে মিষ্টি করে হাসল। জয়দেব প্রতিক্রিয়াহীন। ইরা তবু এগিয়ে গেল তার দিকে। দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল জয়দেবের গলা, মাথার পেছনের চুলে বিলি কেটে সে ঠোঁট ছোঁয়াল জয়দেবের ঠোঁটে। াধ্য ছেলের মতো পড়ে থাকতে চাইলেও জয়দেব আর বেশিক্ষণ নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ইরার দিকে নরম চোখে তাকিয়ে সেও মেতে উঠল জীবনের আদি খেলায়। বছানায় গড়িয়ে গেল এতদিনের পুষে রাখা অভিমান। বুকে বুক শরীরে শরীর মিলিয়ে ওরা তাপ পরখ করল একে অন্যের। তৃপ্ত ইরা শাড়ি বেসামাল অবস্থায় হাত-পা এলিয়ে পড়ে রইল বিছানায়। জয়দেবকে হারিয়ে দিতে পেরে তার আর সুখ ধরছিল না।

সকালে রোদ এসে পড়েছে পেয়ারাগাছের পাতায়। আজ একটু দেরী করে উঠল ইরা। ঘুম চোখে বাইরে এসে দেখল কার্নিশে জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে গোলা পায়রা। ওরা একে অন্যের প্রতি প্রেম নিবেদনে মত্ত; এমন সুখের দৃশ্যে আবেশে চোখ বুজে এল ইরার। জয়দেবকে ডাকল একটু জোর গলায়, এই শোন, দেখে যাও। আঙুল উঁচিয়ে পায়রাগুলোকে দেখিয়ে দিল ইরা। জয়দেব একভাবে দেখছিল। পায়রার প্রেম তার নিজের প্রেমটাকে জাগিয়ে তুলল বুঝি। ইরাকে হাত ধরে নিয়ে গেল ঘরের ভেতর। খুব অন্তরঙ্গ ভাবে কাছে টেনে বলল, মাঝে মাঝে আমার যে কী হয় তা আমি নিজেও বুঝি না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

ইরা হাসল, মান-অভিমান নিয়েই জীবন। আমি কিছু মনে করিনি। তারপরই গম্ভীর হয়ে গেল ইরার মুখ-চোখ। ভয় এসে ঘিরে ধরল তাকে। কাল রাতে স্বেচ্ছায় জয়দেবের কাছে সমর্পণ করেছে সে। ধরা দেওয়ার অর্থ ধরা পড়ে যাওয়া। জয়দেবও কোনরকম সংকোচ রাখে নি। পরিতৃপ্তির সীমানা পেরিয়ে ওরা ভুলে গেল সংযম। ইরা বুঝতে পেরেছে, বুঝেও সে বাধা দেয় নি। আরও গম্ভীরভাবে জয়দেবকে নিজের কাছে টেনে নিয়েছে। বাঁধ ভেঙে গেছে প্রতীক্ষার। হাতের ছুঁড়ে দেওয়া ঢিল গন্তব্য ছুঁতে পারে যে কানসময়। ইরার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, শুকিয়ে গেল গলা। জয়দেবের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, কাল রাতে আমরা দু-জনেই হারিয়ে গিয়েছিলাম। ান ভয় করছে। যদি কিছু হয়ে যায়। জয়দেবের গলায় কোন আড়ষ্টতা নেই, আমি চ্ছ করেই হারিয়ে যেতে চেয়েছি।

বিপদ ঘটে গেল। ইরার মুখ সাদা হয়ে গেল।

জয়দেব বলল, বাঁধ দিয়ে কতদিন আর বন্যার জলকে আটকে রাখা যাবে। বাঁধ তো কদিন ভাঙতই।

এত তাড়াতাড়ি অঙ্ক মিলে যাক আমি চাইনি।

তোমার সঙ্গে আমার এখানেই মিল হয় না। জয়দেব উদাসীন চোখে তাকাল, অত ভয় পাবার কী আছে। যা হবার হবে। আমি তো আছি।

ইরার হাত দুটো আবার শক্ত হয়ে এল। ভয় মিশ্রিত ভালবাসায় সে জয়দেবকে টেনে নিল বুকের কোটরে। তাপ বিনিময়ে শীতল হয়ে এল হৃদয়।

এখন প্রায়ই ইরাকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যায় জয়দেব। ইরাকে সামনের সীটে বসিয়ে সে স্টিয়ারিং ধরে থাকে শক্ত হাতে। চাকা গড়াতে শুরু করলে স্বপ্ন দেখা শুরু হয় ইরার চোখের সামনে চলমান দৃশ্যাবলী তার হৃদয়কে বিগলিত করে তোলে। বাইরে না বেরোলে পৃথিবীটা চোখের সামনে আসে না। ধাবার হোটেলে চা খেতে মন্দ লাগে না ইরার। কানাই তার সুবিধা অসুবিধাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করে।

রাত করে ঘরে ফিরে এলে ইরা দেখতে পায় কমলাকে। সে বিকেল থেকে বসে আছে তাদের অপেক্ষায়। বিয়ের পর ইরার সঙ্গে দেখা হয় নি। মন উতলা তাই ছুটে এসেছে। কমলাকে দেখে ইরার যতটা আনন্দে আত্মহারা হবার কথা ছিল তার কোন কিছু তার চেহারায় পরিস্ফুট হল না। কমলা এগিয়ে এসে হাত ধরল ইরার। এক মুখ হেসে বলল, তুই খোঁজ না রাখলেও আমি তোর খোঁজখবর রাখি। নতুন সংসার কেমন লাগছে তোর?

কমলার জিজ্ঞাসায় ইরা কিছুটা সংকোচের মধ্যে পড়ে গেল, তবু সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ভালই লাগছে। এই তো ঘুরে এলাম দু-জনায়। জানিস দারুণ মজা হল

কমলার চোখ কুঁকড়ে গেল, আমার আর কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠে না। আমার ঘরের লোকটা ঘরকুনো। কোথাও যাওয়ার কথা বললে ওর গায়ে জ্বর আসে। ঘরে থেকে আমি হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাই সুযোগ পেয়েই তোর এখানে চলে এলাম।

এসে ভালই করেছিস। ইরা কমলার চোখের দিকে তাকাল প্রথমে, তারপর পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল। বিয়ের পরে একটু রোগা হয়ে গিয়েছে কমলা, কথাবার্তায় আগের সেই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস নেই, সংসারের যাঁতিকলে পিষে যাওয়া মানুষের মুখের আদল। ইরা শুনেছে কমলার সংসারে সুখ নেই। দ্বিজপদ এসেছিল এখানে, নিজ মুখে সব বলে গিয়েছে। কমলার স্বামী গোবিন্দ তার সুখ হারাম করে ছেড়েছে। উঠতে-বসতে শুধু কথা শোনায়। গায়ে হাত তুলতেও কসুর করে না। রেগে গেলে সে প্রায়ই বলে, তোমার বাবা আমাকে ঠকিয়েছে। খালি হাতে আস্ত একটা মেয়েকে আমার গলায় বেঁধে দিল। গড়ি সাইকেল আংটি কোনও কিছুই দিল না। তোমার বাবা একটা ধড়িবাজ, ফোর টুয়েন্টি। আমি আর কোনওদিন তোমাদের বাড়ি যাব না। দ্বিজপদর ব্যবসা ভাল চলে না, বাজারে ধার দেনা হয়ে গিয়েছে প্রচুর, তবু সে সাধ্য মত মেয়েকে দান-সামগ্রী দেবার চেষ্টা করেছে। গোবিন্দর কোনও বরপণ ছিল না, বিয়ের পর থেকে তার গলা চড়েছে, সে কমলার গায়ে হাত তুলছে। কমলা বাপের ঘরে এসে থেকেছিল ক'দিন। সেখানে সে শান্তি পায় নি। পাড়ার বুড়োবুড়ি মা-মাসীরা কথা শুনিয়েছে আঁকাবাঁকা। গা জ্বললে মুখের মাপে কোনও উত্তর দিতে পারে নি সে।

শাড়ি বদলে চা চাপাল ইরা, কমলাকে কাছে ডেকে বলল, আমি জানতাম তুই আসবি তুই এসেছিস দেখে আমারও মন ভাল লাগছে। এখানে কথা বলার লোক পাই না

কেন মাসীমা তো আছেন। কমলা চাপা গলায় বলল, তোরা ছিলিস না. উনি আমার জন্য একেবারে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। খুঁটিনাটি খোঁজ খবর নিলেন আমার। ভদ্রমহিলাকে বেশ মিশুকে বলে মনে হল।

ইরা ফুটন্ত জলে চা পাতা দিল পরিমাণ মতো, তারপর বাইরে তাকিয়ে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বলল, মাসীমা মানুষ ভাল। মনও সুন্দর। তা বলে মাসীমাতো আমার বন্ধু হতে পারেন না! বয়সের পার্থক্যটা কী করে মিটবে বল?

কথার মাঝখানে এল জয়দেব, হাতে ডিমের ঠোঙা। কমলার দিকে উৎসাহপূর্ণ চোখে তাকিয়ে সে হাসল, সেই কবে দেখা হয়েছিল! এই বুঝি মনে পড়ল জামাইবাবুকে?

মনে তো পড়ে কিন্তু কী করব সময় যে পাই নে! কমলার চোখে হাসির ঝিলিক, গালে টোল পড়ল তার। সাজানো-গোছানো ঘরখানা দেখে মনে ঈর্ষা জন্মাল তার। সেই উদ্বেলিত ঈর্ষাকে দমন করে বলল, জামাইবাবুর নতুন ঘরখানা দেখে মন ভরে গেল।

জয়দেব সঙ্গে সঙ্গে বলল ঘর তো আমার নয়, ভাড়া বাড়ি। আর ঘর সাজানোর সব কিছুই ইরাই করেছে। আমি আর ঘরে কতক্ষণ থাকি। সকাল হলে ট্রাক নিয়ে চলে যাই। যেদিন আশেপাশে থাকি সেদিন রাতে ঘরে ফিরি নয়তো ধাবার হোটেলে রাত কাটে।

—নতুন বিয়ে করে কেউ বুঝি বাইরে রাত কাটায়? কমলার প্রশ্নটা ইরার কানে হঠাৎ অশ্লীল বলে মনে হল, নিমেষে মুখ চোখ এমন কী কানের লতি লাল হয়ে উঠল তার। চা ছেঁকে সে কমলার মুখের সামনে কাপটা নামিয়ে রেখে কেমন জড়োসড়ো চোখে তাকাল। কমলার এতে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই, সে বুঝি উড়ে বেড়ান ময়না, খাঁচায় আটকে থাকতে ভালবাসে না। তার স্বভাবের মতো মুখটাও বড় উচ্ছৃঙ্খল, জামাইবাবু, এত দিন বিয়ে হল, তা কোনও খবর আছে নাকি? সুখবর থাকলে কিন্তু মিষ্টি খাওয়াতে হবে। মিষ্টি না খাওয়ালে আমি ঢোল পিটিয়ে সবাইকে বলে দেব।

ইরা চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে ছ্যাঁকা খেল, বিরক্তি সে আর চেপে রাখতে পারল না, তুই চুপ কর তো। অন্য কথা বল।

—কেন, কী হয়েছে তোর? লজ্জা লাগছে বুঝি? কমলার মোটা ঠোঁটে অন্যকে হারিয়ে দেবার হাসি, গা দুলিয়ে চোখ নাচিয়ে সে বলল, ঢঙ দেখলে আর বাঁচি না। বিয়ের পর যে মেয়ে বলে আমি বেড়াল তপস্বী, মাছ ছুঁই না—আমি তার কথা বিশ্বাস করি না। যারা সব জেনে বুঝে ন্যাকামী করে তাদের আমার ভাল লাগে না।

লজ্জায় ইরার দেওয়ালে পিঠ লেগে যাবার উপক্রম, জয়দেবই তাকে বাঁচাল, প্রসঙ্গ বদলে সে বলল, যাও আঁচটা ধরিয়ে দাও। তাড়াতাড়ি খেয়ে আজ আমি ঘুমাব। কাল আবার পাট বোঝাই ট্রাক নিয়ে আমাকে কলকাতায় ট্রিপ দিতে হবে।

—ফিরবে কবে? ইরার চোখে দুশ্চিন্তা। কলকাতা কিংবা দূরের কোন শহরে ট্রাক নিয়ে গেলে ঘরে একা হয়ে যায় ইরা। জয়দেব ট্রাক নিয়ে বাইরে গেলে তার মন পড়ে থাকে রাস্তায়। লং রুটে ট্রাক চালালে কখন যে বিপদ থাবা বসিয়ে দেবে একথা আগাম কেউ জানে না। জয়দেব ট্রিপ নিয়ে যাবার আগে মুখ শুকনো করে থাকে। হাসি ভুলে যায়, বেশি কথা বলে না। হয়ত বাইরে যাবার আগে তার এই নীরব মনঃসংযোগ দূরের পথকে আরও সহজ সুন্দর করে তোলে। জয়দেব প্রায়ই বলে, স্টিয়ারিং-এ হাত ছুঁয়ালে

আমার ঘরের কথা মনে পড়ে না। মন থাকে তখন যেখানে যেতে হবে সেখানে। চোখ দুটো পিচ রাস্তা ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না।

ইরা শুনে তাজ্জব হয়ে যায়, এমন বিচিত্র জীবনের সঙ্গে তার আগে পরিচয় ছিল না। জয়দেবের মুখ থেকে যত সে পথের কথা শোনে ততই সে যেন উতলা হয়ে পড়ে জীবিকার জন্য মানুষকে কত কী না করতে হয়! জয়দেব বলে, ড্রাইভারদের জীবন সুচের মাথায় সরষে নাচানোর খেল। কবে যে ঠিকরে যাবে কোন অতলে কেউ জানে না

কয়লা ধুঁয়ো বাতাস কেটে উপর দিকে উঠে যাচ্ছিল, আঁচে হাওয়া করা থামিয়ে ইরা ফিরে এলে ঘরে। কমলার শূন্য কাপটা তুলে নিয়ে সে আবার ফিরে এল কুয়োতলায় জয়দেবকে একান্তে পেয়ে বলল, কাল ভোরেই তোমাকে কলকাতায় যেতে হবে? একদিন পিছিয়ে দিলে হয় না?

জয়দেব মন খারাপ করা চোখে তাকাল, মালিক চটে গেলে কী কর্মচারীদের মনে সুখ থাকে? কাল আমাকে যেতেই হবে, সেই মত আমি বলে এসেছি। এখন যদি অজুহাত দেখিয়ে না যাই তাহলে মালিক ভাববে বিয়ে করে আমি ঘরকুনো হয়ে গিয়েছি।

বিয়ের পরে তুমি আর ক'দিনই বা ঘরে থাকলে? চোখ ছলছলিয়ে উঠল ইরার তুমি বাইরে গেলে একা থাকতে আমার ভাল লাগে না। সারাক্ষণ শুধু চিন্তা হয়।

জয়দেব আলো-আঁধারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত ধরল ইরার, তুমি আমার চিন্তা করবে, আমি তোমার চিন্তা করব—এসব নিয়েই তো জীবন। যখন আমি একা ছিলাম তখনও তোমার জন্য আমার চিন্তা হোত। এখন তুমি আমাব কত কাছে তবু চিন্তার হাত থেকে নিস্তার পেলাম কই।

ইরা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জয়দেবের মুখের দিকে তাকাল. বুক ভেঙে যাওয়ার শব্দে কেঁপে উঠল সে, এবারের ট্রিপটা কত দিনের?

—দিন তিনেক তো লাগবেই।

—দিন তিনেক! ইরা চমকে উঠল, এতদিন কী করে থাকব?

—কেন, কমলা তো এসেছে। ওকে নিয়ে থাকো। জয়দেব বলল, আমি নিশ্চিন্তে যেতে পারব। এবার আর অত বেশি চিন্তা হবে না আমার। এ সময় কমলা এসে ভালই হয়েছে কী বলো?

ইরা জয়দেবের কথায় উচ্ছ্বসিত হতে পারল না, আনমনে দূরের আকাশের দিকে তাকাল। পেয়ারাগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে অস্বচ্ছ চাঁদ ভাসছে আকাশে, তুলো মেঘ ঘিরে আছে চাঁদের চারপাশ। কোথাও জলবাহী মেঘের দেখা নেই অথচ তার চোখ জলে ভরে এল। জয়দেব ভেজা চোখের আর্তি মাখানো দৃষ্টিকে সম্মান জানিয়ে বলল, পেটের দায় বড় দায়। আমারও কি তোমাকে ছেড়ে থাকতে ইচ্ছে করে? কিন্তু কোনও উপায় নেই আমি বড় অসহায়। আমাকে যেতেই হবে।

কমলার চোখের ভাষায় হাজার কথার জাল বোনা, সব কথা বলার মতো সুযোগ তার কাছে নেই। কমলা হঠাৎ এসে যাওয়াতে গোপনীয়তার দুর্গে দেখা দিয়েছে ফাটল বিশেষ করে আজকের রাতটা সে জয়দেবের কাছে উৎসর্গ করতে পারবে না বলে মনে মনে ভীষণ কষ্ট পেল সে।

জয়দেব ইরার হাতটাতে ইঙ্গিতপূর্ণ চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল, মন খারাপ কোর না, কা

হয়ে গেলে আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।

—কানাইদা কি তোমার সঙ্গে যাচ্ছে?

জয়দেব ভাষাহীন চোখে তাকিয়ে নীরবে হাসল।

কমলা ওদের ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রসিকতা করে বলল, কি স্বামী স্ত্রীতে প্রেম হচ্ছে বুঝি? আমি এসে সব বুঝি বানচাল করে দিলাম?

ইরা রাগল না, প্রসন্নও হল না, শুধু আশ্চর্য নীরব দৃষ্টি মেলে তাকাল, ও কাল ট্রাক নিয়ে কলকাতায় চলে যাচ্ছে।

—ওঃ এই জন্য বুঝি তোর মন খারাপ? কমলার দু গালে উজ্জ্বল টোল পড়ল, প্রথম প্রথম এরকম মন খারাপ সবার হয়। তারপর যতদিন যাবে সব ফিকে হয়ে যাবে। আমি এসব কাটিয়ে উঠেছি। আমার এখন আর কারোর জন্য মন খারাপ করে না।

—আমি যদি তোর মতো হতে পারতাম?

—ভাগ্যিস না হয়ে ভাল হয়েছে। আমার কপাল যদি তোর হোত তাহলে তুই এত যাতনা সহ্য করতে পারতিস না। হাসি নিরুদ্দেশ হল কমলার ঠোঁট থেকে, আবছা আলো-অন্ধকারের মাঝখানে সে যেন বিষাদ প্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

ভোর রাতে উঠতে হবে বলে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল জয়দেব। কমলার আরও কিছুক্ষণ গল্প করার ইচ্ছা ছিল, ইরা তার ইচ্ছাতে জল ঢেলে দিল, ব্যস্ত হয়ে বলল, কাল ভোরে আমাকে উঠতে হবে। ওর জন্য দুটো সেদ্ধভাত করে দেব। পরোটা বানিয়ে দিলে রাস্তার খাবার খেতে হবে না। ইরার দায়িত্ব সচেতনায় কমলার চোখের চামড়া কুঁচকে গেল, হাঁ করে সে তাকিয়ে থাকল। ইরা বলল, চল, আর দেরী করা উচিত হবে না। তাড়াতাড়ি ঘুমালে যদি চটজলদি ঘুম ভাঙে!

কমলা প্রত্যুত্তর না করে উঠে এল বিছানায়। জয়দেব একাই ঘুমিয়েছে তক্তপোষে। কমলার খারাপ লাগতেই বলল, আমি নীচে ঘুমাচ্ছি, তুই ওর পাশে গিয়ে শো।

লজ্জায় আরক্ত হল ইরার মুখ, তা হয় নাকি? আমি তোর পাশে শোব।

—আমি না আসলেই মনে হয় ভাল হোত। কমলার বিষণ্ণ দৃষ্টি, ইরা বিচলিত হল, তোর পাশে শোব না তো কি আমি ওর পাশে শোব? দিন কি পালিয়ে যাচ্ছে বল?

ইরার প্রশ্ন হাসি দিয়ে ফিরিয়ে দিল না কমলা। সে চুপচাপ বিছানায় গিয়ে বসল। মশারি গুঁজে ইরার দিকে তাকাল, ইরা বাতি নিভিয়ে ফিরে এল পাশে।

জয়দেবের ঘুম ভাঙল সবার আগে, ভোরের মোরগ গলা সাধতেই তার ঘুম ভেঙে যায় রোজ। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। কানাই ঘর থেকে সোজা চলে যাবে গ্যারেজে। কাগজ-পত্তর সব ওর হাতে দিয়ে দেবে মালিক। জয়দেব যাওয়ার আগেই ট্রাকের টায়ার, হাওয়া, লাইট সব কিছু দেখে নেবে। সাইড টায়ারে জল ভরে নেবে সে। দেরী হলে কানাই চলে আসবে ডাকতে।

বাথরুম সেরে জয়দেব যখন ঘরে ফিরে এল তার অনেক আগেই বিছানায় উঠে বসেছে ইরা। দু চোখে ঘুমের পুরু স্তর। চোখ ডলে নিয়ে সে কেমন মন খারাপ করা চোখে তাকাল। জয়দেব ইশারায় ডাকল তাকে। ইরা নিঃশ্চুপ পায়ে উঠে গেল বিছানা ছেড়ে। নিঃশ্বাসের আওতায় যেতেই হাত বাড়িয়ে ইরাকে বুকে জড়িয়ে নিল জয়দেব। বুকের ওম দিয়ে বলল, যাওয়ার মন নেই তবু যেতে হবে। সব চাকরিই মনে হয় পরাধীন।

ইরা কিছুক্ষণ বুকের উত্তাপে নিজেকে সেঁকে নিয়ে আধো স্বরে বলল, ভোর হয়ে আসছে। আমাকে ছেড়ে দাও। কমলার ঘুম পাতলা। ও উঠে গেলে কী ভাববে বলো তো?

যা ভাবে ভাবতে দাও। আমি তো পরের বউকে আদর করছি না। ঠোঁটে ঠোঁট জড়িয়ে চুমু খেল জয়দেব। কার্নিশে পায়রার ঘুম ভেঙে গেছে, ঘর থেকে ছিটকে আসা আলোর দিকে অবাক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে জোড়া পায়রা। জয়দেবের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে জোর করে মুক্ত করল ইরা, তার কষ্ট হল এই বিচ্ছেদ কাটিয়ে উঠতে।

ইরা যখন পরোটা ভাজছিল, ঘরে তখন ব্যাগ গোছাতে ব্যাস্ত ছিল জয়দেব। এত কিছুর পরেও ঘুম ভাঙে নি কমলার, বুকের কাপড় সরে গিয়ে সে কেমন শুয়ে আছে অসহায়ভাবে। সব মেয়েরই শুয়ে থাকার ভঙ্গি একরকমের নয়। অনিচ্ছা সত্বেও জয়দেবের চোখ চলে গেল কমলার শরীরে, শত চেষ্টা করেও সে চোখ ফেরাতে পারল না। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে। রক্তের ভেতরে বুনো উন্মাদনার ঢেউ আছড়ে পড়ল বারংবার ভুলে গেল তাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে গ্যারেজে। সাড়া শব্দ না পেয়ে ইরা রান্নাঘর থেকে ডাকল, কী গো, আবার ঘুমিয়ে পড়লে নাকি।

শব্দের ধাক্কায় হুঁশ ফিরে আসে জয়দেবের, তাকিয়ে দেখে ইরা ধারে কাছে নেই রান্নাঘর থেকে ভেসে আসছে পরোটার সুগন্ধ। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে। আড়ষ্ট জড়বৎ পায়ে সে হেঁটে এল কমলার কাছে। ঠেলা মেরে জাগিয়ে দেয় কমলাকে, অস্ফুটে বলে আমি চলে যাচ্ছি। ওঠো। কমলা ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল, চোখে-মুখে দীর্ঘসময় ঘুমিয়ে থাকার ছাপ। তবু বিস্ফারিত চোখ মেলে সে জয়দেবের দিকে তাকাল, কোন কথা না বলে বিছানায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মশারিটা খুলে ভাঁজ করে সে চলে গেল ইরার কাছে। আফশোষ করে বলল, আমার উঠতে অনেক দেরী হয়ে গেল। তুই আমাকে ডাকলেই পারতিস?

গ্যারেজে যাওয়ার সময় মা কালীর ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে জয়দেব বিড়বিড় করে কী যেন প্রার্থনা করল অনেকক্ষণ ধরে। ইরা পাশেই ছিল। রোজই পাশে থাকে সে, এ সময় পাশে দাঁড়ালে তার ভেতরেও আধ্যাত্মিক চেতনার স্ফূরণ ঘটে, একে অন্যের পরিপূবক মনে হয়। ভাল লাগার ইন্দ্রিয়গুলো টানটান হয়ে ওঠে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখস্বপ্নে। কমলা ওদেরকে পাথর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে টিপ্পনী কাটল, হয়েছে জামাইবাবু, এবার যান। নাহলে সকাল হয়ে যাবে। মালিকের বকা খাবেন।

রাগে ক্ষোভে রিরিয়ে উঠল ইরার সমগ্র সত্তা, কমলার দিকে সে অসন্তোষপূর্ণ চোখে তাকাল। কোন কথা না বলে সে এগিয়ে এল সদর দরজার কাছে। জয়দেব তার পিছন পিছন এল, ইরার চোখে চোখ ফেলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সোজা চলে গেল বড় রাস্তার দিকে। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ইরা, জয়দেব দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই মুখ নীচু করে ঘরে ফিরে এল সে।

কমলা কথা বলার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল, ইরাকে গম্ভীর দেখে সে শুধোল, তোর আবার কী হল?

কিছু হয়নি। মুখ ঘুরিয়ে নিল ইরা।

মন খারাপ করছে?

না। ইরার কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না, কমলা তবু জোর করল, পুরুষ মানুষ ঘরের বাইরে না গেলে কী করে চলবে?

তুই যা ভাবছিস আমি তা ভাবছি না। ইরা আর গলার ঝাঁঝ লুকিয়ে রাখতে পারল না, তোর কি এতটুকু জ্ঞান নেই কখন কী করতে হয়? ও বাইরে যাচ্ছে। যাওয়ার সময় টিপ্পনীটা না কাটলেই পারতিস।

—জামাইবাবুর সঙ্গে শালী একটু রগড় করবে না? কমলা হাসি দিয়ে ইরার মন থেকে চিন্তার স্তূপ সরিয়ে দিতে চাইল, আমার স্বভাবটা ওই রকম। মনে হয় এই জন্য আমার কপালে ভগবান সুখ লেখে নি।

সব কিছুতেই এত ছেলেমানুষী ভাল নয়। আমি কিছু মনে করিনি, কেন না আমি তোর স্বভাব জানি। তবে অন্য কেউ হলে তোকে দু' কথা শুনিয়ে দিত। ইরা কথাগুলো বলে চুপ করে থাকল।

ঘনিষ্ঠ হয়ে মুখোমুখি সরে এল কমলা। কাজটা সে যে ভাল করে নি তা তার চোখে-মুখে পরিস্ফুট। নিজের চপলা স্বভাবের জন্য তার যে কোথাও স্থান নেই এটা সে ভালভাবে জানে। জেনেও বারবার ভুল করে বসে। সবার বকা খায়। কেউ গালমন্দ করে। তবু নিজেকে সে কিছুতেই বদলাতে পারছে না। গোবিন্দও তার ব্যবহারে তিতিবিরক্ত। প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকে। রেগে গেলে গোবিন্দর চোখ দুটো ছোট হয়ে আসে। কথা জড়িয়ে যায় গলায়। কী বলতে হয় আসল কথাটাই ভুলে যায় তখন। তার মধ্যেও একটা ছেলেমানুষী স্বভাব লুকানো আছে। তা সত্ত্বেও কমলা তাকে মানিয়ে নিতে পারল না। একটা অকাট চাষার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তার। পাথরকে হৃদয় দিলে ভালবাসার মূল্য ফেরত পাওয়া যায় না। সিঁথির সিঁদুর তাকে অনেক সহ্য ক্ষমতা দিয়েছে। সিঁদুরের মর্যাদা দিতে সে এত দিন পড়েছিল মুখ বুজে। গোবিন্দর অত্যাচার সহ্যের সীমানা অতিক্রম করতেই কমলা আর একান্তে সেখানে থাকল না। কীসের জন্য থাকবে সে? দুটো ভাত কাপড়ের জন্য কি মেয়ে হয়ে সে পড়ে পড়ে মার খাবে? দ্বিজপদ তার গায়ে কোন দিনও হাত তোলে নি। স্নেহ-প্রশ্রয়ে মানুষ করেছে। অভাব থাকলেও বুঝতে দেয় নি। হাটের দিন পকেট গরম থাকলে মদ খেয়ে ঘরে ঢুকত গোবিন্দ। মনোমত না চললে গায়ে হাত তুলতে দ্বিধাবোধ করত না সে। মুখ থেকে ছিটকে আসত ভকভকানো মদের গন্ধ। কথায় কথায় বলত, তোর বাপ একটা জুচ্চোর। আমাকে ঠকিয়েছে। সোনা বলে রোল্ডগোল্ড বেঁধে দিয়েছে আমার গলায়। কমলা প্রতিবাদ করলেই হাত চলত এলোপাথাড়ি। বান বন্যা বয়ে যেত গালাগালির। কেঁদে যে হালকা করবে বুকের ভার সে উপায়ও ছিল না। ছুটে এসে ক্যাঁক করে লাথি মারত পেটে। মেঝেতে ফেলে দিয়ে চড়ে বসত বুকের উপর। ভেঙে দিত যত্নে বাঁধা খোঁপা। চুলের মুঠি ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলত, বেরিয়ে যা এক্ষুণি আমার সম্মুখ থেকে। তোর মতন অপয়ার মুখ আমি দেখতে চাইনা। কমলা কাঁদত। নাকের জলে মিশে যেত চোখের জল। বাধা দিতে গেলে আরও ক্ষিপ্র হোত গোবিন্দ। হাতের কাছে যা পেত তাই দিয়ে মারত। এখনও সেই নিষ্ঠুর দাগ পিঠে বয়ে বেড়োচ্ছে কমলা। বাবার কাছে যতটুকু দেখানো যায়, দেখিয়েছে সে। সব কথা বলা যায় না। কিছু অশ্রাব্য ভাষা বুকের হাড়খাঁচায় লুকানো। আজ যেন কমলার বুকের খোদল থেকে সেইসব বিষাক্ত কথাগুলো বেরিয়ে আসতে চায়। অন্যের সুখ দেখে তার বুক জ্বলে, মন পোড়ে।

নিজে যা পায়নি, অন্যে তা পেলে হিংসা হয় বই কী! ইরার সংসারে সে বেশিদিন থাকবে না। সুখের মধ্যে ঘোরাঘুরি করলে তার অসুখ ধরে যাবে। সকাল হলে সে পালিয়ে যাবে। তার নিঃশ্বাসে বুঝি বিষ আছে। নিজের অসুখী মুখের ছবি দেখিয়ে সে অন্যের সুখে কালি ছিটিয়ে দেবে না। সে চলে যাবে। সকালের আলো পৌঁছানোর আগেই চলে যাবে ইরার স্থির অনড় চোখের দিকে তাকিয়ে সে যে কী বলবে হঠাৎ কিছু খুঁজে পেল না কথা হাতড়াল মনের সমুদ্রে। চারদিক অন্ধকারময় আলোয় ভরে আছে। এসময় কারোর মনে দুঃখ দেওয়া অনুচিত। কমলা স্বস্তির ঢেকুর তুলে বলল, ঘরের মানুষ বাইরে গেলে সবারই মন খারাপ করে। তোকে বোঝানোর ভাষা আমার নেই। যে নিজেকে নিজেই সান্ত্বনা দিতে পারে তাকে কিছু বলা মানে তাকেই ছোট করা।

ইরা এতক্ষণ বুঝি ঘোরের মধ্যে ছিল, কমলার কথায় হুঁশ ফিরে এল তার। কমলার হাত ধরে বলল, আমার কথায় তুই কি দুঃখ পেয়েছিস?

না, না দুঃখ পাব কেন? আমার যে দুঃখ পেতে নেই। কমলা কিছু সযত্নে গোপন করতে চাইল, আর তা না পেরে খুব অসহায় চোখে তাকাল।

ইরা বলল, ঘুমিয়ে পড়। এখনও সকাল হতে অনেক বাকি।

কমলা ঘুমাল না, পা ঝুলিয়ে বসে থাকল খাটের উপর। আনমনা চোখ মেলে সে দেখতে চাইল ঘরের চারদিক। ভাড়া ঘরখানা বেশ সুন্দর করে সাজিয়েছে ইরা। সবখানে রুচির ছোঁয়া। পরিচ্ছন্নতায় ভরপুর সংসার। এমন একটা সংসারের স্বপ্ন দেখত কমলা তার সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। গোবিন্দ তার স্বপ্নের সংসারকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে এখন আঙুল কামড়ান ছাড়া তার কোন পথ নেই। যে পথ দিয়ে সে হেঁটে যাবে তার সর্বত্র কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে গোবিন্দ। বরপণ না দিতে পারার জন্য কমলা লাঞ্ছিত হয় বারেবারে। দ্বিজপদর সামর্থ নেই তার কপালে সুখের তিলক এঁকে দেবার।

কথায় কথায় আলো এসে ছিটকে পড়ল ঘরের মেঝেয়। কমলা ফিরে যাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়ল। এখানে থাকলে এই সুখ তাকে পীড়িত করবে। বারবার খুঁচিয়ে তুলবে নিজের ঘা। যা অসহ্য। ভুলে থাকা যায় না।

ইরা অন্তর দিয়ে বুঝতে চাইল কমলাকে, আমাকে ছেড়ে চলে যেতে তোর কষ্ট হবে না?

চমকে তাকাল কমলা। ইরা বলল, মন খারাপ করা স্বাভাবিক। কত দিন ছেড়ে এসেছি তাকে।

কমলা ভেঙে পড়ল না, নিজেকে যথাসম্ভব শক্ত রেখে বলল, আমার আর কারো জন্য মন খারাপ করে না। পিঠের দাগগুলো যদি মিলিয়ে যেত তাহলে আমি শান্তি পেতাম

ইরা আশ্চর্য ভরা চোখে তাকাল। কমলার পিঠে লাঞ্ছনার দাগগুলো সকালের প্রথম আলোয় খোলস ছাড়া সাপের মতো নির্জীব দেখাল। চোখের জল ঝরে পড়া শিশির নয় অশ্রুফুল। ওদের চোখের সামনে দিয়ে ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে গেল একলা পায়রা।

## ।। ১৪ ।।

গ্যারেজের পাশেই নিতাইয়ের চায়ের দোকান, শরীর গরম করার জন্য কানাই হাত মেলে দিয়েছে সদ্য ওঠা আঁচের উপর, হাতের তালু সেঁকে নিয়ে সে বিড়ি ধরাল খোসমেজাজে। দু টান দিতেই গুনগুনিয়ে গান বেরিয়ে এল তার গলা ছুঁয়ে, স্ফুর্তিতে ডগমগ হয়ে বলল, কড়া করে দু-কাপ চা কর তো।

নিতাই হাঁ করে তাকাল, দু-কাপ চা কি কানাই একা খাবে! এই নিয়ে সে পড়েছে ধন্দে, ছোট কেটলিটাতে আরও কাপ তিনেক ঠাণ্ডা জল ঢেলে সে শুধোল, তা কানাই ভায়া, দু কাপ চা কি তুমি একা খাবে?

কানাই হো হো করে হেসে উঠল, পোড়া বিড়িটা ফেলে দিয়ে রগড়ের চোখে তাকাল, দু-কাপ চা কি কেউ একা খায় গো? কলকাতার ট্রিপ আছে। ওস্তাদ আসল বলে। কানাইয়ের কথা শেষ হল না তার আগেই দূর থেকে হাঁক পাড়ল জয়দেব, এ কানাই, এদিকে শোন তো।

কানাই এগিয়ে গেল। এ লাইনে ড্রাইভারের কথা না শুনলে ক্লিনারের কপাল মন্দ। তার রোজগারপাতি সব কিছু নির্ভর করে ড্রাইভারের দয়ার উপর। ড্রাইভার হাতে থাকলে যে কোন সময় মালিকের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে ওরা। কানাই অবশ্য অসৎ পথে হাঁটে না। সে বরাবরের ধর্ম্মভীরু। দুটো বাড়তি পয়সা নিতে গেলে তার হাত কাঁপে। গলার স্বর বদলে যায়। জয়দেব তার এই ভীতু স্বভাবটাকে পছন্দ করে না। গাল-মন্দ করে বলে, অত সৎভাবে থাকলে পেটে মরবি। গায়ে গতরে মাস না জমলে এই খচ্চর লাইনে টিকতে পারবি না বেশিদিন। তাছাড়া সততার আর যুগ নেই। এখন এদিক-ওদিক হাত না চিৎ করলে শুধু শুকনো মাইনেতে পেট ভরবে না। জয়দেবের কথা শুনে থম মেরে যায় কানাই। এই ছেলেটাই কি ক' বছর আগে তেলকালি মেখে নাটবল্টু খুলত আর গাড়ি ধুতো মন দিয়ে! গ্যারেজের মালিক কাজে ভুল হলে ধমকাত, মা-বাপ তুলে গাল দিত তাকে। বেশিদিনের কথা নয় তবু কানাই যেন মেলাতে পারে না কিছুতেই। দুটো পয়সার মুখ দেখলে অনেকেরই মাথা বিগড়ে যায়, রুইমাছকে ভাবতে শুরু করে পুঁটিমাছ।

নিতাই ঠং ঠং করে চিনি গুলছিল কাচের গ্লাসে চামচের শব্দ তুলে, ওর এই শব্দটা শান্ত ভোরে ছড়িয়ে যাচ্ছিল অনেক দূরে। চিনি গোলা শেষ হলে নিতাই ডাকল, ও কানাইভায়া, চা রেডি। তাড়াতাড়ি আসো। ঠাণ্ডা হলে ফুঁ দিলে আর মজা পাবে না।

ভোরের চায়ের স্বাদ বুঝি অমৃত সমান। কাচের গ্লাসে ঠোঁট লাগিয়ে ছ্যাঁকা খেল জয়দেব। আর একটু হলে ঠোঁট পুড়ে যেত। যন্ত্রণাটা হজম করে সে কানাইয়ের দিকে তাকাল, গাড়ির সব রেডি তো?

ঘাড় কাৎ করল কানাই। খুব ভোরে এসে বডি আর টায়ারগুলো জল ন্যাকড়া দিয়ে

ধুয়েছে সে। ইঞ্জিনে জল দিয়েছে। সাইড টায়ারে জল ভরেছে। হেডলাইট জ্বালিয়েছে গাড়ি স্টার্ট করে। সামনে পিছনের আলো সে দেখে নিয়েছে ভাল ভাবে। টায়ারের ফাঁকে খোয়া লেগে থাকলে ক্ষামি হবার ভয়। এতে তার কোন ক্ষতি নেই কিন্তু মালিকের হাফসোল হয়ে যাবে। মালিক বাঁচলে কর্মচারী বাঁচবে এই নীতিতে কানাই বিশ্বাসী। সে যখন মন দিয়ে চা খাচ্ছিল তখন জয়দেব শুধোল, গাড়ির কাগজপত্তর সব কোথায়?

কানাই বলল, মালিক আসবে একটু পরে। সে এসে তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবে

ঠিক আছে, তুই এখন যা। কালী ঠাকুরকে ধূপ দেখিয়ে আয়।

এসব ছোটখাটো কাজ জয়দেব বলার আগেই সেরে রেখেছে কানাই। এ লাইনে তার কম দিন তো হল না, সেও ঝানু মাল। ড্রাইভার হাঁ করার আগেই সে বুঝে যায় মনের কথা। তাছাড়া ড্রাইভারকে চটালে তার চলবে না। বাবা বাছা বলে গাড়ি চালানোটা শিখে নিতে পারলেই তার মুক্তি। খালাসির চাকরিতে একফোঁটা স্বাধীনতা নেই। সে রকম বদ্‌খা ড্রাইভারের পাল্লায় পড়লে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। জয়দেবকে তাই হাতে রাখতে চায় কানাই। ট্রাকে যাবার সৌভাগ্য সবার হয় না। লঙ ট্রিপে কামাই হয় ভাল। মাল আনলোড করলেই ট্রাক থাকে ফাঁকা। তখন হাইরোডে দু-চারটে প্যাসেঞ্জার তুলে নিলে সারা দিনের খরচাপাতি উঠে যায়। ধাবা হোটেলে রেট বেশি। ওখানে নিরামিষ খেলে জাতে ওঠা যাবে না। যে যত মদ মাংস খাবে তার তত খাতির বেশি। লাইনের লোকে তাকে বেশি চেনে।

জয়দেব লঙ ট্রিপ করলে নিজেকে বদলে ফেলে পুরোপুরি। ঘরে যে তার বউ আছে একথা সে ভুলে যায়। কানাই হাজারবার মানা করেও শুধরাতে পারে নি তাকে।

নিতাইয়ের চা দোকানে ভিড় জমছে ধীরে ধীরে। ছ'টার আগেই শুরু হয়ে যা গ্যারেজের কাজ। প্রায় জনা বিশেক লোক শরীরটাকে তাতিয়ে নেবার জন্য চা দোকানে ভিড় জমায়। এই চা দোকানটা আছে বলেই গ্যারেজ কর্মীদের সময় একটু অন্যভাবে কাটে। চা দোকান ওদের সুখদুঃখের আড্ডা স্থল।

কানাই চা খেয়ে কাপ নামিয়ে রাখল বেঞ্চিতে। জয়দেবের ফাঁকা গ্লাসটা সে বা আনল নিজের হাতে। জয়দেব পয়সা দিতে চাইলে বাধা দিয়ে উঠল সে, এ হয় না ওস্তাদ সব দিন তো তোমার খাই। এ খেপেরটা আমাকে দিতে দাও।

— লটারীর টিকিট পেয়েছিস বুঝি? খোঁচা মারল জয়দেব।

কানাইয়ের ঠোঁটে মলিন হাসি, না তা নয় ওস্তাদ। লটারী পেলে আমি কি এ খালাসি কাজ করতাম গো! কবে ছুটি লিখে ঘর চলে যেতাম!

কানাই পয়সা মিটিয়ে হেঁটে এল ট্রাকের কাছে। জয়দেব ট্রাকের চারপাশ ঘুরে এসে বলল, গাড়ি ধুয়েছিস ভাল কথা। কিন্তু মালের উপর ত্রেপল না দিলে চলবে কী করে

— আমি দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু মালিক মানা করল!

— কেন?

কানাই বলল, পুরো ত্রেপল দিয়ে ঢেকে দিলে রোড পুলিশে সন্দেহ করবে। ন্যাশনা হাইওয়েতে এখন খুব ধরপাকড় চলছে। এই তো সেদিন বাঁধাকপির ট্রাকে পনের ব চাল ধরা পড়ল। এখনও রানাঘাট থানায় আটক আছে ট্রাকটা। মালিক ঘুষ দিতে চেয়ে কোনো লাভ হয় নি।

—মাল যদি ভিজে যায়? জয়দেবের কপালে ভাঁজ পড়ল, এত টাকার মাল। কিছু হয়ে গেলে তখন মালিক আমাকেই কথা শোনাবে!

সত্যানন্দ বাবুর খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস। আজও সেই রুটিনে ছেদ পড়েনি। প্রাতঃকালীন ভ্রমণ সেরে তিনি হাজির হলেন ট্রাকের সামনে। হাতে প্লাস্টিকে মোড়ান কাগজপত্তর। জয়দেবকে কাছে ডেকে বললেন, ন্যাশনাল পারমিট এতেই আছে। এই টাকাগুলো রাখো। রাস্তায় লাগতে পারে।

টাকাগুলো নিয়ে না গুনেই পকেটে ঢুকিয়ে রাখল জয়দেব। সত্যানন্দবাবু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, টাকাগুলো গুনে নিলে না যে!

আপনি দিয়েছেন, আমার গোনার কোনও দরকার নেই।

আমিই দিই বা যেই দিক টাকা তুমি সবসময় গুনে নেবে। গুনে নিলে ভুল বোঝাবুঝি হবার সুযোগ থাকে না। সত্যানন্দবাবু জয়দেবের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, সাবধানে যেও। আমার ফোন নাম্বারটা মনে আছে তো? প্রয়োজন মনে করলে ফোন করো। আমি ঘরেই থাকব।

জয়দেব সামনের ডালা খুলে সামনের সীটে গিয়ে বসল। ধূপবাতির গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। সামনের কাচের জলগুলো ভেজা ন্যাকড়ায় মুছে নিয়ে স্টিয়ারিংএ হাত ছুঁইয়ে কপালে ছুঁয়াল সে। বিশ্বকর্মার পুরো শরীর কাচ বাঁধান। পাশে মা কালীর গলায় জবাফুলের মালা। জয়দেব প্রণাম পর্ব সেরে হাত নাড়ল নীচে দাঁড়িয়ে থাকা মালিকের উদ্দেশ্যে। চাবি ঘোরাতেই থরথরিয়ে নড়ে ট্রাক। কানাই বলল, চলো ওস্তাদ, আলো ফুটছে। আর দেরী করা ঠিক হবে না।

কিছুটা ব্যাক করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে পাকা রাস্তায় উঠে এল জয়দেব। রাস্তা ফাঁকা। ট্রাক ছুটল সাঁই সাঁই গতিতে।

রাণাঘাট পেরতেই রোদের রাগ বেড়ে গেল। একভাবে বসে থেকে কনকন করছিল জয়দেবের মাজা। সব থেকে অসুবিধা হচ্ছিল চোখ। কানাইয়ের দিকে তাকাতেই উশখুশিয়ে বলল, হালকা হতে হবে ওস্তাদ, তলপেট ভারী হয়ে গেছে। পজিশন দেখে গাড়িটা দাঁড় করাও।

জয়দেব নীরবে হাসল, সামনেই বংশীর ধাবা। ওখানেই যাওয়া যাক কী বল? কানাই ঘাড় নাড়ল, ঠিক আছে। ওখানেই চলো? ফুল কাপ চা না খেলে মেজাজ আর ঠিক থাকছে না!

মাঠের মাঝখানে শ্যালো মেসিনের ঘর, ভটভট করে শব্দ আসছে জল তোলার, ফিঙে আর শালিক পাখি পোকা ধরবার জন্য সতর্ক চোখ মেলে উড়ছে আলের চারপাশে। তোলা ফসলে সবুজ হয়ে আছে মাঠের গা-গতর। রাস্তার এক পাশে ট্রাকটা দাঁড় করিয়ে লাফ দিয়ে নামল জয়দেব, তার দেখাদেখি বাঁ পাশের দরজা খুলে গা-হাত-পা নাড়াচাড়া দিয়ে নেমে পড়ল কানাই। এখানে তার এই প্রথম আসা নয়, জয়দেবের দৌলতে বার কতক আসতে হয়েছে এখানে। বংশী লোক হিসেবে মন্দ নয়, তার মোটা গোঁফে সদা সর্বদা সূক্ষ্ম হাসির রেখা মিশে থাকে, চেনা জানা না হলেও কথা নেই, খদ্দের দেখলেই তার গোঁফ নেচে ওঠে খুশিতে, তখন গোঁফ থেকে হাসিটা গড়িয়ে নামে ঠোঁটে। নিজেই খাটিয়া পেতে দিয়ে সাদর আপ্যায়ন করে।

বংশীর ধাবা রাস্তা ছুঁয়ে, মোটা খিরিষগাছটা সব সময় ছায়া দেয়, ক্ষুদে ক্ষুদে পাতাগুলো একটু হাওয়া বইলেই শূন্যে ঘুরতে ঘুরতে নেমে আসে মাটিতে। ধাবার সামনে ঘাস চেঁছে বড় পরিসরের উঠোন, দশ-বারোটা খাটিয়া সেখানে সব সময় পাতা আছে। কিছু খাটিয়া দেওয়ালে ঠেস দেওয়া, দরকার না পড়লে ওগুলো দাঁড়িয়ে থাকে চব্বিশ ঘণ্টা। ছুটন্ত ট্রাক বা দূরপাল্লার বাস গেলে ধাবার মাটি কাঁপে থরথরিয়ে, বংশী চেয়ারে বসে ছোট টেবিলটায় হাত দিয়ে চেয়ে থাকে হাঁ-করে। ধাবার সামনে ট্রাক নামলে বংশী কখনও সখনও উঠে যায় নিজে নাহলে কর্মচারীরা যায় খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলতে।

জয়দেব বংশীর মুখ চেনা, সিগারেটে ফুঁক দিয়ে সে যখন মুখোমুখি দাঁড়াল তখন বংশীই চেনা জানা লোকের মতো হাসল, তার হাসির অন্য অর্থ আবিষ্কাব করল জয়দেব। বংশীর ধাবায় রাতে চলে মেয়েছেলের কারবার। জয়দেব যতবার এসেছে কোনওবারই খালি হাতে ফিরতে হয় নি তাকে। এসব ব্যাপারে বংশী ভীষণ উদার, অমায়িক হেসে বলবে, দরদাম সব ঠিক হয়ে যাবে, আগে মাল মনপছন্দ কিনা দেখুন।

দড়ির খাটিয়ায় বসে, গায়ে রোদ লাগিয়ে পরোটা খাচ্ছিল জয়দেব আর কানাই। ডিম তড়কা দিয়ে গিয়েছে ধাবার ছেলেটা। কানাই ধোঁয়া ওঠা তবকায় পরোটা চুবিয়ে আয়েশ করে খাচ্ছিল। জয়দেব পা দোলাচ্ছিল স্ফূর্তিতে। ইরার তৈরী পরোটায় হাত ছুঁইয়ে হাসি পেল তার। বিয়ের আগে এই ইরা ছিল বনের ছাড়া ময়না। এখন সংসারের খাঁচায় ঢুকে সে জয়দেব ছাড়া অপর কাউকে চেনে না। অত ঠাঁটবাট, অহং বোধ সব যে তার কোথায় হারিয়ে গেল ভাবতে বসলে আশ্চর্য হয়ে যায় জয়দেব। ধোঁয়া ওঠা তরকায় সজনে ফুলের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ডিমের ভাঙা অংশ। ওগুলো তুলে তুলে খাচ্ছিল জয়দেব। কানাই মুগ্ধ চোখে তাকাল, বংশীদার ধাবার তরকাটাই স্পেসাল। আমাদের ওখানে এমন চীজ পাওয়া যাবে না।

জয়দেব খুশি হল না ওর কথায়, বাঁকা চোখে তাকাল, আর ঠিক তখনই কানাইকে না দেখে সে দেখতে পেল ললিতাকে। ললিতার পবনে ঝকঝকে রঙের দল্লানো কুঁচকানো শাড়ি, চুল এলোমেলে, পায়ের চপ্পলটাতেও যত্নের কোনও চিহ্ন নেই। রাত জাগা শরীরের ক্লান্তি দূর করতে ও ফুল চা খাচ্ছিল বড় কাচের গ্লাসে, ধাবার ছেলেগুলো ওর দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে চলে গেল। চেয়ার ছেড়ে বংশী এগিয়ে এল ললিতার কাছে। ঘাড় নীচু করে ফিসফিসিয়ে কথা বলে সে আবার ফিরে গেল নিজের জায়গায়। এ সময় লোকজন খুব কম। কয়েকটা দূরপাল্লার ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধার ঘেঁষে। খালাসির হাফ প্যান্ট পরে গাড়ি ধোওয়ার কাজে ব্যস্ত। মাটি ভিজে গেছে চুয়ানো জলে। দুটো কাক ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়েছে জমা জলে।

চা খেয়ে ললিতা ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে তাকাল, জয়দেবের মুখটা খুব চেনা মনে হতে কিছুটা গিয়ে সে আবার দাঁড়াল। চোখ নামিয়ে নিল জয়দেব। সরু, চুপসান মুখখানার দিকে তাকিয়ে দিনের আলোয় তার হৃদযন্ত্রের গতি বেড়ে গেল। বেশিদিনের তো কথা নয়, কলকাতায় মাল নামিয়ে ফেরার সময় এই মেয়েটার সঙ্গে তো আলাপ হয়েছিল এখানে। বংশীই ধাবার পিছনে অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে কথাবার্তা বলে দেয়। মাত্র পঞ্চাশ টাকায় ললিতা যে রাজী হয়ে যাবে এটা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সে রাতে ললিতাকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল, গভীর কোনও দুশ্চিন্তায় ডুবে ছিল সে। কথাবার্তা পাকা হয়ে যাবার প

ললিতাই হাত ধরে টেনে ছিল, চলো। রাত বাড়ছে।

—কোথায় যেতে হবে? ভয়ে ভয়ে শুধিয়েছিল জয়দেব।

ললিতা তর্জনী তুলে দূরের ঝুপড়িগুলো দেখিয়ে দিয়েছিল। ভয়ে ভয়ে ললিতাকে অনুসরণ করছিল জয়দেব। মিনিট দশেক হাঁটার পরেই বস্তির সরু রাস্তাটায় নেমে এসেছিল সে। নেশায় তার মাথা ঠিকঠাক কাজ করছিল না। ললিতা তাকে একটা কুলগাছের নীচে দাঁড় করিয়ে বলেছিল, ঐ সামনের ঘরটা। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।

নেশাচ্ছন্ন চোখে জয়দেব দেখেছিল। ললিতা ঘর থেকে রুগ্ন একজন যুবককে দ্রুত বের করে পাশের ঝুপড়িতে চালান করে দিয়েছিল। তারপর হাতের ইশারায় জয়দেবকে কাছে ডেকে নীচু গলায় বলেছিল, এটা আমার ঘর। বংশীর ধাবায় যদি না পাও তাহলে এখানে এসে আমাকে পেয়ে যাবে। সরাসরি ঘরে এলে আমি চল্লিশ টাকা নিই। বংশীর দশ টাকা তখন তোমাকে দিতে হবে না।

জয়দেব তখন কথা শোনার অবস্থায় ছিল না, ললিতার আবেদন ভরা শরীর তাকে আগুনপোকার মতো টানছিল। তক্তপোষে যাওয়ার আগে তার চোখে ভেসে উঠেছিল রুগ্ন যুবকের শরীর, কাতর চাহনি, অলস হেঁটে যাওয়া।

যে লোকটাকে তুমি পাশের ঘরে রেখে এলে সে তোমার কেউ হয়? জয়দেব কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়েছিল। ললিতার উজ্জ্বল মুখে তখন কালোর ছোপ, অপ্রস্তুত ঢোক গিলে সে কোনওমতে বলেছিল, ও কেউ নয়। তোমার যা করার কর তো।

ললিতা যাকে গোপন করতে চেয়েছিল, রাত কাটিয়ে সকালবেলায় ট্রাক নিয়ে ফেরার পথে তার সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল পিচ রাস্তায়। চার মানুষের খাটিয়ায় চেপে সেই যুবকটাই হাসপাতালে যাচ্ছিল মুমূর্ষু অবস্থায়। দিনের আলোয় ললিতাকে স্পষ্ট দেখেছিল জয়দেব। সে যাচ্ছিল সবার আগে ভয়ার্ত পা ফেলে, তার হাতে বোঁচকা, জলের ঘটি। নেশা ছুটে যাওয়া চোখে ললিতাকে অমন হন্তদন্ত হয়ে যেতে দেখে ট্রাক থামিয়ে ছিল জয়দেব। বলেছিল, খাটিয়ায় সেই কালকের লোকটা নয়?

ললিতা নীরব দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিল, হ্যাঁ, সেই লোকটা! ও আমার স্বামী গো। কাশরোগে ভুগছে অনেকদিন হল। বাড়াবাড়ি হতে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।

কথাগুলো ছুঁড়ে দিয়ে ললিতা আর দাঁড়ায় নি। হনহনিয়ে চলে গেল দৃষ্টির বাইরে। তার মর্মভেদী শব্দগুলো বুকে পেরেক গেঁথে দিয়েছিল জয়দেবের। ফেরার পথে সে কি এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পেরেছিল ললিতার কচি কাঁচা শ্যামলিমায় ভরা মুখখানা? পারে নি। ইরার মুখের দিতে তাকিয়ে আরও বেশি করে তার ললিতার কথা মনে পড়েছে। ট্রাক চালাতে গিয়ে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে সে। কানাই সাবধান করে বলেছে, গুরু, দেখে শুনে চালাও। স্টিয়ারিং হাতে থাকলে বউ কেন, ভগবানের কথাও তুমি ভাববে না। হাইওয়েতে ভুল হলে কোনও ক্ষমা নেই।

বংশীর দাম মিটিয়ে জয়দেব যখন ট্রাকের সীটে ফিরে এল তখন ঝলমলে আলোয় পৃথিবীকে বড় সুখী সুখী মনে হয়। জয়দেবের সিগারেট খাওয়ার মাঝেই সামনের কাচ মুছে দিল কানাই। লম্বা স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে গিট্টি ছাড়াল টায়ারের। চাকায় হাওয়া চেক করে ফিরে সে বলল, ওস্তাদ, সব ঠিক আছে। এবার স্টার্ট দাও।

বংশী চেয়ারে বসে হাত নাড়ল, আবার আসবে মাস্টার। ফেরার পথে যেন দেখা হয়।

জয়দেব হাসি ছুঁড়ে উত্তর দিল কথার। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সেও ব্যস্ত হয়ে উঠল মনে মনে। ট্রাক ছুটল ধুলো উড়িয়ে। পোড়া ডিজেলের গন্ধে ভরে উঠল বাতাস।

মাল আনলোড করার সময় সন্ধ্যা নেমে এল।

কানাই মুখ শুকিয়ে বলল, ভেবেছিলাম আজ রাতে ঘরে ফিরব। তা আর হবে না দেখছি।

জয়দেব ট্রাকটা সাইডিং-এ রেখে গঙ্গাব হাওয়া খাচ্ছিল। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সে বলে নিয়েছে। তার এখন শুধু আরাম করার সময়। ট্রাক খালি হলেই তাকে আবার ফিরতে হবে।

কানাই অসুখী মুখ করে বলল, পুরো দিনটাই একটা ট্রিপে লেগে গেল। ঘরে যে ফিরব তার উপায় নেই। আজ মনে হচ্ছে বংশীর ধাবার হোটেলে রাত কাটাতে হবে

— সে তো ভালই হবে। জয়দেব হাসল. ঘরের রান্না খেয়ে খেয়ে মুখে অরুচি ধরেছে হোটেলের ঝাল মাংস খেয়ে মুখ ছাড়াব।

কানাই কেমন কুঁকড়ে গেল। চট করে সে কোন উত্তর না দিলেও তার মনের কোণে একটা ভয় সব সময় ছোবল মারে। লঙ ট্রিপে এসে জয়দেবের মেজাজ বদলে যায় পুবোপুরি। ঘরে যে তার বউ আছে এটা সে ভুলে যায়। উৎশৃঙ্খল জীবনযাপনে জয়দেবের জোড়া আর কেউ নেই। লাইন হোটেলে ঢুকলেই মদের বোতল সে নেবেই। সেইসঙ্গে মেয়েছেলেও চাই। কানাই বাধা দিয়ে ফেরাতে পারেনি। উল্টে কথা কাটাকাটি হয়েছে তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে জয়দেব। হার মেনে ঝিমিয়ে গিয়েছে কানাই।

ফেরার পথে জয়দেব ট্রাক থামাল বংশীর ধাবায়। কানাই বেজার মুখে নামল ট্রাক থেকে। তার অস্থির চোখ দুটো ললিতাকেই খুঁজছিল। দেখতে না পেয়ে হতাশ দেখাল তাকে। বংশী তাকে আশ্বস্ত করে বলল, মাস্টার, চা দিই?

ঘাড় নাড়ল জয়দেব। চায়ের খিদের চাইতে অন্য খিদেটা তীব্র হয়ে উঠেছে। কানাই এই অস্থিবতার অর্থ বোঝে। ভেতরটা তার জ্বলে গেলেও মুখ ফুটিয়ে সে কোনও কথা বলতে পারে না। হোটেলের চারপাশে টিউব জ্বলছিল, হোটেল চত্বর ছাড়া আর সবখানে অন্ধকার ছড়ানো। দড়ির খাটিয়ায় বসে জয়দেব ছটফটে দৃষ্টিতে চতুর্দিকে তাকাল। আলোর পোকাগুলো উড়ছিল গোল হয়ে। চা নিয়ে এল হোটেলের চাকরটা। যাওয়ার সময় বলল মালিক আপনাকে ডাকছে। ছেলেটা চলে যাবার পর ঘড়ি দেখল জয়দেব। খাটিয়ায় গা এলিয়ে দিয়ে টানটান শুয়ে পড়ল সে। মাথার ভেতর বদ চিন্তাগুলো কুটকুট করে কামড়াল দু-হাতে ভর দিয়ে আবার উঠে বসল সে। চায়ের গ্লাসটা পা দিয়ে ঠেলে উঠে গেল বংশীর চেয়ারটার দিকে। ছোট টেবিলটায় দু-হাত বিছিয়ে সে বলল, রাতটা এখানেই থাকব শরীর আর পারছে না। একটু মৌজ-মস্তি করার দরকার।

বংশী চোখে চোখ ফেলে হাসল, আমি কি মানা করেছি মাস্টার? যতক্ষণ মন চায় থাকুন। এই হোটেল তো আপনাদের—

—সে আমি জানি। জয়দেব গম্ভীব গলায় বলল, আমার ললিতাকে চাই। সে কোথায়

বংশী ফ্যাসফেসে গলায় বলল, ললিতা আর ও ধান্দা করে না। ওর বরটা মা

াওয়ার পর মন মেজাজ বিগড়ে গেল। হোটেলের কাজ ছেড়ে দিয়ে ও এখন ঝুপড়িতে াকে।

—আমি ওর ঝুপড়িতে যেতে চাই। জয়দেব জেদ ধরল, ওর জন্য আমার এখানে াসা। মদ তো চা দোকানেও পাওয়া যায়। তার জন্য লাইনের হোটেলে আসার কোনও বকার হয় না।

—তা ঠিক। তবে—। বংশীর কথা আটকে গেল। জয়দেব তার মুখের উপর উৎসাহ রে ঝুঁকে পড়ে বলল, ললিতা আর আগের মতো সুস্থ নেই। ওর গতরে রোগ ঢুকেছে। ডলি ইনকেজশন নিতে হয় তাকে!

—ওর কী হয়েছে?

বংশী পান চিবানোর মতো মুখ করে বলল, বাজারের মেয়েদের যা হয় ওর তাই য়েছে। ও রোগ সারে না।

ললিতার বদলে পদ্ম এল। সে শুধু নামেই পদ্ম, তার গায়ের রঙ গোবরের মতো। ুখে পাউডার মাখার দরুন কালো মুখটা ছাইঘষা হাঁড়ির মতো দেখাচ্ছিল। সে এসে মোটা ঠাঁট নড়িয়ে হাসল। চোখে চোখ ফেলে বলল, তাড়াতাড়ি করুন গো, এক খদ্দেরে আমার পট ভরবে নি। বালবাচ্চার সংসার, দু পয়সা না কামালে চোখের নীচে কালি ফেলে কী লাভ?

জয়দেব ওর প্রাপ্য টাকা মিটিয়ে দিয়ে মাংস দিয়ে মদ খেল ভরপেট। কানাই তাকে ঙ্গ দিল না, দূরে সরে গিয়ে বলল, ওস্তাদ তোমার এতটা নীচে নামা ঠিক হচ্ছে না। াজ রাতে তুমি যা করছ কাল ভোরে এর জন্য তোমাকে আফশোষ করতে হবে।

—তুই চুপ কর। জয়দেব চোখ লাল করে ধমকে উঠল, এ লাইনে এসব একটু আধটু য়েই থাকে। কোন শালা ধোয়া তুলসীপাতা আছে বল তো? সবাইকে আমার জানা াছে।

আলো পেরিয়ে টলোমলো পায়ে আঁধারের দিকে এগিয়ে গেল জয়দেব। ঢলে পড়লে পদ্ম তার হাত ধরে সোজা করে দিচ্ছে, আর দাঁত টিপে টিপে হাসছে। টুকরো কথা ভেসে আসছে হাওয়ায়। রাস্তা পেরিয়ে ওরা দুজনে সোজা চলে যায় বস্তির দিকে। কানাই কী মনে করে পিচ রাস্তা অবধি দৌড়ে এল, তারপর দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফিরে এল। জয়দেব না ফেরা পর্যন্ত সে কোথাও যেতে পারবে না। চিন্তা ঘিরে থাকবে তাকে। বিপদ আপদ ঘটে গেলে শুধু মালিকের কাছে নয় ইরার কাছেও জবাবদিহি করতে হবে তাকে। বংশীর হোটেলে ফিরে না গিয়ে কানাই চলে গেল ট্রাকের কাছে। ট্রাকের ধাতব শরীরে হাত রেখে অনেকক্ষণ ধরে সে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। একসময় দরজা খুলে সে গিয়ে বসল সামনের সীটে।

জয়দেব যখন ফিরে এল তখন ভোর হয়ে আসছে। হোটেলের কুকুরগুলোও শুয়ে পড়েছে ক্লান্ত হয়ে। মাঝে মধ্যে রাস্তা কাঁপিয়ে ট্রাক চলে যায়। হেডলাইটের তীব্র আলোয় ঝলসে যায় চারপাশ। সেই আলোয় পদ্মকে একটা গাছের নীচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কানাই। জয়দেব কোনও কথা না বলে উঠে এল সীটে। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে সে যেন তার পুরনো মেজাজ ফিরে পেল। জড়ানো গলায় কানাইকে বলল, আজ রাতের

কথা বহু দিন মনে থাকবে। পদ্ম মেয়েটা খারাপ নয়। মদের চাইতেও এর নেশা
আরও বেশি।

—ছিঃ ওস্তাদ, মুখে এমন কথা মানায় না। কানাই মুখ ঘুরিয়ে নিল, বিয়ের আ
যা করেছ সেগুলো মেনে নেওয়া যায়। এখন যা করছ এগুলো ঠিক নয়। কাউকে ঠকা
পাপ।

—পাপ পুণ্যের হিসাব আমাকে শেখাস নে। আমার যা মন চায় তা আমি কর
আমি কারোর কাছে দাসখৎ লিখে দিই নি যে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব। আগুন উগ
জয়দেব শ্বাস নিল ঘন ঘন। কানাইকে শাসন করে বলল, আমার মামলায় তুই ন
গলাবি না। ওসব আমার পছন্দ নয়। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমার গাড়ি থেকে তো
নামিয়ে দেব। তখন বুঝবি।

কানাই হতবাক।

জয়দেব স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে বলল, গাড়িতে থাকলে তোকে আমার কথা শুনতে হ
বেশি তেড়িবেড়ি করলে আমি তোকে নামিয়ে দেব।

—সে তুমি আমাকে নামিয়ে দিও। তোমার সব কথা আমি মেনে নেব। কানাই অ
হয়ে উঠল, তবে দোহাই তোমাকে, আজ তুমি গাড়ি চালিও না। তোমার হাত কাঁপ
কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। যে কোন সময় বিপদ ঘটে যেতে পারে।

—আরে হাট বে! ঠেলা দিয়ে কানাইকে সরিয়ে দিল জয়দেব। জোরে ট্রাক ছু
এক সময় স্টিয়ারিং থেকে হাত উঠিয়ে নিল সে, গলা ছেড়ে গান ভা
বাতাসে। কানাই ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে তাকাল, এ কী করছ ওস্তাদ? মেন রাস্তায় অ
করো না।

—তুই থাম তো। জয়দেব কানাইয়ের দিকে তাকাল না, ভোরের বাতাস গায়ে ম
নিয়ে সে স্ফূর্তিতে ডগমগিয়ে উঠল, এই ট্রাক আমার প্রথম পক্ষ। এ আমাকে জীব
ধোকা দেবে না। মুখ নীচু করে স্টিয়ারিংয়ে চুমু খেয়ে গিয়ার চেঞ্জ করল সে। এক্সলে
চাপ দিয়ে স্পীড বাড়াল আরও। হাওয়া কেটে ট্রাক ছুটছে। হেলে পড়ে, দুলে ওঠে। লাফি
ওঠে। বিকট শব্দ হয়। তবু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই জয়দেবের। দেখেশুনে ভয় পেয়ে চিৎ
করে উঠল, ওস্তাদ, গাড়ি থামাও। অত স্পীড ভাল নয়।

—স্পীড না থাকলে গাড়ি চালিয়ে মজা নেই। জয়দেব হেসে উঠল।

কানাই কাকুতি মিনতি করে বলল, তাহলে স্টিয়ারিং আমাকে দাও।

জয়দেব ভ্রূক্ষেপহীন ভাবে সাইড দিল ছুটে আসা ট্রাককে, কোন মতে সামলে ি
গালি ছুঁড়ে দিল, শালা কানা, দেখতে পায় না! দেব ঢুসিয়ে, তখন বুঝবে। জোরে, আ
জোরে ছুটতে লাগল গাড়ি। এলোমেলো সাইড নিতে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বি
ট্রাকের গায়ে জোরে ধাক্কা মারল জয়দেব। ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়ল সামনের ব
দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটা কিছুটা পিছিয়ে গেল ধাক্কায়। বুকের কাছে চেপে বসা স্টিয়ারি
কোনমতে সামাল দিল জয়দেব। বুকের হাড় ভাঙল না কিন্তু চোখ দুটোয় কাচ
রক্তে ভেসে গেল মুখ। জ্ঞান হারানোর আগে জয়দেব অস্ফুটে বলল, কানাই, আম
বাঁচা! কানাইয়ের কপাল ফেটে রক্ত চুয়াচ্ছিল অনবরত। হাঁটুর কাছটা হয়ত ভেঙে

তার, তবু সে অস্ফুটে ডাকল, ওস্তাদ, ও ওস্তাদ।

জয়দেব সাড়া দিল না, ওর দু-চোখ তখন রক্তমাখা।

॥ ১৫ ॥

কপালে না থাকলে ঘি ঠকঠকালে হবে কী।

দুঃসংবাদটা শোনার পর ইরার চোখের ধারা আর থামছিল না, গুরুপদর মুখের দিকে তাকিয়ে সে সশব্দে কেঁদে উঠল, বাবা, আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেল।

গুরুপদ মেয়ের মাথায় স্নেহের হাত রাখল, কাঁদিস নে, বিপদের দিনে মাথা ঠিক রাখ। জয়দেবের কিছু হবে না, ও ঠিক ভাল হয়ে উঠবে।

মেয়েকে সাহসে বুক বাঁধতে বললেও মনে মনে ভেঙে পড়েছিল গুরুপদ। কল্যাণী হাসপাতালের চোখের ডাক্তার তাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, আশা খুব কম। পেসেন্টের চোখ দুটো মনে হয় আর ঠিক হবে না। হেভি ইনজিওরড। দিন পনের না গেলে সঠিকভাবে কিছু বলা যাবে না।

ইরার কাছে ডাক্তারবাবুর কথাগুলো গোপন রেখেছে গুরুপদ, শুধু সত্যানন্দবাবু আর কানাই জানে জয়দেবের চোখের কথা।

ইরা হাসপাতালের বাইরে এসে শুধোল, বাবা, ওর চোখ দুটো ভাল হবে তো।

গুরুপদর জিভ উল্টাচ্ছিল না তবু কোনমতে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাল হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবু বলেছেন দিন পনেরর মধ্যেই ওকে ছেড়ে দেবে।

হাসপাতাল থেকে ঠিক আড়াইমাস পরে ঘরে ফিরল জয়দেব। ওর চোখে কালো চশমা, হাতে লাঠি। ইরার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, যখন জয়দেব বিমর্ষ গলায় বলল, আমি আর কোনদিনও তোমার মুখটা দেখতে পাব না। ভগবান আমাকে পাপের সাজা দিয়েছে। আমি পাপী। আমার মৃত্যু হলেই বুঝি ভাল হতো।

ইরা জয়দেবের হাতটা শক্তভাবে ধরেছিল, গলায় কাঁপন তুলে বলল, সবই আমাদের ভাগ্য! কী আর করব বলো?

জয়দেব লাঠিটা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে, আফশোষ ঝরে পড়ল গলায়, ভগবানের মার দুনিয়ার বার। সে চেয়েছিল আমি ভেসে যাই। তাঁর ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। এবার আমাকে নিয়ে মজা লুটবে। তবে আমি কারোর হাতের পুতুল হয়ে বাঁচব না। এ জীবন যদি অসহ্য লাগে তাহলে নিজের পথ আমি নিজেই দেখে নেব। ইরার ভয়ার্ত চোখমুখ। জয়দেবের ইঙ্গিত তার শ্বাসরুদ্ধ করে দিয়েছে। মুখ থেকে হারিয়ে গিয়েছে লাবণ্যময়তা। এই আড়াই মাসের যাতায়াত উৎকণ্ঠায় তার শরীরে আর আগের জোর নেই। কানাই প্রায়ই আসত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্য। সে বেচারীরও কম কষ্ট হয় নি। ইরার কাছে সে জয়দেবের কুকীর্তির কথা গোপন করে গিয়েছে। একটা সংসার ভেঙে

যাক, ভেসে যাক সে এটা চায় নি। জয়দেবের ভবিষ্যৎ নিয়ে কানাই রীতিমত চিন্তিত। ড্রাইভারী লাইনে চোখ কান হাত পা এবং বুদ্ধির খেলা চলে। সবার আগে চোখের প্রয়োজন। সেই অমূল্য চোখ দুটোই খোয়া গিয়েছে জয়দেবের। অনেক পরে ইরা যখন এ সংবাদ শুনেছে তখন সে আর নিজের মধ্যে নেই। কেঁদে কেঁদে নিজের চোখ দুটোই সে নষ্ট করে ফেলতে চেয়েছে। নিজের চোখ সে উপড়ে দিতে চেয়েছে জয়দেবের জন্য। ডাক্তার তার মনোভাব বুঝতে পেরে বলেছেন, ওর চোখের শিরাগুলো শুকিয়ে গিয়েছে। এ কেসে আই ডোনেশন করেও কোনও লাভ নেই। সেরকম যদি সুযোগ থাকত তাহলে আমি আপনাদের বলতাম।

খড়কুটো ধরে বাঁচতে চেয়েছিল ইরা, তার শেষ ইচ্ছাটুকুও ধুলিসাৎ হল ডাক্তারবাবুর কথায়। চা দোকানে বসে ইরা সেদিন মনের দুঃখে কাঁদল। কানাই ব্যথাভরা গলায় বলল, তোমাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই। তবে দৃষ্টি হারিয়ে গেলে মানুষ যে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে তা ঠিক নয়। আমি অনেককেই দেখেছি যারা জন্ম থেকেই অন্ধ। অন্ধ বলেই যে তারা সংসার জীবনে অসুখী তেমন নয়। তোমার অনেক দায়িত্ব বেড়ে গেল বোন। চেষ্টা করো তোমার চোখ দিয়ে ও যেন আগের মতো দেখতে পায়।

যে কথা সহজভাবে বলা যায় তা পালন করা কি অত সহজ? চোখের জল মুছে নিয়ে ইরা প্রশ্ন করেছিল কানাইকে। স্বল্প শিক্ষিত কানাই এই জটিল প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারে নি। মুখ কাচুমাচু করে সে বলেছিল, আমি তোমার মতো লেখাপড়া জানি না। তবে এটুকু বুঝি মানুষের অসাধ্য কোনও কাজ নেই। একটু চেষ্টা করলেই তুমি সব কিছুকে সহজভাবে মানিয়ে নিতে পারবে।

আজ বেশি করে ইরার মনে পড়ছে কানাইয়ের কথাগুলো। জয়দেবের ছায়াসঙ্গী সে তার যে এখন কী করণীয় তা সে নিজেও ভালভাবে জানে না। বিপদের সময় তার মাথা ঠিক থাকে না। অনেক ভেবেও সে তার পথ ঠিক করতে পারেনি। শুধু সান্ত্বনার শব্দে তার চোখ ভার হয়েছে, মাথার ভেতর ঘুরপাক খেয়েছে অন্ধকার জড়ানো দিনগুলো আগত দিনগুলোকে কীভাবে স্বাগত জানাবে! কীভাবে বয়ে নিয়ে যাবে সংসার? মানুষের সহানুভূতিতে কি একটা সংসার দীর্ঘদিন চলতে পারে? সব কিছুর মতোই দায়-সহানুভূতি একদিন ফুরিয়ে যাবে। তখন কোথায় দাঁড়াবে ইরা, কে দেবে ছায়া? আড়াই মাস ধরে সেই কথা ভাবতে ভাবতে সে এখন বড় ক্লান্ত, খাওয়া দাওয়ার মন নেই, হাসি মুছে গেছে তার গোলাপী ঠোঁট থেকে। কতদিন সে বড় আয়নার সামনে দাঁড়ায়নি, সিঁদুরটুকু পরেছে আন্দাজে, পাতা ঝরে যাওয়া গাছের মতো বিবর্ণ মুখ করে তার এখন বেঁচে থাকা।

হাসপাতালের গেট পেরিয়ে ওরা যখন বড় রাস্তায় উঠে এল তখন রোদে ঝলমল করছে চারপাশ। চোখের কালো চশমাটা খুলে জয়দেব যেন কী দেখতে চাইল প্রাণভরে ব্যর্থতায় হাঁপিয়ে উঠে সে আন্দাজে ইরার মুখের দিকে তাকাল। ইরা লক্ষ্য করল জয়দেবের চোখের কোলে টলটল করছে ক'ফোঁটা জল। পাতা ভিজে জড়িয়ে গেছে পরস্পর। বুজে আসা চোখের কোণে যে জল জমতে পারে ইরার তা জানা ছিল না। চোখের জল বড় ছোঁয়াচে। ইরার চোখও ঝাপসা হয়ে এল নিমেষে। এ সময় কিছু বলা মানে ধরা পড়ে যাওয়া। ইরা কোন কথা না বলে হাত উঁচিয়ে ইশারায় রিকশা ডাকল। জয়দেবের হাতটা

ধরতেই ঝাঁকুনি খেল সে, ঝুলে থাকা দোদুল্যমান চোখের জল খসে পড়ল জয়দেবের খসখসে হাতে। চোখের জলের ছোঁয়ায় বিচলিত জয়দেব বলল, আমি জানি তুমি কাঁদছ। কেন কাঁদছ তাও আমি জানি।

ইরা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট চোখে তাকাল, নিজেকে যথাসম্ভব গুছিয়ে নিয়ে বলল, আমি কোন দুঃখে কাঁদতে যাব? আমার ঠাণ্ডা লেগেছে চোখে। সময়ে অসময়ে জল কাটছে।

তাহলে তোমার গলা এত কাঁপছে কেন? জয়দেবের ভাঙাচুরো মুখে সন্দেহের ডালপালা ছড়িয়ে গেল, আমার চোখ নেই বলে তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

ইরা নিঃশব্দে ঢোক গিলল, রিকশা এসে গেছে। আমাদের স্টেশনে যেতে হবে।

—তুমি যাও। আমি যাব না। কাঠিন্য প্রকাশ পেল জয়দেবের গলায়, এখন থেকে তুমি যদি আমার কাছে মিথ্যে কথা বলো তাহলে আমি কাকে নিয়ে বাঁচব। কার হাত ধরে হাঁটব?

ইরা সশব্দে হেসে উঠল, তোমার কাছে গোপন করার মতো আমার আর কোনও কিছু অবশিষ্ট নেই। আমার সব কিছুই তো তোমার। হাসি আনন্দ চোখের জল সব কিছু। জয়দেব অভ্যাসমতো আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকাল, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, এখন থেকে তুমি যা বোঝাবে তাই আমাকে বুঝতে হবে। এখন থেকে তোমার দয়া নিয়ে আমাকে বেঁচে থাকতে হবে।

ইরা রাগল না, নিজেকে সংযত করে বলল, দয়া নয় তুমি আমার ভালবাসা নিয়ে বাঁচবে। আমিও তোমার ভালবাসা আঁকড়ে পথ চলব। তোমার চোখের দৃষ্টি হারিয়ে গেলেও মনের দৃষ্টি তো সজাগ আছে। আমার ভুল হলে তুমি আমাকে শুধরে দিও।

পাতা ঝরার সময় এখন, গাছেরা রুখুশুখু চেহারায় রাস্তা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ছায়া যতটুকু আছে তা মাথা বাঁচানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। চেনা পথ নয়, তবু ইরার মনে হয় কতদিনের চেনা। হাওয়া আসে দূরান্ত থেকে, হাওয়ায় জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট অক্সিজেন বিদ্যমান। ইরা মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। জয়দেবকে ঘিরে তার জীবন, তাকে বাদ দিয়ে অস্তিত্বের সংকটে পড়বে সে। জয়দেব বুঝতে পারে না ইরার মনের দ্বন্দ্ব। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রিকশায় উঠে আসে সে। কতদিন পরে পাশাপাশি বসল সে। ইরার গায়ের স্পর্শে আবার নতুন করে রোমাঞ্চিত হল সে। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করল ইরার হাত, কাতর হয়ে এল চোখ, নড়ে উঠল ঠোঁট, আমাকে ভুলে যেও না। আমি তোমার সুখের সংসার তছনছ করে দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করো।

বাসা বাড়িতে ফিরে আসতে সন্ধ্যে নামল। জয়দেব যেন পরের ঘরে ঢুকছে এমন সংকোচভরা তার হাঁটাচলা। ইরা হাত ধরে তাকে নিয়ে এল ঘরে। অন্ধকারে ঢাকা পড়ে আছে জগত সংসার। গোলা পায়রাগুলো আজ কোথায় মুখ লুকিয়েছে কে জানে। ইরা বাইরে এসে দেখতে চাইল পায়রাগুলোকে। অন্ধকারে দেখতে পেল না সে।

গুরুপদ এসেছে কালীগঞ্জ থেকে, সঙ্গে কানন। বিপদের দিনে মেয়ের পাশে না দাঁড়ালে অধর্ম হবে। কাননকে জোর করে সঙ্গে এনেছে সে। জয়দেবের ভেঙে পড়া বিধ্বস্ত চেহারা দেখে গুরুপদ কষ্ট পেলেও তা সহ্য করে নেয়। মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তায় তার ঘুম উধাও। জয়দেবকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা নেই তার। এ সময় ইরাও যদি ভেঙে পড়ে তাহলে দু'কূলই হারিয়ে যাবে। আসার সময় কাননকেও বড় বেশি চিন্তিত দেখাল। ইরার সংসার যে তার

ঘাড়ে এসে পড়বে এমন ইঙ্গিত সে আগে থেকে পেয়ে গিয়েছিল।

দু-চোখের দৃষ্টি হারিয়ে ছেলেটা কোথায় দাঁড়াবে? কাননের প্রশ্নে গুরুপদ ক'মুহূর্ত চুপচাপ ছিল। এই প্রশ্নটা সে নিজেকে করেছে হাজার বার। কোন সদুত্তর সে পায় নি। ইরার ভবিষ্যৎ এখন অনেকটাই যে তার উপর নির্ভর করছে। ঠেলে দেবে, অস্বীকার করবে তারও উপায় নেই। তাহলে ভেসে যাবে মেয়েটা। বাপ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। যতদিন বেঁচে আছে সে ততদিন ইরার গায়ে কোনরকম আঁচড় লাগতে দেবে না।

কানন বলেছিল, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন আর পিছন ফিরে তাকানোর কোনও দরকার নেই।

তুমি কী বলতে চাইছ?

কাননের যেন আগে থেকেই ভাবা ছিল, ইরার আর ওখানে থাকার দরকার নেই। ও আমাদের চোখের সামনেই থাকুক। আমাদের যদি ফেন ভাত জোটে তার থেকে ওরাও দুটো খাবে। মেয়ে জামাই তো পর নয়, ওরা খেলে আমাদের কমবে না।

আমি এই কথাটাই শুনতে চাচ্ছিলাম। তুমি আমার বুকের ভার হালকা করে দিলে। গুরুপদ যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পাঠ চুকতে গুরুপদই কথা উঠালো, আমি সত্যানন্দবাবুর সঙ্গে কথা বলেছি। জয়দেবকে দেওয়ার মত কাজ ওনার অফিসে কিছু নেই। বাস লাইনে ইরা কোনও কাজে লাগবে না। তাই আমি ভাবছি তোমাদের দুজনকেই আমার সঙ্গে নিয়ে যাবো।

জয়দেব ছটফটিয়ে উঠল, তা হয় না বাবা। আপনার অবস্থা তো আমি জানি। তাছাড়া এ তো আমার এক মাসের সমস্যা নয়, যতদিন বাঁচব দৃষ্টি হারিয়ে আমাকে বাঁচতে হবে। আমার বোঝা আপনি কেন জীবনভর বইবেন?

—ছেলে-মেয়ে বাবা-মা'র কাছে কোনদিন বোঝা হয় না। গুরুপদ বুঝিয়ে বলল, আমার যতদিন চাকরি আছে ততদিন তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। তোমরা আমার কাছেই থাকবে। সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেবে।

জয়দেবের হাসপাতালে ভর্তি হবার সংবাদ পেয়েই ছুটে গিয়েছিলেন সত্যানন্দবাবু চিকিৎসার যাবতীয় খরচ তিনিই দিয়েছেন। ইরাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন, তোমার কোন ভয় নেই মা। আমি থাকতে জয়দেবের কোনও ক্ষতি হতে দেব না। দরকার হলে ওকে নিয়ে আমি ভেলোরে চলে যাব।

ভেলোরে আর যেতে হয়নি তাকে, হাসপাতালের ডাক্তারই বুঝিয়ে বললেন, নিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই। এতে শুধু হ্যারাসড হবেন, কাজের কাজ কিছু হবে না।

জয়দেবের চিকিৎসার খরচ জোগাতে গিয়ে সত্যানন্দবাবু হাঁপিয়ে ওঠেন নি, এটাই ইরার সৌভাগ্য। তবে একটা মানুষের কাছে কতদিন আর হাত পাতা যায়? বিবেক দংশনে রীতিমতো আহত হোত ইরা। কিন্তু উপায় নেই, নিতেই হবে। নাহলে এত টাকাই ব আসবে কোথা থেকে? বাড়িওয়ালাও মানুষ ভাল। বিপদ দেখে তিনিও ভাড়ার কথা মুখে আনেন নি। মানুষের সহযোগিতা ছাড়া ইরা এতদূর আসতে পারতো না। এখন তার জীবনের গতিপথ বদলে যাচ্ছে! জয়দেব দৃষ্টি হারিয়ে জবুথবু মাংসের দলা। মানসিক

আঘাত সে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। অনিশ্চিত জীবন তাকেও কম দুর্ভাবনায় ফেলেনি। হাসপাতালের বেডে শুয়ে রাতের পর রাত তার কেটে গিয়েছে অনিদ্রায়। তবু কোন সমাধান সূত্র তার চোখের সামনে ঝলসে ওঠে নি। বেঁচে থাকতে গেলে তাকে ইরার হাত ধরেই বেঁচে থাকতে হবে। ইরার সাহায্য ছাড়া তার জীবন অচল। লতানে শিমডগার যেটুকু জোর আছে সেটুকু জোরও তার নেই। তার জীবন বুঝি মাড়িয়ে যাওয়া ঘাসের মতো।

গুরুপদ কিছু শোনার জন্য ইরার দিকে তাকাল। ইরার বিপন্ন চোখ যেন বলে দিল, বাবা, আমার মাজা ভেঙে গেছে, আমি আর উঠে দাঁড়াতে পারব না। জয়দেব হারবার ছেলে নয়, সে মচকাবে তবু ভাঙবে না এমন অনমনীয় গলায় বলল, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে আমি ঘরজামাই হয়ে থাকব না। ইরা যদি যেতে চায়, ওকে নিয়ে চলে যান। আর কিছু না হোক আমার দ্বারা ভিক্ষে করাটা হবে। চেয়ে-চিন্তে একটা পেট ঠিক চলে যাবে।

—আমরা কি মরে গিয়েছি? গুরুপদর গলা অভিমানে ভার হয়ে এল, আমরা থাকতে তুমি যদি ভিক্ষে কর, সেটা কি ভাল দেখায়? তুমি না গেলে ইরাও যাবে না। আমার কাছে ইরাও যেমন, তুমিও তেমন।

মেনকা ওদের কথা শুনছিল, গুরুপদকে সমর্থন করে সে বলল, জয়দেব, তুমি আমার ছেলের মতো। তোমাকে আমি খারাপ যুক্তি দেব না। তোমার শ্বশুরমশায় যা বলেছেন সবই তোমার মঙ্গলের জন্য বলেছেন। তুমি ওনার কথা মেনে নাও। এতেই তোমার ভাল হবে।

জয়দেব কিছু বলতে যাচ্ছিল, কানন তাকে থামিয়ে দিল, মাথা গরম করো না বাবা, কালই আমাদের সাথে চলো। এখানে থাকলে আমরা চিন্তায় থাকব। আমার ঘরে যদি থাকতে অসুবিধা হয় তাহলে ওখানেই ভাড়া বাড়িতে থেকো। দায়ে অদায়ে আমরা তোমার পাশে থাকতে পারব।

জয়দেব মাথার চুল চেপে ধরে বসে থাকল চুপচাপ। ইরার মুখে কোন কথা নেই। মৌনতাই বুঝি সম্মতির লক্ষণ।

ইচ্ছা অনিচ্ছার দোলা চলে সারারাত দু-চোখের পাতা এক হল না জয়দেবের। ডাক্তার তাকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন, ঘুমের যাতে ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকেও খেয়াল রাখতে বলেছেন। ইরা বাইরে যাবাব সময় দেখল জয়দেব বালিশে মাথা দিয়ে চুপচাপ ছাদের দিকে চেয়ে আছে। তার চোয়াল বসা গালে হ্যারিকেনের আলো ছিটকে এসে লেগেছে। দুঃশ্চিন্তায় লীন হয়ে আছে মানুষটা। মশারি উঠিয়ে ইরা ক'পা গিয়ে আবার ফিরে এল। মুখ নামিয়ে জয়দেবের মাথার কাছে নিয়ে গেল শরীর, ফিসফিসিয়ে বলল, তোমার কষ্ট আমি বুঝি। কালীগঞ্জে যদি তোমার যেতে মন না চায় তাহলে যেও না। আমি এখানে খেটে-খুটে ঠিক দুটো পেটের ভাতের যোগাড় করে নেব।

—কী করবে তুমি? দু-হাতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসতে চাইল জয়দেব, না পেরে আবার শরীর এলিয়ে দিল বিছানায়, তুমি মেয়েমানুষ। কোথায় যাবে ভাতের যোগাড় করতে?

—ঘরে বসে ঠোঙা বানাব আমি। ইরা দৃঢ় গলায় বলল, অনেক মেয়েই সংসার চালায়,

তাহলে আমি কেন পারব না! ঠিক পারব। তুমি পাশে থাকলে আরও বেশি করে পারব
জয়দেব খুশি হতে পারল না ইরার কথায়, হয়ত ভরসা পেল না, দু-চোখে আঙু
চেপে সে ধীরে ধীরে বলল, আমি ভেবে দেখলাম আমাদের ওখানে যাওয়াই ঠিক হবে
বাবা-মা আমাকে শুধু জামাই হিসাবে দেখে না, আমি ওদের কাছে বড় ছেলের মতো
আজ আমার দৃষ্টি নেই, আমি অক্ষম। এ সময় যদি ওদের পাশে থেকে বিন্দুমাত্র কা
লাগতে পারি তাহলে জানব অনেক করেছি। তুমি ওদের সংসারে খাটবে। মায়ের বয়
হয়েছে। তোমাকে পাশে পেলে তার সাহায্য হবে।

ইরা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না, আনন্দের আতিশয্যে তার ঠো
জোড়া কেঁপে উঠল, চোখের কোণ ভিজে গেল, গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলল, যা বল
একি তোমার মনের কথা?

—হ্যাঁ, আমি অনেক ভাবনা চিন্তা করেই একথা বললাম। জয়দেব ইরাকে ছুঁয়ে থাক
আলতোভাবে ওর হাতটা বুকের কাছে এনে বলল, সব জীবনে মনে হয় পরীক্ষা দি
হয়। আলো থেকে অন্ধকারে গেলে চোখ সয়ে নিতে কিছুটা সময় নেয়। আমিও ম
হয় এই ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে উঠব। সব দিন যে মানুষের সমান যায় না তার প্রম
তো আমি।

—তুমি ঠিকই বলেছ! ইরার মুখের উপর তৃপ্তির রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল, স
দিন যে আমাদের দুঃখে কাটবে তা কোনও দিন হতে পারে না। আমি জানি এই অন্ধক
সরে যাবে। তোমার মুখের হাসি আমি আবার দেখতে পাব। দশটার বাসে যাওয়ার স
ঠিক হল।

কানাই সংবাদ পেয়ে ছুটে এল জয়দেবের কাছে। ওর হাত ধরে কান্নায় ভেঙে পড়
সে, ওস্তাদ তুমি চলে যাচ্ছো আমার বুকের পাঁজরা গুঁড়ো করে দিয়ে। এই অধম তোম
কাছে অনেক কিছুই পেয়েছে কিন্তু সে তোমাকে কোন কিছু ফিরিয়ে দিতে পারে নি
সংসারে কিছু মানুষ শুধু দেবার জন্য আসে, কিছু মানুষ দু-হাত ভরে তা কুড়িয়ে নে
আমি সেই অধমদের দলে। তবে যদি কোনদিন আমার দরকার হয় জানিও। শুধু র
নয়, দরকাব হলে আমার চোখ দুটো তোমাকে উপড়ে দেব।

—সে আমি জানি কানাই। জয়দেবের কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে এল, আমাকে ভুলে য
না। মাঝেমধ্যে খোঁজখবর নিস। টেম্পু লরীর আওয়াজ শুনে আমার যে যন্ত্রণা হবে, তে
মুখের কথা শুনলে তার অনেকটাই দূর হয়ে যাবে। আমার এই হাত দুটো স্টিয়া
ঘোরানোর জন্য সব সময় ছটফট করে। আমার মনে হয় আমি যেন বিছানায় নয়, গাড়ি
সীটে শুয়ে আছি। তুই ধূপ জ্বেলে দিয়েছিস বিশ্বকর্মার কাছে। সুগন্ধে নাক ভরে যা
আমার। হাইওয়েতে হর্ণ দিয়ে দূর পাল্লার ট্রাক ছুটে যাচ্ছে। হাওয়া এসে ঝাঁপিয়ে পড়
বুকে।

—ওস্তাদ, তুমি চুপ করো। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

—চুপ করে তো থাকতে চাই, কিন্তু পারছি কই? জয়দেব নিজের প্রতি কটাক্ষ ক
হেসে উঠল, চোখ দুটো যদি না চলে যেত তাহলে বুঝি এমনটা আমার কোনদিনও ম
হোত না। আজ চোখ নেই, মন দিয়ে সব দেখছি। মনের দেখায় আর চোখের দেখা
কত ফারাক।

বাস ছেড়ে দেওয়ার আগে কানাই পকেট থেকে বের করে আনল এক প্যাকেট সিগারেট, জয়দেবের হাতে তুলে দিয়ে বলল, ওস্তাদ, তুমি সিগারেট খেতে ভালবাস। আমার এই ক্ষুদ্র উপহার তুমি যদি নাও তাহলে আমার জীবন ধন্য হয়।

জয়দেব সিগারেটের প্যাকেটটা খুশি মনে নিল, ওটা জামার বুক পকেটে রেখে বলল, সিগারেট খেতে ভাল লাগলেও আমার তো হাত পা বাঁধা। যার এক পয়সা কামাই নেই তার কি ঘরে বসে সিগারেট ফোঁকা মানায়? তবে তুই দিয়েছিস যখন আমি খুশি হয়ে খাব। তবে সিগারেট না এনে তুই যদি বিষ এনে দিতিস তাহলে আমি আরও খুশি হতাম।

সত্যানন্দবাবু মোটর সাইকেল হাঁকিয়ে এলেন বাসস্ট্যাণ্ডে। কী কারণে থমথম করছিল তার মুখমণ্ডল। ইরাকে সামনে পেয়ে বললেন, তোমরা চলে যাচ্ছ অথচ আমি একবারও জানতে পারলাম না! আমি যদি কোনও অপরাধ করে থাকি বলো, বয়সে বড় হয়েও তোমাদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব।

—ছিঃ ছিঃ, এ আপনি কী বলছেন? সঙ্কোচ লজ্জায় ইরার গাল লাল হয়ে উঠল, সবিনয়ে বলল, আপনার মতো মালিক না পেলে ওকে আমি বাঁচাতে পারতাম না। আপনার অশেষ ঋণ এই ক্ষুদ্র জীবনে শোধ করা সম্ভব নয়।

—তুমি বাড়িয়ে বলছ। আমি তোমাদের জন্য কিছু করিনি। আমার ট্রাক নিয়ে জয়দেব যদি কলকাতায় না যেত তাহলে এত বড় সর্বনাশ ওর হয়ত হোত না। সত্যানন্দবাবু মুখ নীচু করে দাঁড়ালেন।

ইরা বলল, আপনি খামোখা মন খারাপ করবেন না। কপালের লেখা সহজে মোছে না। আমাদের ভাগ্যে ছিল, হয়েছে। এর জন্য কাউকে আমি দোষ দেব না।

—এ তোমার মহৎ মনের পরিচয়। সত্যানন্দবাবু গভীর আবেগে ইরার হাত চেপে ধরলেন, তোমরা যখন চলেই যাচ্ছ তখন আমার একটা অনুরোধ রেখে যাও। এই সামান্য কটা টাকা আমি দিলাম। জয়দেবকে কিছু কিনে দিও।

—আর কত নেব আপনাব কাছ থেকে! ইরার কণ্ঠস্বরে জড়তার প্রকাশ।

সত্যানন্দবাবু জোর করে ইরার হাতে টাকাগুলো ধরিয়ে দিলেন। বাস ছেড়ে দেবার পরও তিনি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। তাব চোখে টলটল করছিল জল। বাসটা দৃষ্টির বাইরে চলে যাবাব পর কানাই ডাকল, বাবু, চলুন। হাতের উল্টো পিঠে চোখ ডলে নিয়ে সত্যানন্দবাবু লম্বা সিগারেট ধরালেন, ধোঁয়া ছেড়ে আনমনে বললেন, একটা সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল! এইভাবে মনে হয় ধীরে ধীরে সব কিছু শেষ হয়ে যায়।

চেনা জায়গা তবু কালীগঞ্জে মন বসতে সময় লাগল ইরার। টুনি দিদিমণি খবর পেয়ে এল তার সাথে দেখা করতে। ইরা কী ভাবে শুরু করবে ভেবে পাচ্ছিল না। টুনি দিদিমণি ইরার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বলল, তুমি যদি ভেঙে পড়ো তাহলে ভেঙে পড়া মানুষটাকে কে দেখবে? নিজেকে বোঝাও। সুখ-দুঃখ তো জীবন ঘিরে থাকবেই। ইরার চোখ সজল হয়ে উঠল, কোন কথা না বলে সে গাছের মতো স্থির হয়ে দাঁড়াল। টুনি দিদিমণি যাওয়ার আগে বলল, আমি আবার আসব। তুমিও সময় পেলে যেও। অনেক দিন দেখা হয়নি। কথা সব জমে আছে। মাসের উপর হতে চলল ইরা তবু ঘর থেকে বেরয় না। তার সময় কেটে যায় জয়দেবের সেবা যত্ন করে। দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যাবার পর জয়দেবের অভিমান বেড়েছে শত গুণ। ইরা তার নিঃশ্বাসের বাইরে গেলেই হাঁক

ডাক শুরু হয়ে যায় তার। বকফুল গাছের তলায় দড়ির খাটিয়া পেতে জয়দেব শুয়ে থাকে দুপুর পর্যন্ত। বারোটার বাস না গেলে সে স্নানের কথা ভাবে না। কল থেকে জল এনে দেয় ইরা। ইটের উপর দাঁড়িয়ে বালতি বালতি জল ঢালে জয়দেব। পরণের কাপড়টাও সে নিজে কাচে না, ইরাই কেচে দেয় রোজ দিন। রাতে ইরার পাশে না শুলে তার ঘুম আসে না। গুরুপদ বিছানা নিয়ে চলে যায় কিচেন ঘরে শুতে। ছোট ঘর, জামাই থাকলে তার শোওয়ার অসুবিধা।

সকাল হলেই চা রুটি খেয়ে জয়দেব চলে যায় পল্টুর সঙ্গে টালি কারখানায়। ওখানকার মজুরগুলোর সঙ্গে তার এত ভাব জমেছে। হাসিঠাট্টায় সময় পার করে পল্টুর হাত ধরে ফিরে আসে দুপুরবেলায়। তখন তার মেজাজ অন্যরকম।

সেদিন হপ্তা পেল পল্টু। হাত পায়ের কাদামাটি ধুয়ে এসে সে জয়দেবকে বলল, জামাইবাবু, এ হপ্তার পুরো কামাই তোমাকে দিলাম। তোমার যা মন চায় এই টাকা নিয়ে খরচ করো।

পল্টুর উদার মন, ছাড়া ষাঁড়ের মতো মেজাজ। জয়দেব খুশি হয়ে বলল, তুই যখন টাকাগুলো দিলি তখন একটু নেশা করব। কতদিন হয়ে গেল নেশা করিনি।

পল্টুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল, দিদি যদি জানতে পারে?

জয়দেবের কপালে ভাঁজ পড়ল, সে জানবে কী ভাবে? তবে তুই যদি বলে দিস তাহলে আলাদা কথা?

—মা কালীর দিব্যি আমি কিছু বলব না।

—তাহলে চল, আর দেরী করে লাভ নেই।

পল্টুর হাত ধরে হারুর তাড়ির ঠেকে পা রাখল জয়দেব। চার গ্লাস খেয়ে যখন পেটটা তার ডগবের মতো ফুলে উঠল, তখন জয়দেব ঢেকুর ছেড়ে বলল, আর নয়, অনেক খেলাম। এবার ফেরা যাক।

ভক ভক করে পচা তাড়ির গন্ধ বেরচ্ছিল মুখ থেকে। পল্টু ভয় পেল।

ছুটে গিয়ে তুলসী পাতা ছিঁড়ে আনল হারু দাসের উঠোন থেকে। পাতাগুলো জয়দেবের হাতে দিয়ে মুখ শুকিয়ে বলল, এগুলো চিবিয়ে খেয়ে নাও। তুলসীপাতার গন্ধে বাজে গন্ধটা চাপা পড়ে যাবে।

জয়দেব ছেলেমানুষের মতো হাসল, তোর মাথায় দেখছি বুদ্ধি আছে। পল্টু যে বদবুদ্ধির জাহাজ এটা আর জানতে বাকি নেই জয়দেবের। তার পাল্লায় পড়ে এই তো ক'দিন আগে জয়দেবের মান-সম্মানে কালির ছিটে লাগল। টিকাদারবাবুর মোরগটা চরছিল কোয়ার্টারের পেছনে, পল্টুই দেখতে পেয়ে বলল, জামাইবাবু, মাংস খাবে?

অনেকদিন ডাল ভাত ছাড়া মাংস জোটেনি জয়দেবের, পল্টুর কথায় নড়ে চড়ে বসল সে, কোথায় আর মাংস পাব বল, কুমড়োর ঘ্যাট খেয়ে পেটে আমার চড়া পড়ে গেল। যখন চোখ দুটো আমার ঠিক ছিল, তখন গাড়ি নিয়ে বাইরে গেলেই মাংস খেতাম। হপ্তায় দু-তিন বার হয়ে যেত মাংস! এখন সেই রামও নেই, রাজ্যও নেই।

—তুমি খেতে চাইলে আমি তোমাকে মাংস খাওয়াতে পারি। পল্টু ফিসফিসিয়ে বলল, টিকাদারবাবুর লাল মোরগটা এখন আমার দশ হাত দূরে চরছে। মোরগটা রোজ আসে। তুমি যদি বল তো এই মোরগটাকে কাবু করে দিই।

—কী ভাবে কাবু করবি?

—এটা তো আমার কাছে দু-মিনিটের কাজ। তুমি চুপচাপ বসো। আমি আসছি। পল্টু উঠে গেল ঘরে। ফিরে এল হাতে চামগুলতি নিয়ে। ভেঁটুল নয় গুলতির চামে লাগাল কাচের গুলি। তাক করে ফট করে ছেড়ে দিল হাত। তীব্র গতিতে ছুটে যাওয়া কাচের গুলিটা আচমকা মাথায় লাগল মোরগের। দু-বার ডানা ঝাপটিয়ে একটু উড়েই স্থির হয়ে গেল মোরগটা। অপ্রস্তুত পল্টু বলল, জামাইবাবু, সব শেষ! এখন কী হবে?

—কী আর হবে! ওটার সদ্‌গতি করে ফেলা দরকার।

—দিনের বেলায় লোক যদি দেখে ফেলে? পল্টুর চেহারায় ভয়ের ছোপ। জয়দেব বলল, ঘরে কাউকে বলার দরকার নেই। মোরগটাকে তুই ছাদের উপর তুলে দে। সন্ধ্যাবেলায় মাংস বানাব। পালকগুলো ডোবার ধারে পুঁতে দেব। কেউ টের পাবে না।

যুক্তিটা মনে ধরেছিল পল্টুর। সেইমত সব কাজ হল।

প্রায় দেড় কিলোর উপর মাংস হল মোরগটার। মাংস দেখে কানন খুশি হয়ে শুধোল, এত মাংস নিয়ে এলে, কোথায় পেলে বাবা? জয়দেব কিছু বলার আগে পল্টু বলল, দাসপাড়া থেকে কিনে এনেছি মা। ওখানে ধড়াধড় মুরগিগুলো সব অসুখে মরে যাচ্ছে। আজ হপ্তা পেলাম কারখানায়। মোরগটা সস্তায় দিয়ে দিল দাসপাড়ার লোকটা। তাই ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে এলাম।

কাননের সন্দেহ দূর হলেও ইরার মন থেকে মেঘ কাটল না। মুখে কিছু না বলে সে দূরে সরে দাঁড়াল। কানন বলল, ইরা মাংসটা তুই রাঁধ। তোর হাতের মাংস রান্না অনেকদিন খাই নি।

ইরা এড়িয়ে গেল, আমার শরীরটা সকাল থেকে ভাল নেই। আজ আমি মাংস রাঁধতে পারব না।

অগত্যা কাননই ঢুকল রান্নাঘরে। মশলাপাতি দিয়ে জুৎ করে মাংস কষল সে। রাতের অন্ধকারে পালক দেখা না গেলেও মাংসের সুগন্ধ টোকা মারল টিকাদারবাবুর নাকে। সখের মোরগটা সন্ধ্যেবেলায় ঘরে আসে নি। তিনি ভেবেছিলেন, ওটাকে বুঝি শেয়ালে ধরে নিয়ে গিয়েছে। তবু ঘরে না বসে থেকে এদিক সেদিক খোঁজ করেছেন তিনি। কোথাও না পেয়ে রীতিমত হতাশ। অসময়ে মাংসের গন্ধ নাকে যেতেই তার পাকা মাথায় অন্য চিন্তার উদয় হল। গন্ধর সূত্র ধরে উৎসে পৌঁছালেন।

গুরুপদ তখন ঘরে ছিল না, তাস খেলতে গিয়েছে ব্রহ্মাণীতলায়। ইরা চুপচাপ তক্তপোষে শুয়েছিল। জয়দেব বিড়ি টানছিল মস্তিতে। পল্টু কষা মাংসে কামড় মেরে বলল, দারুণ হয়েছে মা। এবার জল ঢেলে দাও।

ঠিক সেই সময় আগুনের গোলার মতো চেহারা নিয়ে সরাসরি ঘেরা বারান্দায় ঢুকে এলেন টিকাদারবাবু, ও গুরুপদ।

কানন কিঞ্চিত ঘাবড়ে গেল টিকাদারবাবুর গলা শুনে। আঁচলে হলুদ জল মুছে নিয়ে বাইরে এসে সে বলল, আসুন বাবু।

গুরুপদ কোথায়? গমগমিয়ে উঠল টিকাদারবাবুর গলা, তাকে দেখে গলায় হাড় আটকে যাবার শোচনীয় অবস্থা হল পল্টুর। কানন বলল, সে তো ঘরে নেই। আপনি ঘরে চলুন বাবু।

—আমি বসতে আসিনি। এদিক সেদিক সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন টিকাদারবাবু, সম্ভবত তিনি পালক খুঁজছিলেন মোরগের, না দেখতে পেয়ে কিছুটা ঝিমানো গলায় বললেন, তোমাদের আজ বুঝি মাংস হচ্ছে? কানন কোন কিছু না বুঝেই ঘাড় নাড়ল, হ্যাঁ বাবু?

—মুরগি কোথায় পেলে?

—জামাই আর আমাদের পল্টু গিয়ে দাসপাড়া থেকে কিনে এসেছে।

—ওদের একটু ডাকো। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

জয়দেব এল, পল্টুও তার পাশে দাঁড়াল। তাদের দেখে টিকাদারবাবু বললেন, কার মোরগ তোমরা কিনেছ? আমাকে সেই লোকের কাছে নিয়ে চল। আমার লাল মোরগটা আজ ঘরে আসেনি। তোমাদের চোখ মুখ দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে। তোমরা যদি মাসের শেষে সত্যিই মোরগ কিনে থাকো — তাহলে তার পালকগুলো আমাকে দেখাও। আমি পালক দেখেই চলে যাব।

পল্টুর মুখের দিকে ইরা অসহায় ভাবে তাকাল। অপমানে তার শরীর পুড়ছিল। টিকাদারবাবুর এই ঔদ্ধত্যের জবাব দেওয়া দরকার। পল্টুর হাত ধরে ইরা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, যা, ওনাকে দাসপাড়ায় নিয়ে যা। আমরা গরীব। মাংস খেলে এখানকার লোকের সন্দেহ হয়। তুই গিয়ে সন্দেহটা দূর করে দে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাব তো বটেই। সাহসের সঙ্গে পল্টু হেঁটে গেল দশ হাত। অন্ধকারে সে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে ভয়ে দৌড় লাগাল পিচ রাস্তার দিকে। টিকাদারবাবু তার বিশাল শরীর নিয়ে পল্টুর পিছন পিছন দৌড়ালেন অনেকক্ষণ, শেষে না ধরতে পেরে গুরুপদর বাপ চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে চলে গেলেন ডাক্তারবাবুর ঘরে।

রাত দশটায় গুরুপদর ডাক পড়ল। সব স্টাফের সামনে ক্ষমা চেয়ে একশ টাকা জরিমানা দিতে হল তাকে। পল্টু তিনদিন ঘরে ঢুকল না, পালিয়ে বেড়াল। গুরুপদর রাগ পড়তেই সে আবার ঝাঁকের কই হয়ে মিশে গেল সংসারের ঘূর্ণি জলে।

অপমানের দাগটা এখনও গুরুপদর বুক থেকে মেলায় নি। এই ঘটনার পরে ইরা আর কারোর ঘরে যায় না। কোন মুখ নিয়ে সে যাবে? চোরের দিদি এই কি তার পরিচয়? জয়দেবকেও সে কথা শোনাতে ছাড়ে নি। জয়দেব ইরার ফোসকা পড়া কথাগুলো গায়ে মেখে নিয়েছে। চোখ হারিয়ে সে তার নৈতিক চরিত্র খুইয়ে বসেছে। অন্ধকারের মানুষকে আলোয় ফেরান খুবই কঠিন। তবু ইরা বলেছিল, তুমি আর পল্টুর সাথে মিশবে না। ও তোমার চাইতে বয়সে অনেক ছোট। ওকে যদি শুধরাতে না পারো তাহলে ওকে আর নীচে নামিয়ে দিও না। ওর জন্য আমাদের সবার মাথা হেঁট হয়ে গেছে

দাসপাড়া পেরিয়ে এলেই পুরনো সাঁকো, ঘোলা জলে জলঘুঘরো সাঁতার কাটে অবাধ স্বাধীনতায়। জলোঘাস নুয়ে পড়েছে রোদে, দুটো ফড়িং জল ছুঁই ছুঁই খেলছে আপন খেয়ালে। মরা শীতের রোদ এখন বেশ কড়া, কচি পাতায় রোদের সাথে বন্ধুত্ব জমে না। পল্টু কেঁপে ওঠা কচি পাতার চেয়েও নির্বোধ চোখ মেলে তাকাল। হপ্তার টাকাগুলো সে জামাইবাবুর হাতে তুলে দিয়ে ভাল কাজ করেনি এটা বুঝতে পারল হাড়ে হাড়ে ঘরে গেলে আবার অশান্তির মুখে পড়তে হবে তাকে। জয়দেব যে ভরপেট তাড়ি খাবে এটা সে জানত না। দিদির অগ্নিউদ্দীপক চোখের কথা স্মরণ করে পল্টুর অস্তিত্ব মেরুদণ্ডহীন

কেঁচোর মতো হয়ে গেল। জয়দেবের নেশার ঘোরে হাঁটার ক্ষমতা ছিল না। এদিকে বেলা চড়েছে টিকলিতে। তার না ফেরা পর্যন্ত ভাত নিয়ে অপেক্ষা করবে কানন। ঘর-বার করবে ইরা। গুরুপদ বেলা দেখবে ঘনঘন। কারণ খাওয়ার পর না ঘুমালে সন্ধ্যা রাতেই তার নাকি ঘুম পেয়ে যায়। পল্টু ভয়ে ভয়ে জয়দেবের দিকে তাকাল। সাঁকোর উপর পেছন থেবড়ে বসেছিল জয়দেব। নেশাচ্ছন্ন চোখ, শরীরে এক ফোঁটা জোর নেই তার। হাঁটতে পারছিল না বলেই পল্টু তাকে বসিয়ে দিয়েছিল ওখানে। মাথাটা ভার ঠেকতেই জয়দেব জড়ানো গলায় বলল, শালাবাবু, আমাকে এখানে শুইয়ে দে, আমি আর হাঁটতে পারব না। শালা, ও তো তাড়ি নয়, মদের বাবা। নাহলে মাত্র চার গেলাসে আমি কেন আউট হবো?

পল্টু বিজ্ঞের মতো বলল, অনেক দিন খাও নি তো তাই নেশাটা ছ্যাঁক করে ধরেছে। তাছাড়া খালি পেট, নেশা তো বাড়বেই!

ডানে বাঁয়ে ঘাড় নেড়ে জয়দেব বলল, শালার দেখছি ব্রেন বড় সেয়ানা। মুখের দু'পাশে থুতু এসে গিয়েছিল তার, হাতের চেটোয় থুতু মুছে সে বলল, আজ আর দুপুরে ঘর গিয়ে কাজ নেই। টিকাদারবাবু দেখলে চড় থাপ্পড় মারবে। তোর দিদিও রাগে খরিশ সাপ হয়ে যাবে। ঘরের লোককে সে তো সাপোর্ট করতে জানে না, উল্টে পরের জন্য আমাকে কান তাতানো কথা শুনতে হবে।

পল্টু নিরুপায়। জয়দেবের হাত ধরে টানল, ওঠো জামাইবাবু, আর দেরী করা চলবে না। তুমি পা সোজা করে হাঁটার চেষ্টা করো। আমি ধরে ধরে তোমাকে ঠিক নিয়ে যাব। দুপুরবেলা রাস্তাঘাট ফাঁকা। কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না।

—আমাকে যেতেই হবে!

—না গেলে আমি কী জবাব দেব? এমনিতে আমার অনেক বদনাম। আমি আর বদনামের ভাগীদার হতে চাই না। পল্টুর কথায় অন্য ধরনের সুর।

অগত্যা দু-হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল জয়দেব। বিড়ি বের করে দু ঠোঁটের ফাঁকে চাপ দিয়ে পল্টুকে বলল, ম্যাচিসটা জ্বেলে দে। দেখিস আমার মুখটা যেন না পুড়ে যায়।

—মুখ পুড়তে তো বাকি নেই আর! পল্টুর তরল রসিকতায় চটল না জয়দেব, গলা ফাটিয়ে হেসে উঠল হা-হা।

হাসপাতালের মাঠে এসে জয়দেবের নয় পা কাঁপছিল পল্টুর। সে ম্যাদামারা চোখে তাকাল বকফুলগাছটার দিকে। বাইরে কাউকে দেখতে পেল না। বুকে সাহস পুরে নিয়ে পল্টু বলল, জোরে জোরে পা চালাও। আমতলায় কেউ নেই। কলতলাও ফাঁকা। এই সুযোগে ঘরে ঢুকে যাবো।

ভগবান সহায় ছিল, পল্টু জয়দেবকে নিয়ে ঘরে ঢুকে এল বিনা বাধায়। ইরা ভেজা কাপড় ছাড়ছিল বাথরুমে, গলায় হালকা গুনগুনানো সুর, চেনা পয়ের শব্দ, তার সুর ভাঁজার গতি একটু তীব্র হল। পল্টু চালাক ছেলে। দিদির হাসিখুশি গলা শুনে ফিসফিসিয়ে জয়দেবকে বলল, জামাইবাবু, ফাঁড়া কেটে গেছে তোমার। আমি যাই চান করে আসি।

পল্টু বালতি নিয়ে চলে গেল কলতলায়। ইরা ভেজা কাপড় বদলে ঘরে এসে দেখল চোখ মুখ অস্বাভাবিক করে ধুলো পায়ে বিছানায় শুয়ে আছে জয়দেব। কাছে গেল না, দূর থেকেই বলল, তোমার কি শরীর খারাপ?

কথা বলল না, শুধু ঘাড় নাড়ল জয়দেব।

ইরা বলল, যাও স্নান করে আসো।

এবারও চুপ করে থাকল জয়দেব। ইরা ভেজা চুলে চিরুনী চালিয়ে ধূপ জ্বালাল ঠাকুরের কাছে। ধূপের গন্ধে ঢেকে গেল তাড়ির দুর্গন্ধ।

খাওয়ার সময় গুরুপদ খুব একটা কথা বলে না। তবে জয়দেব আসার পর থেকে সে কথা বলে দু-একটা। ডাল দিয়ে ভাত মেখে গুরুপদ বলল, আমি ভাবছি তোমাকে নিয়ে একবার কলকাতার হাসপাতালে দেখাব। ওখানে তো অনেক বড় বড় ডাক্তার আছে

—তার আর দরকার নেই। জয়দেব বলল খাওয়া থামিয়ে। গুরুপদ গন্ধ পেল তাড়ির নাক কুঁচকে জামাইয়ের দিকে তাকাল। ইরা কোথায় আছে দেখল গোপন চোখে।

তখনই বিশ্বনাথ এল একরকম হাঁপাতে হাঁপাতে। ঘরে ঢুকে দম নিয়ে সে বলল দাদা তোমার ঘরে কুটুম আসছে গো! আমার সাথে দেখা হল গেটের কাছে।

গুরুপদ খাওয়া থামিয়ে আশ্চর্য ভরা চোখে তাকাল, এই অসময়ে আবার কুটুম এল কোথা থেকে? কপালে ভাঁজ পড়ল গুরুপদর। কানন যে খুশি হয়নি তার চোখ মুখ দেখে বোঝা যায়। বিশ্বনাথ দরজা ধরে দাঁড়াল, কাননের সাথে তার ঠাট্টার সম্পর্ক, রগড় করার গলায় বলল, বৌদি. চাল চাপিয়ে দাও হাঁড়িতে। মিষ্টি মতন একটা বউ আসছে তোমাদের ঘরে। সঙ্গে পাঁচ-ছ বছরের ছেলে।

গলায় ভাত আটকে যাবার দশা হল জয়দেবের, ঢকঢক জল খেয়ে সে ঘাম মুছল কপালের। ইরা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বকফুল গাছের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। দূর থেকে তার বয়সী একজন মেয়েকে আসতে দেখল সে। ছোট ছেলেটা লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছিল মাঝে মাঝে ছেলেকে শাসন করছিল বউটা।

ইরা ভাল করে দেখল এ মুখ তার চেনা নয়। অভাবী মুখশ্রীতে জৌলুষ নেই, তব টানা টানা চোখ দুটোতে আশ্চর্য মায়া জড়ানো। মাথা ভর্তি চুল যত্নের অভাবে পাংশু মলিন। হাতে লোহা পলা শাঁখা আছে। বউটা ইরার কাছে এসে শুকনো ঢোক গিলে শুধোল, এখানে কি জয়দেব দাস থাকে?

ইরা বউটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, হ্যাঁ।

বউটার চোখের তারা চিকচিকিয়ে উঠল কিছু খুঁজে পাওয়ার আনন্দে, গলা কেঁপে উঠল তার, ওকে একটু ডেকে দেবেন? আমি অনেক দুর থেকে আসছি ওর খোঁজ পেয়ে

—জয়দেব দাস আপনার কে হোন? ইরা কৌতুহল চেপে রাখতে অক্ষম হল। বউটা শাড়ির আঁচল গুছিয়ে নিয়ে মলিনতা ঝেড়ে হাসল, বহু কষ্টের সেই হাসি; চোখের জল আড়াল করে বলল, ওর বাবা! আমি বহুকষ্টে ওর ঠিকানা পেয়েছি। তাই ছেলেকে সাথে নিয়ে চলে এলাম।

ইরার কানে কথা নয় যেন ঝাঁক ঝাঁক তীর ঢুকে গেল। এই প্রথম তার মনে হল এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা তার অর্থহীন।

## ।। ষোল।।

বুনো আগাছায় রোদ পড়ে সবুজ দেখাচ্ছে পাতাগুলো। আমগাছের পাতার আড়ালে বসে ক্লান্ত ঘুঘু এক নাগাড়ে ডাকছিল। ইরার কানে বাইরের কোনও শব্দই ঢুকছিল না ঠিকঠাক, এক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে ছিল রোগা লম্বা ছিপছিপে বউটার মুখের দিকে। কথা বলার মতো মনের অবস্থা ছিল না তার, গলা বুজে আসছিল উদ্‌গত কষ্টের স্রোতধারায়। তবু নিজেকে শক্ত করে দাঁড় করাল সে। উদ্ভূত পরিস্থিতিকে সামাল দেবার প্রাণপন চেষ্টা করল সে। ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, এবার তোমার দিন শেষ! পাখি উড়ে যাবে, তুমি শূন্য খাঁচা আঁকড়ে পড়ে থাকো।

ইরা কিছু বলার আগেই বউটা বলল, আমি অসময়ে এসে বিরক্ত করলাম। ওকে একটু ডেকে দিন, আমি দেখা করেই চলে যাব।

ইরার পাশে কানন এসে দাঁড়িয়েছে, এক পলক বউটার দিকে তাকিয়ে যা বোঝার বুঝে নিয়ে সে বলল, ঘরে চলো তুমি। যা বলার ঘরে গিয়ে বলো। জয়দেব খেতে বসেছে।

—আপনারা ওর কে হোন? বউটার হঠাৎ প্রশ্নে বিব্রতবোধ করল ইরা, মায়ের দিকে তাকিয়ে ঢোক গিলল সে, তারপর এক দৌড়ে ঢুকে গেল ঘরের ভেতর। দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে সে শুধু একবার জয়দেবের দিকে তাকাল, নিজেকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল সে। গুরুপদ খাওয়া থামিয়ে শুধোল, কে এসেছে রে? বাইরে কেন, ওকে ঘরে নিয়ে আয়।

ইরার হাত-পা, চোখের দৃষ্টি, বুকের চারপাশ ঝন্‌ঝন্ করে কেঁপে উঠল, কোনও উত্তর দিতে সে পারল না, ঝাপসা চোখে অপলক চেয়ে থাকল। গুরুপদই উঠে গেল খাওয়া ছেড়ে, ততক্ষণে কাননের পিছু পিছু ঘরে ঢুকে এসেছে বউটা।

ছোট ছেলেটার নাম বাবলা। সে বড় ছটফটে, দূরন্ত। নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে তার কোন আড়ষ্টতা নেই। জয়দেবের দিকে তাকিয়ে সে কিছু বলার আগেই বউটা বলল, ওগো, আমাকে কি চিনতে পারছ, আমি সাধনা?

তীর বেঁধা পাখির মতো কিছুক্ষণ কাতর দেখাল জয়দেবকে, কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে তার মধ্যে উথাল ঝড় শুরু হল। অনেকক্ষণ কোন কথা না বলে দূরে কোথাও বুঝি তলিয়ে যেতে চাইল জয়দেব।

সাধনা উঠে গেল জয়দেবের কাছে, খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বলল, আমি কী দোষ করেছিলাম যার জন্য তুমি আমাকে এত বড় শাস্তি দিলে? খোকাকে নিয়ে আমার যে একবছর কী ভাবে কেটেছে তা আমি জানি। দয়ালমামা না থাকলে আমাকে ভেসে যেতে হোত। সে আর আমি তোমার কত খোঁজ করেছি। কেউ তোমার সন্ধান দিতে পারে নি। আর তুমি আমাদের কোনও খোঁজ খবর নাও নি। কিছুদিন আগে ইণ্ডিয়া থেকে তোমার দূর সম্পর্কের দাদা গিয়েছিল ওপারে। তার মুখে আমি তোমার ঠিকানা পেলাম। তাই বাবলাকে নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে হাজির হয়েছি।

মৃত মানুষের চেয়েও ছাইবর্ণ মুখ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল জয়দেব, সবার সামনে সাধনা তার হাত ধরল, সক্রোধে ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল, এই পশুর কাজ তুমি করতে পারলে? তোমার মনে যদি এত ভয় ছিল তাহলে তুমি কেন আমাকে বিয়ে করতে গেলে? বলো, আজ তোমাকে বলতেই হবে। সাধনা চোখের পাতা ভিজিয়ে ডুকরে উঠল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল ইরা কাঁদছে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে, অনর্গল চোখের ধারা গাল ভিজিয়ে আশ্রয় নিয়েছে চিবুকে। ইরার কাছে এগিয়ে গেল সাধনা, তার হাত দুটি ধরে মোলায়েম স্বরে বলল, বোন, তোমারও যে সর্বনাশ হয়েছে তা আমি তোমার সিঁথিতে সিঁদুর দেখেই বুঝতে পেরেছি। ওর ভেতরে যে এত বড় শয়তান বাসা বেঁধে আছে তা যদি আগে বুঝতে পারতাম তাহলে এত বড় ভুল আমার হোত না। যখন বুঝতে পেরেছি তখন আমার আর কিছু করার নেই। বাবলা পেটে এসেছে। আমি তখন নিরুপায় ছিলাম বোন। ওর সাথে মানিয়ে চলবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু শয়তানের সঙ্গে কি মানুষ কখনও মিলে মিশে থাকতে পারে? ও সামান্য কথায় আমাকে ধরে মারত। তারপর চুরি কেসে ফেঁসে গিয়ে পালিয়ে আসল ইণ্ডিয়ায়। আমি মেয়েমানুষ এপারে এসে কী করে ওর খোঁজ করি বলো? ভেবেছিলাম ও হয়ত ভুল বুঝতে পেরে ফিরে আসবে কিন্তু পাঁচ বছর পেরিয়ে গেল, যখন ও এল না, তখন আমিই এলাম ওর খোঁজে। ও দেশে আমার তো কেউ নেই। বাবা-মা ছিল, তারাও মরল। কার ভরসায় আর ওদেশে থাকব, তাই বাবলার হাত ধরে ভাগ্য সঙ্গে করে চলে এলাম। এ অবস্থায় যে ওকে দেখব ভাবি নি। আমি শাস্তি দেবার আগেই ভগবান ওকে শাস্তি দিয়েছে। তুমি আর কেঁদো না। আমি তোমাকে জ্বালাব না। আমি আমার পোড়া কপাল নিয়ে চলে যাব!

—তুমি কোথায় যাবে দিদি? চোখ মুছে নিয়ে শুধোল ইরা, তোমার আর আমার ভাগ্য একই সুতোয় গাঁথা। যা কষ্ট হবে দুই বোনে তা মিলে মিশে ভাগ করে নেব। ওর তো একা কোথাও যাওয়ার ক্ষমতা নেই। ভগবান যে ওর চোখ দুটো কেড়ে নিয়েছে।

—সে আমি সব শুনেছি। শুনে আমার কষ্ট হয়েছে। আবার পাশাপাশি আনন্দও। মানুষকে যে কষ্ট দেয় তার তো কষ্ট হবেই। সাধনার চোখ মুখ শক্ত হয়ে উঠল, এমন শাস্তির ওর দরকার ছিল নাহলে ও আরও অনেক মেয়ের সর্বনাশ করে দিত। ভগবান যা করে মঙ্গলের জন্য।

জয়দেব ফুঁসে উঠছিল রাগে তবু তার কোনও বাহ্যিক প্রকাশ হল না, দাঁতে দাঁত চেপে সে যেন পাথর হয়ে গিয়েছে সাধনার উপস্থিতিতে।

গুরুপদ সব বুঝে শুনে কড়া গলায় প্রশ্ন করল, জয়দেব, আমি তোমাকে যা প্রশ্ন করছি তার সরাসরি উত্তর দাও। সাধনাকে কি তুমি চেনো, ও কি তোমার স্ত্রী?

একই প্রশ্ন দু'বার করল গুরুপদ তবু কোন উত্তর দিল না জয়দেব। কানন মাঝখানে এল, চোখ-মুখ দেখে বুঝছ না কে অপরাধী? জবাব দেবার কিছু ক্ষমতা থাকলে তো ও বলবে?

ছিঃ ছিঃ বড় অন্যায় কাজ করেছ তুমি? গুরুপদর গলা থেকে আর্তনাদ ফুঁড়ে বেরল, তোমাকে আমরা বিশ্বাস করেছিলাম। তুমি আমাদের বিশ্বাসকে এভাবে নষ্ট করে দেবে ভাবি নি।

ইরা বলল, প্রথম থেকেই আমি তোমাদের সতর্ক করেছিলাম। তখন কেউ তোমরা

আমার কথা কানে তোলো নি। এখন সব কিছু শেষ হয়ে যাবার পর ওকে আর দোষারোপ করে কি হবে? আমি কি ইচ্ছে করলে ওর সিঁদুর তুলে ফেলতে পারব? তোমাদের ভুলের জন্য আমার জীবন আজ নষ্ট হয়ে গেল। কানন মেয়ের চোখের দিকে তাকাতে পারল না, অপরাধীর মতো মুখ ঝুঁকে গেল মাটির দিকে, যা হবার হয়েছে, এখন কপাল ফাটিয়ে ফেললেও কোন কিছু আর ফিরে আসবে না। শুধু লোক হাসাহাসি হবে, এর বেশি আর কিছু হবে না।

কপালের ঘাম মুছে জয়দেব কিছু বলার চেষ্টা করতেই প্রবল উত্তেজনায় ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল গুরুপদ, তুমি চুপ করো। তুমি আর বড় মুখ করে কোন কথা বলো না। আজ আমি তোমার কোন কথাই শুনব না। তুমি যদি জামাই না হয়ে আমার ছেলে হোতে তাহলে আজ এক্ষুণি আমি তোমাকে কেটে দু'টুকরো করে ফেলতাম। গুরুপদ ভেঙে পড়ল। বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত দেখাল তাকে। ইরা এরই মধ্যে নিজেকে কিছুটা ধাতস্থ করে ফেলেছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। উত্তেজিত, বিহুলিত গুরুপদর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বলল, বাবা, তোমার শরীর ভাল নেই। এসময় রাগারাগি করো না।

গুরুপদ সামলে নিল, বড় বড় শ্বাস ছেড়ে সে তাকাল, হ্যাঁ আমি আর কী বলব এসময়? সর্বস্ব হারিয়ে গেলে মানুষের কিছু বলার থাকে না। জামাই আমার হাত নয়, মাজাটাই ভেঙে দিয়েছে, আর তোর কপালও তেমনি, কোন কুক্ষণে বিধাতা যে তোর কপালের লিখন লিখেছিল!

আমি আর ভাগ্যকে দোষ দিই না বাবা! ইরা উদাসীন গলায় বলল, মানুষের ভাগ্য মানুষই নষ্ট করে দেয়। এখানে ভগবানকে জড়িয়ে কী হবে? এক গ্লাস জল চেয়ে নিল সাধনা। দীর্ঘ সময়ের বাস জার্নিতে ওর চেহারায় ধকলের চিহ্ন। খড়ি ফোটা ফরসা মুখখানা বাইরের হাওয়ায় রুক্ষ-শুষ্ক। মাথার চুলে যত্নের অভাব। সিঁথিতে বাসি সিঁদুর অনুজ্জ্বল আভা নিয়ে বিদ্যমান। ওর টিকালো নাকের মাঝখানে একটা সাদা পাথর চিকচিকিয়ে উঠছে মাঝেমধ্যে। নাকছাবির আভিজাত্যটুকু বাদ দিলে সাধনার আর কিছু নেই বড়াই করার মতো। তার শরীরে এক ফোঁটা সোনা নেই, শাঁখা পলা আর লোহা ছাড়া কানে আছে রঙ জ্বলা রোল্ডগোল্ডের পাশা। এতসব কিছু বিসদৃশের মাঝখানে শুধু ওর চোখের তারা যুগল কুচকুচে পাকা জামফল। রোগা মুখটার সঙ্গে দিব্যি মানিয়ে যায় জোড়া ভ্রু'র নীচে চোখ দুটো। এই মায়াময় মুখশ্রীর দিকে তাকিয়ে কাননের বুক ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হল, সাধনার হাত ধরে সে বসাল খাটের উপর, তুমি আমার মেয়ের মতো। তোমার তো কোন দোষ নেই, যত দোষ তো আমাদের জামাইয়ের। যাও মা, হাত-মুখ ধুয়ে আসো। ঘরে যা আছে খেয়ে নাও। ছেলেটারও তো চোখ-মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। সাধনাকে সঙ্গে করে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল ইরা, হাত-মুখ ধোওয়ার জল দিয়ে বলল, আমার এখনও খাওয়া হয় নি। তুমি তাড়াতাড়ি করো।

আজ আমার গলা দিয়ে ভাত নামবে না। সাধনা মুখ বেঁকিয়ে এড়িয়ে যেতে চাইল। —তুমি না খাওয়া পর্যন্ত আমি তো খেতে পারি না। ইরা তার হাত ধরল। ইরা যখন সাধনাকে নিয়ে খেতে বসল তখন বেলা ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। নরম রোদ জানলা

টপকে আকুলিত হয়ে লুটিয়ে পড়ছে মেঝেতে। সাধনার পাড় ফেঁসে যাওয়া শাড়িটায় কোন জৌলুষ নেই। ইরা তার ছাপা শাড়ি পরতে দিয়েছে ওকে। জয়দেবের দৃষ্টি থাকলে দেখত মেয়েমানুষ জলের মতো, যে কোন পাত্রে যে কোন সময় মানিয়ে যায়। ইরার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে এখন আর স্বপ্নের কোনও পদ্মফুল ফুটবে না। তার ক্ষুদ্র জীবন দগ্ধে মল্লে কদাকার করে দিয়েছে তারই স্বপ্নের পুরুষ জয়দেব। ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে সে। সাধনা তারই মতো জীবনের হাড়িকাঠে মাথা দেওয়া একজন মানুষ। ওর সঙ্গে ইরার কোনও বিরোধ নেই, থাকতেও পারে না। জীবন যুদ্ধে ওরা তো একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে। তাৎক্ষণিক ঝড়-ঝাপটা কাটিয়ে ইরার মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটেছে। সাধনাও মানিয়ে নিয়েছে এই পরিস্থিতির সঙ্গে। শুধু জয়দেবই যা পারে নি। সাধনার উপস্থিতি তার শুধু সম্মানে নয়, অস্তিত্বের মূলে সজোরে কুঠারাঘাত করেছে। বিপন্ন অসহায় ভঙ্গুর অস্তিত্ব নিয়ে ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল জয়দেব। সাধনা এ ঘর থেকে না যাওয়া পর্যন্ত সে স্বস্তির শ্বাস নিতে পারবে না। কালসাপের সঙ্গে সে বুঝি একই ঘরে বসবাস করছে, তার আতঙ্কিত চোখ-মুখের অবস্থা অনেকটা এইরকম। সাধনার বুক পুড়ে যায়। কী যে তার করনীয় কিছু বুঝে উঠতে পারে না। পিছোতে পিছোতে দরজায় গিয়ে ঠেকে তার পিঠের চামড়া খসখসে কাঠে ছড়ে যায় পিঠ। নুন ঘামে জ্বালা পোড়া করে ওঠে ক্ষতস্থান। দরজার খিল কাঠটা শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরে সে। ইরার সঙ্গে ও দেশের সংঘর্ষময় জীবনের গল্প করছে সাধনা। ইরা খুব মনোযোগ সহকারে শুনছে। মাঝে মাঝেই তার গলা থেকে উৎসারিত হচ্ছে সমবেদনার ধ্বনি। এমন শ্রোতা পেলে যে কেউ হৃদয়ের সব কিছু উজাড় করে বলে দেবে। এতে সমূহ ক্ষতি হতে পারে জয়দেবের। আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয় সাধনাকে। জয়দেবের কড়া পড়া হাতের পেশী শক্ত হয়ে ওঠে। খিলকাঠটাকে আরও শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে সে। সাধনার গলার স্বর লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারতে গেলেই ইরা উঠে পড়ে খিলকাঠটাকে ধরে ফেলে। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হয় ওদের মধ্যে। রান্নাঘর থেকে উঠে আসে কানন। আধ শোওয়া অবস্থায় উঠে বসে গুরুপদ। চিৎকার করে বলে, কী সর্বনাশ, তুমি কি মেয়েটাকে খুন করে দেবে নাকি?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে আমি খুন করে ফেলব। বিকৃত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল জয়দেব, আমাকে ছেড়ে দাও। ওকে আমি বাঁচতে দেব না। যে আমার বাঁচার রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছে তাকেও আমি বাঁচতে দেব না।

খিলকাঠটা জয়দেবের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঘরের এককোণে ছুঁড়ে দেয় ইরা, তোমার লজ্জা করে না দিদির গায়ে হাত তুলতে? তুমি মানুষ না রাক্ষস আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

—এতদিন আমি মানুষ ছিলাম। ওর জন্য আমাকে রাক্ষস হতে হয়েছে। জয়দেব দম নেবার জন্য থামল, ওর দয়ালমামা জোর করে ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দিল। বিয়ের পর জানলাম ওর হাঁপানীর টান আছে। একটা হেঁপো মেয়েকে সারাজীবন আমি কেন বইতে যাব। নিজেকে বাঁচাবার জন্য আমি ভারতে পালিয়ে এলাম। এখানেও ও হানা দিয়েছে। ওকে আমি আর ছাড়ব না। হয় ও থাকবে নাহলে আমি থাকব।

গুরুপদ হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল জয়দেবকে, মাথা গরম করো না। লোক হাসিয়ে তোমার সম্মান বাড়বে!

—আমি তো শেষ হয়ে গিয়েছি। আমার আর মান-সম্মানের কী আছে!

—নিজেকে দিয়ে সব কিছুর বিচার করতে যেও না। গমগমিয়ে উঠল গুরুপদর গলা, নিজেকে সামলাও। নাহলে আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেলে আমি তোমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব।

—সেই ভাল। আমিও সেটা চাই। জয়দেব মাথায় হাত দিয়ে বসে না পড়ে মাজা সোজা করে দাঁড়াল।

ইরা বলল, বাবা তুমি যাও। তুমি আর এ ব্যাপারে মাথা ঘামিও না।

মাথা ঘামাব না মানে? লেজে পা দেওয়া সাপের মত রুখে দাঁড়াল গুরুপদ, আমার ঘরে খুন-খারাপি হলে কেউ কি আমাকে ছেড়ে দেবে? তখন সবাই আমাকে দুষবে। আমি সরকারী হাসপাতালের কোয়ার্টারে থাকি। মারামারি করে মরতে হলে হাসপাতালের সীমানার বাইরে যাওয়া উচিত। আমি তখন কাউকে বাধা দেব না।

সাধনার উপরে যে অতর্কিত আক্রমণ হতে পারে এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিল সে। বাবলাকে বুকের কাছে এনে জলে ভেজা চড়াই পাখির মতো সে কাঁপছিল। ইরা তাকে অভয় দিয়ে বলল, তোমার ভয় নেই দিদি। আমি বেঁচে থাকতে কেউ তোমার গায়ে আঁচড় কাটতে পারবে না। আমাকে শেষ না করে কেউ তোমাকে ছুঁতেও পারবে না।

সাধনা ফুঁপিয়ে উঠল, এত দূর থেকে এত কষ্ট করে এলাম শুধু তার হাতের মার খাওয়ার জন্য? এমন ভাগ্য যেন আমার শত্রুরও না হয়! ছেলেটা তার বাবাকে দেখবে বলে অস্থির। অথচ দেখ, সেও কেমন মুখ কাচুমাচু করে দূরে সরে গিয়েছে।

ইরা এতক্ষণ বাবলার কথা ভুলে গিয়েছিল। হাফফ্যান্ট পরা রোগা ছটফটে ছেলেটার দিকে তাকাল সে। মাথায় জয়দেবের মতো কুঁকড়ান চুল, শ্যামলা মুখটা অবিকল যেন একই ছাঁচে ঢালা। এই ছেলে যে জয়দেবের কার্বন কপি ইরার আর বুঝতে কোন বাকি থাকে না।

বাবলার মাথার উপর সাধনার চোখের জল ঝরে পড়তেই ইরা বলল, দিদি, তুমি এখনও কাঁদছো?

—চোখের জল ছাড়া যে আমার আর কিছু নেই বোন!

—তুমি তো সব পেয়েছ, এবার ওকে নিয়ে চলে যাও।

—কোথায় যাব, যাবার জায়গাই বা কোথায়?

—ওদেশে তো তোমাদের ঘরবাড়ি আছে।

—ঘরবাড়ি এককালে ছিল, এখন আর নেই। খান সেনারা সব পুড়িয়ে দিয়েছে। যেটুকু মাটি পড়ে আছে তাতে আমার কোন অধিকার নেই। সাধনার গলা ভার হয়ে এল, তোমাদের এখানে ফেরার বাস কটায়? আমি ফিরে যাব। আমি এখানে থাকতে আসিনি। আমি এসেছিলাম শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে। দেখার সাধ আমার মিটে গিয়েছে। আমি আর কিছু চাই না। তোমরা সুখে শান্তিতে থাকো। আমি এটাই চাই।

—সুখ! ইরার চোখের কোণে হাসি খেলে গেল, আমার জীবন থেকে সুখ শব্দটাই মুছে গেছে। তার জায়গায় বড় বড় করে লেখা হয়ে গেছে দুঃখ। এই দুঃখই এখন আমার সব।

ইরা আবার বিমর্ষ হাসল, না তা কেন হবে? তুমি এসেছিলে বলেই আমার ভুলটা

ভেঙে গেল। নাহলে সারাটা জীবন ভুলের সিঁড়ি বেয়ে আমাকে উঠতে হোত উপরে। সেটা কি ভাল হোত?

সাধনা চুপ করে থাকল, কোনও উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা তার ছিল না।

সাধনা কোথায় ফিরবে তা জানত না সে তবু ফিরে যাবার জন্য উদগ্রীব সমস্ত সত্তা। বিকেলের ক্ষীণতম আলোর দিকে তাকিয়ে সে ইরাকে বলল, আমি আসাতে তোমার অনেক কিছুই ওলোট-পালট হয়ে গেল। আমি না এলেই বুঝি ভাল হোত! এসে যখন পড়েছি তখন আর দেরী করব না, আমাকে যেতে দাও। আমি যত তাড়াতাড়ি তোমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাব ততই তোমার মঙ্গল।

ইরা ব্যথিত হয়ে বলল, আমি তা ভাবি না। তুমি যেতে চাইছ, কিন্তু কোথায় যাবে?

—এত বড় পৃথিবীতে যাওয়ার জায়গার তো অভাব নেই। সাধনা মুখ ঘুরিয়ে নিল অভিমানে, কোথাও না যেতে পারি মরতে তো পারব!

—কেন মরবে? কিসের জন্য কার জন্য মরবে? ইরার চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, যার তার জন্য নিজের জীবনটাকে কেন বিকিয়ে দেবে? জীবন তো খোলামকুচি নয়? বাবার সাথে আমার কথা হয়েছে। তোমার যতদিন মন চায় আমাদের এখানে থাকো। ভাল না লাগলে চলে যেও।

—আমি কোন পরিচয়ে এখানে থাকব?

—আমি তোমার বোন, তুমি আমার দিদি—এই পরিচয় কি যথেষ্ট নয়?

—নিজেকে এত বড় সাজা দেওয়া তোমার ঠিক হচ্ছে না। সাধনা বোঝাতে চাইল, আমি মূর্খ কিন্তু মেয়ে হয়ে একজন মেয়ের মন বুঝব না তা হয় না। তুমি আমার জন্য নিজের মনটাকে পাথর চাপা দিচ্ছ এটা ঠিক নয়। অন্যের চোখের জল মোছাবার জন্য নিজের চোখ সর্বদা ভেজা রাখবে এটা ঠিক নয়।

ইরা বলল, আমার মন যা চায় আমি তাই করার চেষ্টা করি। আমার মন যা বলে আমি তাই বলার চেষ্টা করি। এর মাঝখানে আমার আর অন্য কোন চিন্তা নেই।

—তুমি নিজের চিন্তা করছ না বলেই আমি যে তোমার চিন্তা করব না—এটা ঠিক নয়। সাধনা বলল, ওর উপর তোমার দাবী এখন বেশি। মানছি, একসময় আমার দাবী ছিল, এখন আমার আর কোন অধিকার নেই। ও আমার চোখে অনেকদিন আগে মরে গেছে। মরা মানুষের জন্য আমি কেন মিছিমিছি শোক করব?

শেষ পর্যন্ত সাধনাকে যেতে দিল না কানন, হাত ধরে কাকুতি-মিনতি করে বলল, তুমি চলে গেলে আমার ইরা আর বাঁচবে না। ওকে আমি ভাল মতন চিনি। নিজের শরীরের রক্ত দিয়ে ও মুমূর্ষুকে বাঁচিয়ে রাখতে ভালবাসে। তুমি ওর পাশে থাকলে মেয়েটা মনের জোর ফিরে পাবে। তুমি চলে গেলে ও আর কোনদিন জয়দেবের মুখের দিকে তাকাবে না। এতে দুটো প্রাণ অকালে ঝরে যাবে।

সাধনার পায়ে আবার সংসারের বেড়ি। বাবলাকে নিয়ে সে থেকে গেল কালীগঞ্জে। জয়দেবের সঙ্গে সারাদিনে তার একটা দুটো কথা হয় না। ইরাও ভীষণ মনমরা। গোড়ায় কেঁচোলাগা চারাগাছের মতো ঝিমানো তার শরীর। বিবশ অবসন্ন হতাশাগ্রস্ত চাহনি। দশটা কথা বললে একটা কথার উত্তর দেয়, তাও আবার না বলার মতো।

জয়দেব একদিন ফাঁকা ঘরে একা পেয়ে তার হাত ধরে টানল, জানি তুমি আমার

উপর রাগ করে আছো। আমার অপরাধ কি তুমি ক্ষমা করে দিতে পার না? ইরা প্রত্যুত্তর করল না।

জয়দেবের গলায় অন্য সুর, আজ রাতে তুমি আমার বিছানায় এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

ইরা এ প্রশ্নেরও কোন উত্তর দিল না।

যথারীতি রাত নামল সংসারে। বাবলাকে নিয়ে জড়োসড়ো হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল সাধনা। বাবলার পিঠের উপর সাধনার এক হাত পরম স্নেহে ছুঁয়ে আছে। ইরার চোখে জল ভরে উঠল। সেও বাবলার শরীর ছুঁয়ে শুয়ে থাকল রাতভর। ঘুম ভাঙল সকালে।

কানন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে শুধাল, ইরা, ওঠ। জয়দেব কোথায় গেল বল তো?

সকালে চা না খেয়ে যে ঘরের বাইরে বেরয় না, সে হঠাৎ একা একা কোথায় যেতে পারে? ইরা কোন গুরুত্ব না দিয়ে বলল, কোথায় আর যাবে? দেখো গিয়ে তাড়িখানায় পড়ে আছে হয় তো?

একা একা তাড়িখানায় যাবে কী ভাবে?

পল্টু কোথায়?

সে তো তোর বাবার সঙ্গে কিচেনে গেল!

পল্টুকে শুধোও, সে জানে তোমার জামাই কোথায় গিয়েছে!

পল্টু এল। সব শুনে আকাশ থেকে পড়ল সে।

চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠল। দুপুরে খেতে বসে গুরুপদ বলল, জামাইয়ের মাথাটা মনে হয় খারাপ হয়ে গিয়েছে। নাহলে সুখের ভাত ছেড়ে কেউ কি পালায়?

—চোখ দুটো থাকলে আমার এত চিন্তা হোত না। ইরার কথাটাই যেন বলে দিল কানন, ওগো, তুমি একবার খোঁজ করে দেখো, ছেলেটা কোথায় গেল? সারাদিন ধরে খোঁজ চলল জয়দেবের।

পরের দিন সকালে পল্টু ফিরে এল দত্তদের আমবাগান থেকে। ওর চোখ মুখ শুকনো। কাননকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, মা, জামাইবাবু বাগান পুকুরে ডুবে মরেছে। পুকুরপাড়ে কত ভিড়! আমি নিজের চোখে দেখে এলাম।

—তুই ঠিক দেখেছিস? গলা কেঁপে উঠল কাননের।

—হ্যাঁ মা, দেখতে আমার কোনও ভুল হয় নি। পল্টু চাপা গলায় বর্ণনা দিল, জল খেয়ে পেটটা একেবারে ঢোল। মুখ ফুলে গিয়েছে হাঁড়ির মতো। বিশ্বাস না হয় তুমি আমার সাথে চলো।

সবাই গেল, শুধু গেল না ইরা।

খবরটা শোনার পর থেকে তার গা পাক দিয়ে বমি এল বারবার। চোখ ফেটে জল এল। দেওয়ালে হাত ছুঁড়ে ভেঙে ফেলল শাঁখা। পলা। জোড়া চোখে আঁধার ঘনিয়ে এল তার। মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাল সে।

টুনি দিদিমণি আর সাধনা গেল হাসপাতালে। ডাক্তারবাবু সব পরীক্ষা করে গুরুপদকে বললেন, তোমার মেয়ে মা হতে চলেছে। ওকে সাবধানে রেখো।

বাবলা তার বাবার মুখে আগুন দিয়ে আসার পরে সাধনা আর থাকল না। বুক ভাসিয়ে কাঁদল সে। এক সময় কান্না থামিয়ে রুগ্ন ক্লীশ ব্যথাতুর ইরার হাত ধরে বলল,

আমার সময় হয়ে এসেছে, আমি এবার চললাম। তোমার পেটেরটাকে সাবধানে রেখো। ও ছাড়া তার স্মৃতি তো তোমার কাছে আর কিছু নেই।

ইরা আক্ষেপ করে বলল, দিদি আমার কেন মরণ হল না? আমি মরে গেলে সব ঝামেলা চুকে যেত।

সাধনা একথার কোন উত্তর না দিয়ে ঘরের বাইরে পা দিল। বাবলার হাত ধরে বলল, চল বাবা, অনেকটা পথ যেতে হবে।

নিরুদ্দেশ যাত্রায় পথের কোনও গন্তব্য নেই।

## ।। ১৭।।

পল্টুকে যেদিন চুরি কেসে থানায় ধরে নিয়ে গেল মেজ দারোগা, সে রাতেই গর্ভযন্ত্রনায় কাতর হয়ে পড়ল ইরা। কানন পাগলের মতো ছোটাছুটি শুরু করে দিল ঘরের ভেতর, চিৎকার করে বলল, বিল্টু, তাড়াতাড়ি গিয়ে টুনি দিদিমণিকে ডেকে আন।

গুরুপদ বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে ইরার শোচনীয় অবস্থা দেখে, এই অবস্থায় মেয়েটা কীভাবে হাসপাতালে পৌঁছাবে এটাই ছিল তাব চিন্তা। বিড়ি ধরিয়ে আগত চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করল সে। দরদরিয়ে ঘেমে গেল। বাইরে মেঘের অবস্থা ভাল নয়, তর্জন-গর্জন শুরু হয়েছিল বিকেল থেকেই, সন্ধ্যে নামতেই বিদ্যুৎ-এর সাপ ছেঁকে ফেলেছে পুরো আকাশ। অন্ধকারের গাঢ়ত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে মেঘের কালো বরণ। ছিটছিটে বৃষ্টিতে ভিজে আছে গাছপালা, ঘাসের ডগা এমন কী মাটিও নরম তুলতুলে। ছাতা ছাড়াই ঘর থেকে বেরিয়ে এল গুরুপদ। পল্টুর জন্য যেটুকু চিন্তা ছিল মনে তা এখন চাপা পড়ে গিয়েছে ইরার দুর্ভাবনায়। দশ পাও হাঁটে নি সে তেড়ে ফুঁড়ে বৃষ্টি এল আবার। বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য আমগাছের গোড়ায় দাঁড়াল না সে, দৌড়ে গেল হাসপাতালের দিকে। ওদিকে বিল্টু গিয়ে ডেকে এনেছে টুনি দিদিমণিকে। সব দেখে শুনে বলল, এক্ষুণি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দবকার।

বৃষ্টি মাথায় ঘরে ফিরে এল গুরুপদ, তার হাতে স্ট্রেচার। মাথার জলটুকু যে মুছে নেবে সেই সময় তার হল না। খবর পেয়ে বিশ্বনাথ এল। সে ব্যস্তবাগীশ মানুষ। হড়বড়িয়ে বলল, দাদা, আর দেরী করা ঠিক হবে না। চল, ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাই।

কানন ছাতা ধরেছে ইরার মাথায়, তবু বৃষ্টির ছাঁটে ওর পুরো শরীর ভিজে গেল। অপারেশন টেবিলে ইরাকে ধরাধরি করে শুইয়েছিল গুরুপদ আর বিশ্বনাথ। টুনি দিদিমণি ওদের যেতে বলেই ও.টি.র দরজা লাগিয়ে দিল মুখের উপর। ইরা ভেজা শরীর নিয়ে কাঁপছিল। তার শাড়ি বদলে চুল মুছিয়ে দিল টুনি দিদিমণি। কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ইরা শূন্য চোখে তাকাল। চোখের কোণে চিকচিকিয়ে উঠল জলের ধারা। ওগুলো মুছে নেবার মতো শক্তি তার ছিল না। শরীর ভর করে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল অসহনীয় যন্ত্রণার বেগ। কিছুতেই সে সামাল দিতে পারছিল না। ও.টি.র বাইরে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়েছিল গুরুপদ। গত ক' দিন থেকে মেয়েটার শরীর যে ভাল যাচ্ছে না—এই সংবাদ কানন তার কানে দিয়েছে। অভাবের জ্বালায় কোনও কথাই আজকাল তার কানে ভাল মতো ঢোকে না, পিছলে যায়। জয়দেব মারা যাওয়ার পর থেকে ইরার মুখে খুব কম দিনই হাসি দেখেছে সে। কাঁচা বয়সের বিধবার বহু জ্বালা। এ সমাজ তাকে দেখেও দেখে না। ইরা মা হতে চলেছে এই সংবাদ শোনার পর অনেকেই বলেছিল, এ যে দেখছি গোদের উপর বিষ ফোঁড়া! ওর আর সন্তান নিয়ে কাজ নেই, ওটা নষ্ট করে দাও। গুরুপদও মনে মনে হয়ত এটাই চেয়েছিল। কাননকে সে তার মনের কথা খুলে বলাতে সেও কেমন ঝিমিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত কথাটা ইরার কানেও পৌঁছাল। ইরা কিছুতেই তাদের কথায় সায় দিল না। সে গুরুপদর মুখের উপর বলে দিল, আমি যদি তোমার সংসারে বোঝা হয়ে থাকি তাহলে আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। এত বড় পৃথিবীতে আমার মাথা গোঁজার জায়গার অভাব হবে না। পেটের সন্তানকে আমি হারাতে চাই না। সে হারিয়ে গিয়েছে। এই একটা মাত্র স্মৃতিচিহ্ন ছাড়া সে যে আমার কাছে আর কিছু রেখে যায় নি।

ইরার ক্ষত-বিক্ষত মনটাকে গুরুপদ সহানুভূতির চোখে দেখত। যে সময় ভাল-মন্দ খাওয়ানোর কথা সে হয়ত তা যথাযথ পারে নি। না পারার জন্য খেদ রয়ে গেছে। রয়ে গেছে হৃদয় উজাড় করা দীর্ঘশ্বাস।

ইরা তাকে প্রায়ই বলত, বাবা, তুমি আমার জন্য ভেবো না। কোনও কিছু দরকার হলে আমি তোমার কাছে চাইব।

গুরুপদ মনে মনে হাসত, কষ্ট পেত। যে মেয়ের মাথার উপর ছায়া নেই সে আর তার বাবার কাছে বড় মুখ করে কী-ই বা চাইবে! ইরা বরাবরের মুখচোরা। মায়াময় সংসারে থেকেও বুঝি সে সংসারে নেই। কানন বলত, আজ একটু জ্যান্ত মাছ এনো। গুরুপদ ঘাড় নাড়ত। ধার দেনা করে মাছ আনত সে। ইরা মুখ ভার করে বলত, এ সবের কী দরকার ছিল? ধার করে মাছ খাওয়া কি ভাল দেখায় বাবা?

—তোর এসময় ভালমন্দ খাওয়ার দরকার। গুরুপদ বিমর্ষ হাসত। বোঝাবার চেষ্টা করত মেয়েকে। ইরা বলত, যারা ভালমন্দ খায় না , তারা কি মা হতে পারে না? মা হওয়ার অধিকার সব মেয়েরই আছে।

মেয়ের সাথে কথায় পারত না গুরুপদ। নিরবিচ্ছিন্ন চিন্তার জালে জড়িয়ে যেত সে। হাসপাতালের ঘড়িতে এগারটার ঘন্টা বাজল পরপর। বিশ্বনাথ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাই তুলল, আমার মনে হচ্ছে মেয়ে তোমার ভোগাবে। দেখ আবার কৃষ্ণনগর না নিয়ে যেতে হয়।

গ্রামের হাসপাতালে অপারেশনের সুবিধা নেই। গুরুপদ ভয় পাওয়া চোখে তাকায়। ঠোঁট নড়ে ওঠে। মা কালীর নাম স্মরণ করে। মাসের শেষে হাত ফাঁকা। টাকা নেই। এত রাত্রে কার কাছে সে হাত পাতবে? কে দেবে টাকা! বেশিরভাগ স্টাফেরই তার মতো দশা।

ডাক্তারবাবু খবর পেয়েই চলে এসেছেন ও.টি.তে। অন ডিউটি নার্স শুকনো মুখে

বেরিয়ে এল ও.টি. থেকে। গুরুপদ তার পথের উপর দাঁড়াল, দিদি, কিছু হল?

—না, এখনও কোন চান্স নেই।

আবার এক আকাশ চিন্তা ভর করেছে গুরুপদর মাথায়। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্সটা ভাল নেই। গ্যারেজে যাবাব কথা ছিল, এখনও যায়নি। তবু দরকার হলে ড্রাইভারবাবুর হাতে-পায়ে ধরবে সে। যে করেই হোক দেবগ্রামে পৌঁছে গেলে তার আর কোনও চিন্তা নেই।

বৃষ্টির শব্দ বাইরে থেকে ঢুকে আসছে হাসপাতালের টানা বারান্দায়। বিদ্যুৎ এর আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে হাসপাতাল চত্বর। ঝনঝনিয়ে কেঁপে উঠছে জানলা-দরজা এত শব্দের মাঝে গুরুপদর কান অধীর হয়ে আছে চেনা শব্দকে বুকে মেখে নেবার জন্য কিন্তু হাজার শব্দের ভিড়ে সেই কাঙ্খিত শব্দটা আর ভেসে আসে না। বিহ্বল গুরুপদর মুখে কোন কথা নেই। বিশ্বনাথ লুকিয়ে বিড়ি ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, কেস ভাল বুঝছি না। চলো ড্রাইভারবাবুর কোয়ার্টারে যাই। খবরটা দিয়ে আসি। সে তাহলে তৈরী থাকতে পারবে।

মন সায় দেয় না গুরুপদর। সাদা দেওয়ালের দিকে তাকায়। ঐ অত রাতে একটা টিকটিকি দেওয়াল লেপটে শুয়ে আছে। চোখে মুখে সুখ নেই। চঞ্চল অস্থির চোখ দুটো। কী খুঁজছে অমন করে? শিকার? গুরুপদর মনে কুঁচিন্তা। টিকটিকিটাকে মনে হল ঘুমহীন চোখে ওৎ পেতে বসে থাকা যমরাজ। শিকার পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। ছেলেমানুষের মত এক পা এক পা করে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেল সে। থাবা মেরে থেঁতো করে দিতে চাইল টিকটিকির শরীর। পারল না। আয়ত্তের বাইরে গিয়ে টিকটিকি আবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। তোয়াক্কাহীন দৃষ্টি। গুরুপদ ভীষণ ভয় পায়। মনের কথা কারোর কাছে বলতে পারে না। শুধু বেড়ে যায় অস্থিরতা। কপালে ফুটে ওঠে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

কানন তার পাশে সরে এসে শুধোয়, কী হল গো তোমার, এত যে ঘামছ? কপালে হাতের তেলোটা বুলিয়ে নিয়ে গুরুপদ বিষন্ন চোখে তাকাল। কানন কী বুঝে বলল, ভয়ের কিছু নেই! অনেকের এরকম হয়। প্রথম তো.......

মাঝ আকাশে বাজ পড়ল আবার। ঝনঝনাৎ শব্দে কেঁপে উঠল জানালা দরজা আলোর সাপ ফণা তুলল হাসপাতালের ভেতরে। এত বৃষ্টি কোথায় লুকিয়ে রাখে আকাশ? বৃষ্টি কি তাহলে চোখের জলের মতো লুকানো থাকে সযত্নে? গুরুপদর জোড় হাত উঠে আসল বুকের কাছে। চোখ বন্ধ হল আপসে। বিড়বিড় করে বলল, মা বুড়ো মা, এই বিপদ থেকে উদ্ধার করো আমাদের। প্রার্থনা শেষ হল না, তাব আগেই আকাশ ভেঙে পড়তে চাইল মাথাব উপর। বিদ্যুৎ-এর আলোয় আবার আলোকিত হয়ে ওঠে চাবপাশ বজ্র হুঙ্কারের আগেই ভেসে আসে কাঁচা শিশুর কণ্ঠস্বর। ও.টি.র দরজা ভেদ করে শব্দটা যেন ঠেলে আসে। গুরুপদর বুকের ধড়ফড়ানী থেমে যায়। শব্দটাকে সে খুব মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করে। নেমে যায় বুকের পাথর। বড় হালকা আর চনমনে মনে হয় নিজেকে বাইরে বৃষ্টি নেমেছে মুষলধারায়। মোটা মোটা বৃষ্টির দানাগুলো আছাড় দেওয়া থার্মোমিটারের মতো ভেঙে পড়ছে মাটিতে। মিনিট পাঁচেক পরে ও.টি. থেকে বেরিয়ে এল টুনি দিদিমণি; হাসতে হাসতে বলল, ইরার মেয়ে হয়েছো মা-মেয়ে দু'জনেই ভাল আছে এখন।

অবশেষে হাসি ফোটে গুরুপদর মুখে। চোখের কোণে জল এসে ভিড় করে। কানন কার পাশে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কী যে বলে শোনা যায় না। টুনি দিদিমণি খবরটা দিয়ে আবার ও.টি.র ভেতর ঢুকে যায়। বিশ্বনাথ অবার বিড়ি ধরায়। সেও মনে মনে বেজায় খুশি, মেয়ে হয়েছে ভালই হয়েছে। আজকালকার ছেলেরা মা বাবার দুঃখ বোঝে না। মেয়েরা পরের ঘরে গেলেও বাবা-মাকে ভোলে না। তা দাদা, শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন আজ। ইরার মেয়ের নাম রাখো শ্রাবণী।

কানন মুখ ভরিয়ে হাসল, এত বর্ষা! বর্ষা নামটা কি খারাপ?

গুরুপদ দু দিকে ঘাড় নেড়ে তাকায়, নাম বড় কথা নয়, মেয়েটা ভালভাবে বেঁচে থাকুক। ওর তো বাবা নেই! ওর মতো অভাগী আর কে আছে?

বিশ্বনাথের মুখ চুপসে গেল, কানন কোনও কথা বলল না।

আধঘন্টার মধ্যে বেডে এল ইরা। কানন ওকে শুইয়ে দিল যত্নে।

ন্যাকড়ায় মোড়া নরম তুলতুলে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমেই তার ঠোঁটের কোণে খেলে গেল অনাবিল হাসি, পরক্ষণে হাসি মুছে গিয়ে নেমে আসল ভরা শ্রাবণ রাত্রি। ইরা কাঁদছিল নীরবে চোখের জল ফেলে। আজকের দিনে জয়দেবের কথা সে কী করে ভুলে থাকে? এ টুকু চোখের জল তার কি প্রাপ্য নয়? কানন মেয়ের কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলে, কাঁদিস নে মা। এ শরীরে কাঁদতে নেই।

যেদিন বৃষ্টি থামল, ইরা সেদিনই ফিরে এল হাসপাতাল থেকে। ক'দিন থেকে জয়দেবের চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে আছে তার মনেব চত্বর। জয়দেব তার মনকে এবড়ো-খেবড়ো করে দিয়ে হারিয়ে গেছে। জয়দেব তাহলে কি একটা ধূমকেতুর মতো তাব জীবনে এসে হাজির হয়েছিল? একদম প্রথম থেকে ইরা ভাবতে থাকে, কপালেব শিরাগুলো দপদপিয়ে ওঠে, নিজেকে অসহায় আর পরিশ্রান্ত মনে হয়। এই সংক্ষিপ্ত মেলামেশায় ইবার কাছে বর্ষা ছাড়া জয়দেবের আর কোনও স্মৃতিচিহ্ন নেই। জীবনভর বর্ষাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। স্বপ্ন দেখতে হবে। মেয়েটাকে বড় করে তুলতে হবে। মানুষের মতো মানুষ করতে হবে। জয়দেবকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বর্ষার মধ্যে দিয়ে। এ বড় কঠিন কাজ। ইরা'র ঠোঁট নড়ে উঠল তার সমস্ত শক্তিকে পরাস্ত করে। সে আর কাঁদতে চায় না। কেন কাঁদবে সে? সাধনা যদি সব খুইয়ে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে সেও বা কেন পারবে না! সাধনার জীবনচিত্রের সঙ্গে নিজেকে অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে ফেলেছে সে। গুরুপদ যখন সাধনাকে থাকার জন্য পীড়াপীড়ি করছিল তখন বাবলার হাত ধরে সে খুব দৃঢ় স্বরে বলেছিল, এখানে থাকতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে আমি থাকলে ইরার দুঃখ অনেক বাড়বে। আমরা দু-জনেই যাকে ভুলে থাকতে চাই সে আরও বেশি করে আমাদের মাঝখানে এসে হাজির হবে। আমি চাই না যাকে আমরা দু-জনায় ঘৃণা করেছি সে আরও ঘৃণা পাক আমাদের কাছ থেকে। আমি চলে গেলে সব দিক থেকে ভাল হবে। তবে আমি আর ওদেশে ফিরব না। ওখানে আমার আর কেউ নেই। যদি মরতে হয় তো এপারেই মরব।

সাধনা সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে চলে গেল। বাবলা যাওয়ার সময় কাঁদছিল। নিরাপত্তাহীনতার অশুভ ইঙ্গিত বুঝি সে টের পেয়েছিল। সাধনা চলে যাবার পর থেকে ইরা কি আরও ঘৃণা করতে শেখে নি জয়দেবকে? হ্যাঁ, সে আরও তীব্রভাবে ঘৃণা করেছে।

যাকে সে মনপ্রাণ, অন্তর দিয়ে ভালবেসেছিল, শেষ পর্যন্ত তাকে ঘৃণা করা ছাড়া তার আর কোনও পথ ছিল না। মানুষের শঠতা, ছলনা আর অসৎ উদ্দেশ্যকে সে কোনওদিন সমর্থন করেনি। আজন্ম করবেও না। বাবলা যাওয়ার সময় বলেছিল, মাসী, তোমার সঙ্গে আমি থাকব। আমাকে তোমার কাছে রাখো না?

বর্ষাকে নিয়ে ইরা ঘরে ফিরে এলেও তার চিন্তা এক ফোঁটাও কমে নি। গুরুপদ আপন অনন্দে বিভোর। নবাগতাকে নিয়ে সমস্ত দুঃখ ভুলে গিয়েছে সে। সামর্থ অনুযায়ী হাসপাতালের সবাইকে মিষ্টিমুখ করিয়েছে সে। ইরাকে বলেছে, তোর আর কোনও চিন্তা নেই। ঘরে লক্ষ্মী এসেছে। এবার আমার দুঃখ-কষ্ট ঘুচবে।

ইরা হাঁ-করে তাকিয়েছে। বাবার আবেগকে সে থামিয়ে দিতে পারেনি। গুরুপদ বলেছে, বর্ষার চিন্তা তোর নয়, আমার। ওকে আমরা সবাই মিলে মানুষ করব। ওর যে বাবা নেই এই অভাব ওকে কোনদিন বুঝতে দেব না।

ইরার কথা বলার সামর্থ নেই, সে শুধু ভাবনার রাজ্যে তলিয়ে গিয়েছে, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেছে। বর্ষাকে মানুষ করে তুলতে হবে। নিজের অসফল স্বপ্নকে পূরণ করতে হবে মেয়ের মধ্যে দিয়ে। শুরু থেকেই ইরা সতর্ক। কিচেনের দুধ ইরা কোনদিন বর্ষার মুখে দেয় না। সে চায় না হাসপাতালের দুধ খেয়ে বড় হোক তার মেয়ে। কাননের দিকে উষ্ণ চোখে তাকিয়ে সে বলে, মা, আমার মেয়েকে তুমি হাসপাতালের দুধ খেতে দেবে না। আমার বুকের দুধ খেয়ে ও মানুষ হোক। ওতেই আমার শান্তি। কানন ভালভাবে জানে ইরা মচকাবে তবু ভাঙবে না। শত বিপদেও এ মেয়ে যে বিপদগামী হবে না এ বিষয়ে সে নিশ্চিত। গুরুপদ গর্বের সঙ্গে বলে, ইরা আমাদের গোবরগাদায় পদ্মফুল। ওকে ওর মতো থাকতে দাও।

একরকম বাধ্য হয়ে একটা ধাড়ী ছাগল কিনে দিয়েছে গুরুপদ। ছাগলটা দু'বেলায় আধ সের দুধ দেয়। কানন ছাগলের দুধ বর্ষার জন্য যত্ন করে ফুটিয়ে রেখে দেয়। ইরা ছোটখাটো টিউশানি নিয়ে ব্যস্ত। কাননের কাছে বর্ষাকে রেখে দিয়ে সে চলে যায় পাড়ায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত চার বাড়িতে পড়ায় সে। গুরুপদ তার কষ্ট দেখে বলে, তোর এত বোঝা না বইলেই চলত। নিজের শরীরের দিকে নজর দে। আমার চাকরি যত দিন আছে, ততদিন তুই আরাম কর।

ইরা প্রতিবাদ করে, তা হয় না বাবা। আগে আমি একা ছিলাম। এখন আমরা দু'জন। দু-জনের বোঝা তুমি কেন একা বইবে? আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই যে তোমার ঘাড়ে বসে খাবো তা হয় না। আমাকেও পরিশ্রম করতে দাও। নাহলে আমি যে কুঁড়ে হয়ে যাব।

ইরার যা বোধশক্তি তার ছিটে ফোঁটা বিল্টু-পল্টুর মধ্যে নেই। চুরি কেসে ধরা পড়ে পল্টু চালান গিয়েছিল সদরে। থানার দারোগা মেরে তাকে আধমরা করে দিয়েছে। পল্টু হাজত খেটে ফিরে এসেছে। তার আর যাওয়ার জায়গাই বা কোথায়: সারাদিন সে ঘরে বসে থাকে চুপচাপ। আগের মতো বাইরে বেরয় না। ঘরে থাকলে কারোর সঙ্গে কথা বলে না তেমন। তার সেই ঔদ্ধত্যভরা চঞ্চলতা এখন আর নেই। দারোগার মার তার শুধু শরীরে নয়, হৃদয়ে লেগেছে। পল্টুর পরিবর্তনে গুরুপদ খুশি। ঘরে থাকলেও সে পল্টুর সঙ্গে কথা বলে না। যে ছেলে তার মুখে চুনকালি লেপে দিয়েছে তার উপর

বিশেষ আগ্রহ না দেখানোই শ্রেয়। নিজেকে শুদ্ধ করতে না পারলে পল্টু যে একদিন পাপের পাঁকে তলিয়ে যাবে এটা সে জানে। গুরুপদর তাই ভয় হয়। এই ভয়ের কথা সে মুখ ফুটিয়ে না বললেও অন্তর ছেয়ে আছে বিষাদে। এই বিষাদমাখা যন্ত্রণা গুরুপদর একমাত্র সম্বল। ইরার মুখের দিকে তাকালে বুকের ভেতর ভাঙচুর শুরু হয় তার। এত যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে থাকা অর্থহীন। তবু বেঁচে থাকতে হয়। এতগুলো চোখ যে তার দিকে তাকিয়ে আছে হাঁ করে।

সেদিন হাসপাতালের গেটে ইরার সঙ্গে দেখা মৃণালের। মৃণাল এ হাসপাতালে বদলি নিয়ে এসেছে মাস ছ'য়েক হল। ওর স্ত্রী রেবা আত্মহত্যা করেছে গলায় দড়ি দিয়ে। মৃণাল নাকি তাকে দিনরাত জ্বালাত, মারধোর করত। রেবার মৃত্যুর পর হরিণঘাটা থেকে মৃণাল চলে এল এখানে। ওখানে থাকলে রেবার স্মৃতি তাকে খুবলাত। জ্বলে পুড়ে নিজেব ভেতরে শেষ হয়ে যেত সে। এখানে আসার পর মৃণাল ঝাড়া হাত পা হলেও রেবার স্মৃতি তার পেছন ছাড়ে নি। একমাত্র মেয়ে টুসিকে সে সঙ্গে এনেছে। টুসি তার দাদু-দিদিমার কাছে থাকতে চায় নি, ছ'বছরের টুসি কেঁদে-কেটে তার বাবার পেছন ধরেছে। চক্ষুলজ্জার ভয়ে টুসিকে সঙ্গে এনেছে সে। সঙ্গে আনাটাই কাল হয়েছে তার। মেয়েটার জন্য সে বাইরে বেরোতে পারে না। ডিউটি গেলেও মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়। টুসি তার ছায়াসঙ্গী। মাঝে মাঝে নিজের মেয়েকে অসহ্য মনে হয় তার। টুসিকে গুরুপদর ঘরে রেখে সে চলে যায় ঘুরতে। যাওয়া আসায় ইরার সঙ্গে দু-চারবার কথা-বার্তা হয়েছে। ইরার কোনও আগ্রহ নেই মৃণালের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। মৃণাল সামনে এলে সে রোদে ঝলসান কচি পাতার মতো অনুজ্জ্বল হয়ে পড়ে। তুলনায় মৃণাল অনেক বেশি সপ্রতিভ। সে চায় ইরা তার সঙ্গে খোলা মনে মিশুক।

ইরার সঙ্গে অসময়ে মৃণালের যে দেখা হয়ে যাবে এবং বুকের ভেতরে অন্য চিন্তার ঢেউ উঠবে এটা সে ভাবে নি। ইরা না দাঁড়িয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করতেই মৃণালই এগিয়ে এল সামনে, ঠোঁটে হাসি ঝুলিয়ে বলল, টুসিকে তোমাদের ঘরে রেখে এসেছি। ওকে একটু দেখো।

—আপনি না বললেও টুসিকে আমরা দেখি। ইরার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল।

মৃণাল অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, মা মরা মেয়েটাকে নিয়ে আমার অনেক সমস্যা। ওকে ফেলে আমি কোথাও যেতে পারি না। ইরা এ কথার কোনও উত্তর দিল না। ব্যস্ত হয়ে বলল, আমি যাই। ঘরে অনেক কাজ পড়ে আছে। মৃণালের মুখের দিকে না তাকিয়ে সে সোজা হেঁটে এল আমতলা পর্যন্ত। সন্ধ্যা নামছে। পাতার রঙ কালচে হয়ে উঠছে ক্রমশ। ধাড়ী ছাগলটা বকফুল গাছের গোড়ায় বাঁধা। ভ্যা-ভ্যা করে ডাকছে। ইরা দ্রুত পায়ে হেঁটে গেল সেই দিকে। মৃণালের গায়ে পড়া স্বভাব ইরার একদম পছন্দ নয়। ছাগলের দড়ি খুলতে গিয়ে সে একবার নিজের দিকে তাকাল। কতদিন সে নিজেকে দেখেনি গভীর ভাবে। কানন প্রায়ই বলে শরীরের যত্ন নিতে। ইরা হাসে তখন। কী হবে এই পোড়া শরীরের যত্ন নিয়ে। যত তাড়াতাড়ি কালি পড়ে চোখের নীচে ততই তার মঙ্গল। এই শরীর সে আর কারোর জন্য সাজাতে চায় না। জীবনকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলবে সে। আর কারোর লোভ-লালসার শিকার হবে না।

হাসপাতালের অনেকেই গুরুপদর কাছে একটা প্রস্তাব দিয়েছে। মৃণালের পত্নী বিয়োগ

হয়েছে, সে একা। ইরাও একা। ওদের দু-জনকে আবার নতুন জীবনে মিলিয়ে দিলে ম
নয়। মৃণালের পাকা চাকরি। ইরার ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না কোন দিন। তাছা
ছেলে হিসাবে মৃণাল মন্দ নয়।

সরাসরি কথাটা ইরার সামনে বলতে পারে নি গুরুপদ। কোথায় যেন বাধো বা
ঠেকেছে। মেয়ের রাশভারি মেজাজ তাকে বোবা করে দিয়েছে। কানন যুক্তি দেখি
বলেছিল, তুমি না পারো টুনি দিদিমণিকে দিয়ে একবার বলাও। ওরা তো দুজনে বন্ধু
মতো।

টুনি দিদিমণি ইয়ার্কির ছলে কথাটা ইরার কাছে বলতেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছি
সে। ক' মুহূর্ত কথা বলতে পারে নি ইরা। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলেছিল, আ
মরে যাব তবু দ্বিতীয়বার আর কারোর হাত ধরব না। ছেলেরা যা সহজে পারে, মেয়ে
তা পারে না।

তোমাকে পারতেই হবে। টুনি দিদিমণি জোর করতেই ইরা বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলেছি
তুমি যদি এমন কথা বলো তাহলে আমি আর তোমার ঘরে আসব না। এমনিতে আ
কোথাও যাই না, আজ থেকে তোমার দরজাটাও বন্ধ হয়ে গেল।

টুসি ঘরের ভেতরে খেলছিল, ওকে আগলে রাখে কানন। ছাগলটাকে বারান্দায় বেঁ
দিয়ে ইরা দেখল টুসির হাসিভরা মুখখানা। ওর চেহারায় মৃণালের কোনও ছাপ নে
রেবার মুখও সে দেখে নি, তবে টুসির মুখ দেখে রেবার মুখটা কল্পনা করে নিতে পা
সহজে। কত কষ্ট ভোগ করে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছে রেবা। টুসির মতো মেয়ে
ছেড়ে যে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে তার মৃত্যুকালীন দুঃখের গভীরতা ইরা সহ
অনুমান করে নিতে পারে। ঐ বদমায়েশ লোকটার সঙ্গে তার যে কোনও সম্পর্ক গ
উঠতে পারে না, এ বিষয়ে সে নিশ্চিন্ত। টুসিকে আদর করে সে বর্ষার কাছে গিয়ে দাঁড়া
মেয়েটা হাত-পা ছুঁড়ে হাসছিল। লাল টুকটুকে ঠোঁটে গড়িয়ে পড়ছিল হাসি। ইরা মেয়ে
বুকে তুলে নিল হাত বাড়িয়ে। স্নেহের চুম্বন এঁকে দিল তার কপালে। টুসি অসহায় চো
মেলে দেখছিল এই দৃশ্য। মায়ের কথা মনে পড়তেই মন খারাপ হয়ে গেল তার।

গুরুপদর সংসার চলছিল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। কাননের হাঁপানীর টান বেড়েছে।
শয্যাশায়ী। ধার-দেনায় গুরুপদর মাথা তোলাই দায়। ইরা চোখের সামনে সব কিছু দে
চুপ করে থাকতে পারে না। বিশ্বনাথ তাকে নিয়ে চলেছে ধনঞ্জয়বাবুর বাড়িতে। এ অঞ্চ
ধনঞ্জয়বাবুর নাম জানে না এমন মানুষ নেই। লোক হিসাবে তার তুলনা মেলা ভা
পথে বিশ্বনাথ বলল, তোমাকে যা বলবে সবটাতে রাজি হয়ে যেও। ধানুবাবুর ম
উদার মানুষ আর হয় না। উনি গরীবের বন্ধু। কত লোককে যে চাকরি দিয়েছেন ত
কোন গোনাগুণতি নেই।

ইরা যে ধনঞ্জয়বাবুর নাম শোনে নি তা নয়। পরপর দু'বার যে মানুষ এম
এ ভোটে জিততে পারেন তার জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বোকামি। ইরা জানে ধনঞ্জয়
চাইলে তার একটা গতি হয়ে যেতে পারে।

বাস থেকে নেমেই ইরার চোখ চলে গেল সাজানো গোছানো হলুদ রঙ করা বিশ
বাড়িখানার দিকে। এতবড় বাড়ি সে করিমপুরেও দেখে নি। হাঁ করে সে যখন দেখা
তখন বিশ্বনাথ বাহাদুরী নেবার গলায় বলল, ধানুবাবুর এরকম বাড়ি আরও সাত

াছে। কলকাতার বাড়িগুলো দেখলে তোমার চোখ ঘুরে যাবে।

ইরার কথা আটকে গেল। বিশ্বনাথ গর্বিত স্বরে বলল, বাবু তো বাবু ধানুবাবু। ওরকম ানুষ আর হয় না। বাবুর দয়াতেই আমি হাসপাতালে ঢুকেছি। নাহলে আমাকে আর ক পুছত?

ইরা বলল, কাকু, তুমি আমার হয়ে বাবুকে একটু বলো।

—সে আর বলতে! বিশ্বনাথ দাঁত বের করে হাসল, ধানুবাবুকে যা বলার আমি তোমার ামনেই বলব। আমার কাছে কোনও লুকাছাপা নেই।

হলুদ রঙের মস্ত বাড়িখানা কেউ বুঝি সিনেমার পর্দা থেকে তুলে এনে বসিয়ে দিয়েছে মিতে। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। নানা রঙের গোলাপে ছয়লাপ চারধার। ম-ম রে সুগন্ধ। এত যে বাহারী সব ফুল আছে ইরা এর আগে দেখে নি। শুধু ফুল নয় ত রকমের বাহারী লতায় পাতায় ভরা বাগানটা রোদ গায়ে মেখে হাসছিল। সবুজ াসের উপর বেতের চেয়ার পেতে গায়ে রোদ লাগাচ্ছিলেন ধনঞ্জয়বাবু। দুটো সাদা রঙের াড়ি কিছু দূরে দাঁড়িয়ে।

বিশ্বনাথ ধনঞ্জয়বাবুকে দেখে চাপা গলায় বলল, তোমার ভাগ্য ভাল বাবু আজ ঘরে াছেন। আমি কতবার এসে ঘুরে গিয়েছি। দেখা হয় নি। বাবু সাত ঝামেলার মানুষ। র দেখা পাওয়া আর ভগবানের দেখা পাওয়া এক কথা।

ইরা কৃতজ্ঞতায় চোখ ভরিয়ে হাসল। বিশ্বনাথ গুটিসুটি পায়ে এগিয়ে গেল বাবুর কে। একবার গলা খেঁকারি দিতেই ধনঞ্জয়বাবু চোখ খুললেন, ভারিক্কি গলায় শুধোলেন, ?

হাত জোড় করে বিশ্বনাথ মাথা নিচু করে দাঁড়াল, আমি বিশু।

কোন বিশু?

—আজ্ঞে কালীগঞ্জ হাসপাতালের স্টাফ, আপনি যাকে চাকরি দিয়েছিলেন! ধনঞ্জয়বাবু খ খুললেন না, একই ভঙ্গিতে বললেন, আমার কাছে কিসের জন্য এসেছ?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিশ্বনাথ বাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে হাতটা মাথায় ছোঁয়াল, বপর ইরাকে ইশারায় প্রণাম করার নির্দেশ দিয়ে সে একপাশে সরে দাঁড়াল। মেয়েলী তের স্পর্শে বাবু চোখ খুললেন, কে তুমি?

থতমত খেয়ে ইরা বলল, আমি কাকুর সাথে এসেছি।

—বিশু বুঝি তোমার কাকু হয়?

ইরা ঘাড় নাড়ল। ধনঞ্জয়বাবু লম্বা একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন, তারপর ার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কোথায় থাকো? আমার কাছে কী জন্য এসেছ?

ইরা কিছু বলার আগে বিশ্বনাথ বলল, বাবু, এই মেয়েটা বড় দুঃখী। ওর স্বামী নেই। লে ডুবে মারা গেছে।

ধনঞ্জয়বাবু সিগারেটটা দুই আঙুলের ফাঁকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরলেন, এই অল্প বয়সে মি স্বামী হারিয়েছ—এ তো বড় দুঃখের কথা!

ইরার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। বিশ্বনাথ বলল, ইরার একটা মেয়ে আছে। ওর বাবা র সঙ্গে কাজ করে। ওদের বড় অভাব।

—আমাকে কী করতে হবে?

—বাবু আপনি চাইলে অন্ধকে দৃষ্টি দিতে পারেন। ক্রমাগত হাত কচলে বিশ্বনাথ বাবুর মুখের দিকে তাকাল, মেয়েটার একটা গতি করে দেন বাবু। ওর কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। দুধের বাচ্চাটাকে ফেলে ওর কোথাও যাবার উপায় নেই। ওর সব রাস্তা বন্ধ। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

—সে তো বুঝলাম কিন্তু আমি কী করব? ধনঞ্জয়বাবু গলা শুকিয়ে বললেন, এরকম কেস আমার কাছে ডেলি দশ পনেরোটা আসে। আমার তো চাকরি দেবার কারখানা নেই যে যাকে মন চায় তাকেই ঢুকিয়ে দেব।

আপনি মন করলে জলেও পাথর ভাসবে। আপনার কলমের খোঁচায় কী না হয়

যে যুগে হোত, সে যুগ তো চলে গিয়েছে। এখন বড় কঠিন যুগ। এখন আমার পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব নয়। ধনঞ্জয়বাবু ওদের গুরুত্ব দিতে চাইলেন না। বেগতিক দেখে আবার পা জড়িয়ে ধরল বিশ্বনাথ, কাকুতি-মিনতি করে বলল, মেয়েটাকে বাঁচান বাবু। আপনি ওকে না দেখলে মেয়েটাকে যে দেখার কেউ নেই। বড় আশা করে অত দূর থেকে আসছি। কিছু একটা করুন বাবু।

—আরে পা ছাড়ো। পা ধরলে কি চাকরি হবে?

বিশ্বনাথ পা ছাড়ল না, আরও শক্তভাবে জড়িয়ে ধরল। ইরা অস্বস্তিতে ঘামছিল এমন অভিজ্ঞতা জীবনে তার প্রথম। গলা শুকিয়ে আসছিল তার। বিশ্বনাথের বাড়াবাড়ি রকমের অভিনয় কিছুতেই ভাল লাগছিল না তার। আঁচলে ঘেমো মুখটা মুছে নিয়ে সে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়াল।

বাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, ছেড়ে দাও। দেখি কী করা যেতে পারে। কপালে ভাঁজ ফেলে তিনি শুধোলেন, সরকারী কাজ ছাড়া তুমি কি অন্য কাজ করতে আগ্রহী?

ইরা হ্যাঁ না কিছু বলার আগেই বিশ্বনাথ বলল, ও ছেলেমানুষ, ও কী বলবে? আমি বলছি যে কোন ধরনের কাজ ও করবে।

—কলকাতায় আমার ছেলের বাড়িতে একটা কাজের মেয়ের দরকার। ও কি সেখানে থাকতে পারবে। যদি রাজি থাকে তাহলে পরশু আমার গাড়ি যাবে। ওকে তৈরী হয়ে আসতে বলো।

বিশ্বনাথ ইরার কোন সম্মতি না নিয়েই বলল, তাই হবে বাবু। আমি নিজে এসে ওকে পৌঁছে দিয়ে যাব।

পাকা রাস্তায় উঠে এসে ইরা খুব গম্ভীর হয়ে গেল। এতক্ষণ যে ঝড়ের সামনে সে পড়েছিল তা যেন তাব সমস্ত অস্তিত্বকে উড়িয়ে দিয়েছিল। ঘন করে শ্বাস ছেড়ে ইরা ভীতু চোখে আর একবার সেই হলুদ বাড়িটার দিকে তাকাল। ভীষণ ভয় পেল সে। বুকের চারপাশ থেকে উঠে আসা ভয়টাকে সে কিছুতেই দমন করতে পারল না। ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে গেল সে। বিশ্বনাথ বিড়ি ধরিয়ে বড় করে টান দিয়ে বলল, আসার সময় মা বুড়োমার কাছে মানত করে এসেছিলাম। বুড়োমা আমাদের মুখ রেখেছে। ফিরে গিয়ে তার ধারটা শোধ করতে হবে। ইরা কথা না বলে হাঁটছিল বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে। চড়া রোদে ঝলমল করছিল চারদিক। সাঁই সাঁই শব্দে ছুটে যাচ্ছিল ট্রাক। ধুলোর কুণ্ডলী আছড়ে পড়ছিল ইরার ঘাম চ্যাটচেটে শরীরে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসছিল বিশ্বনাথের, সেই সঙ্গে ক্ষিদেও লেগেছিল তার। সেই কোন সকালে ঘর থেকে বেরিয়েছে ওরা, তারপর

চা-জলখাবার কোনও কিছু খাওয়া হয় নি।

রাস্তার পাশে গুমটি চায়ের দোকান, বিশ্বনাথ বলল, চল ইরা, এবার আমরা কিছু খাই। বাসের অনেক দেরী আছে, ততক্ষণে চা-জলখাবার হয়ে যাবে।

দুটো পাউরুটি সেঁকে দিয়েছে চা-দোকানী। বিশ্বনাথ চেয়েছিল ডিম দিয়ে পাউরুটির টোস্ট খাবে। ছোট দোকান, ডিম নেই। বিশ্বনাথের তাই মন খারাপ। শুকনো পাউরুটি চায়ে ডুবিয়ে খেতে গেলেই বিস্বাদ লাগে মুখটা। তবু কোনও মতে পাউরুটিটা খেয়ে বিশ্বনাথ বলল, জান ইরা, আজ তোমার জন্য কিছু করতে পেরে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

ইরার মুখ শুকিয়ে গেল. কাকু আমি কি পারব বাবুর বাড়িতে কাজ করতে?

—কেন পারবে না? তুমি যদি না পার তো দুনিয়ার কেউ পারবে না।

—আমার খুব ভয় করছে।

—ভয় কিসের, আমি তো আছি। বিশ্বনাথ জোর করে হাসল।

ইরা বিবর্ণ মুখে বলল, মেয়েটাকে নিয়ে আমার চিন্তা। অত ছোট মেয়ে নিয়ে আমি কী করে কলকাতায় একা থাকব?

—তুমি যাদের কাছে যাচ্ছো তারাও তো মানুষ! তাদের ছেলে-মেয়ে আছে।

—সেইজন্য তো আমার চিন্তা।

দেখতে দেখতে মাঝখানের দিনটা পেরিয়ে গেল।

ইরাকে ধনঞ্জয়বাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিতে এসেছে কানন আর বিশ্বনাথ। গুরুপদর আসার খুব মন ছিল কিন্তু সে ডিউটি ছেড়ে আসতে পারল না। ইরার হাতে মাত্র ত্রিশটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে বলল, তুই ভালভাবে থাকিস, আমি পরে গিয়ে তোকে দেখে আসব।

চোখের জল মুছে ইরা বিদায় নিয়েছে সবার কাছ থেকে। নতুন জীবনের পথ যে কেমন তা সে জানে না। বর্ষাকে কোলে নিয়ে সে যখন বাবুর বাসায় পৌঁছাল তখন চনমনে সকাল। কানন অত বড় বাড়ি দেখে মনে মনে বেজায় খুশি। বিশ্বনাথকে নীচু গলায় বলল, মেয়েটার একটু সুখ দেখে মরতে পারলে বাঁচি। ওর চিন্তায় আমার চোখে ঘুম আসত না। ওর বাবা তো ভেবে ভেবে দড়ি হয়ে গেল।

ধনঞ্জয়বাবুর সাদা গাড়িটায় নানা আকারের বাক্স-পোঝাই। ইরার কোলে বর্ষাকে দেখে তিনি গাড়ি থেকে নামলেন, কপাল কুঁচকে শুধোলেন, বাচ্চাটা কার?

ইরা মিনমিনে গলায় বলল, আমার মেয়ে।

—ওকে নিয়ে তুমি কোথায় যাবে?

কানন অপরাধীর মতো মুখ করে বলল, অতটুকু দুধের মেয়েকে ছেড়ে কোনও মা থাকতে পারে না কি?

—তাহলে আর গিয়ে কাজ নেই। গমগমিয়ে উঠল ধনঞ্জয়বাবুর কণ্ঠস্বর, কাজের মেয়ের জন্য যদি আর একটা কাজের লোক রাখতে হয় তাহলে আর কলকাতায় গিয়ে কাজ নেই। যদি যেতে হয় তাহলে ইরা একা যাবে। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যাওয়ার কোনও দরকার নেই।

কানন আর বিশ্বনাথ দেবদারু গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নীচু গলায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল অনেকক্ষণ, তারপর কানন মুখ নীচু করে এগিয়ে গেল ইরার কাছে।

বর্ষাকে কোলে নিয়ে বলল, যা মা, চলে যা। আজ থেকে তোর মেয়ে আমার কাছে থাকবে। ওর জন্য তুই ভাবিস নে। সময় পেলে ওকে তুই দেখে যাবি।

ইরা ফুঁপিয়ে উঠল। চোখের জল মুছে বলল, তা হয় না মা! বর্ষাকে ছেড়ে আমি যে বাঁচব না।

আমি যদি তোকে ছেড়ে বাঁচতে পারি, তাহলে বর্ষাকে ছেড়ে তুইও বেঁচে থাকবি। যা মা, আর দেরী করিস না। কাননের শেষের দিকের কথাগুলো কান্নায় ডুবে গেল।

---